বাংলার লোককথা

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

: পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
ডঃ দুলাল চৌধুরী, মহাপরিচালক
একাডেমী অব ফোকলোর
২০-এ, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড,
কলিকাতা—৭০০০৩২

প্রথম প্রকাশ : ঈদ্-উল্-ফিত্‌র (১৪০৮ হিজরী)

মুদ্রাকর : শ্রীসমীর রায়
শ্যামল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
কাটোয়া * বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : কালার টোন
কুমোর পাড়া,
কাটোয়া * বর্ধমান

উৎসর্গ

মরহুমা বেগম খাদিজা খাতুন (মা)

ও

মরহুমা বেগম উম্মে কুলসুম (ছোট মা)

স্মরণে।

তোমরা মাগো !

মা খাদিজার নিরমল প্রতিচ্ছায়া
তিল তিলে বেঁচে গেছ, যেই ক্ষুদ্র কায়া
সুধা দিয়ে সেঁচে গেছ, যেই শিশুতরু
তোমাদের স্মৃতিতে আমি সেই মর্ত্য-মরু।

ভূমিকা

শ্রীমুহম্মদ আয়ুব হোসেন একজন নবীন লোকবিজ্ঞানী। লোক-বিজ্ঞান ক্ষেত্রকর্মে তিনি পরম উৎসাহী। তিনি প্রায় শতাধিক লোকগল্প লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা এক আশ্চর্য্য ও শ্রমসাধ্য কর্ম। তাহার মধ্য হইতে সংকলন করিয়া বর্তমান গ্রন্থ "বাংলার লোককথা" প্রকাশিত ক'রলেন। ইহা এই উপমহাদেশের একটি গৌরবজনক কর্ম। লোকবিজ্ঞানের দিকে আমাদের আদৌ নজর নাই। এই উপমহাদেশের অঙ্গে সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালীর অবার্থ পাথুরে নজিব আছে। উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক অঞ্চল হইতে স্ব স্ব অঞ্চলের ভাষায় মৌল কার্য্য করিয়াছেন অনেকে।

আমাদের এই উপমহাদেশের অপূর্ব লোকগল্প ধর্মের কাঠামোতে "জাতকে" স্থান পাইয়াছে। কাউয়েল সাহেব এই গল্প প্রথমে ইংরাজীতে "সেক্রেড বুক অব ইষ্ট" সিরিজে ছাপেন। পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রায় যুগ ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধ বয়সে সম্পূর্ণ "জাতক" মূল পালি ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া এক অক্ষয় কাত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার ধারণা যে সকল অঞ্চল হইতে "জাতকের" গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই সেই অঞ্চলের লোকগল্পের আঞ্চলিক সার্ভে করা দরকার; তাহা হইলে ঐ "জাতক"গুলির মূল উৎসগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আর তাহাতে অনেক ভাল কাজ হইবে। আমাদের এই উপমহাদেশের যে সকল পণ্ডিতে ইহা সংগ্রহ ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যেও জাতকের গল্পের ছিন্ন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ "রোমান্টিক ফোক টেলস অব পাঞ্জাব" অথবা "লিজেণ্ড অব পাঞ্জাব" প্রভৃতি গ্রন্থেই তার সন্ধান

মিলিবে। লোকবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আমাদের এই উপমহাদেশে গভীর ও ব্যাপকভাবে হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ ইণ্ডিয়ানা ইউনিভারসিটির নাম করা যাইতে পারে। লোকগল্পের সঙ্গে লোকশিল্পের অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে।

রেভারেণ্ড অধ্যাপক লালবিহারী দে, স্যার জর্জ টেম্পলের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় প্রচলিত লোকগল্প সংগ্রহে প্রবৃত্ত হ'ন এবং ইংরাজী ভাষায় "ফোক টেলস অব বেঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক আগে জনৈক সেন 'ফোকলোর অব বেঙ্গল' রচনা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় পি ও বোডিং-এর "সানটাল ফোক টেলস" এক আদর্শ ও অপূর্ব গ্রন্থ।

সম্প্রতি দিল্লীর ষ্টারলিং কোম্পানী এই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের লোকগল্প সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগ্নী নিবেদিতার 'ক্রেডেল টেলস অব ইণ্ডিয়া' একখানি বিশ্বস্ত গ্রন্থ।

সে যাহা হউক, মুহম্মদ আয়ুব হোসেন প্রণীত "বাংলার লোককথা" গ্রন্থের গল্পগুলির সংক্ষিপ্তসার পড়িয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। মদীয় "শিরণী" (বাংলা একাডেমী) গ্রন্থে কয়েকটি মূল গ্রাম্য গল্প রহিয়াছে। আয়ুব হোসেনকে আশীর্ব্বাদ করি।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
"মনসুর ভবন"
৩৭, শান্তিনগর, ঢাকা-১৭
বাংলাদেশ
ফোন—৪০১৬৭৫
তারিখ—২৪-২-৮৫

॥ আমার কথা ॥

অনন্ত করুণাময় পরমদয়ালু ক্ষমাশীল সর্বশক্তিমানের অসীম অনুগ্রহে "বাংলার লোককথা" প্রকাশিত হলো। ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ছাত্র জীবন হতে এদিকে আমি আকৃষ্ট হই। শুরু করি গ্রাম পরিক্রমা। সংগ্রহ করি ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা উপাদান। এই সংগ্রহকালে লোকসংস্কৃতির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হই আমি। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ছড়া, গ্রাম্য গান, পাঁচালী, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালি, ধাঁধাঁ, লোককথা, লোকগাথা, কাহিনী-কিংবদন্তী ও নানা লোকশিল্প সংগ্রহ করি। "লোককথা" সংগ্রহ করেছিলাম অল্পস্বল্প। এই সময় পত্রযোগে আলাপ হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদধন্য "হারামণি"-খ্যাত মরহুম মনসুর উদ্দীন সাহেবের সাথে। তিনি পত্রযোগে আমার লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের খোঁজ-খবর নেন। তারপর তিনি আমাকে গ্রামবাংলার মানুষের নিকট হতে আরও বেশী "লোককথা" সংগ্রহ করতে বলেন। এরপর শুরু হয় আমার "লোককথা"র রাজ্যে প্রবেশের। গ্রাম বাংলার চাষা, কৃষক বধূ, ফকীর, পটুয়া ও নানাজনের সঙ্গে মিশি এবং বিভিন্ন স্বাদের লোককথার সন্ধান পেয়ে তা সংগ্রহ করি। এই সময় অনুভব করি সাধারণ মানুষের মনের গহনে ভরা আছে কি অসাধারণ সম্ভার!

সংগ্রহকালে রোদে পুড়ে, পায়ে হেঁটে যে গ্রামে পৌঁছালাম, লোককথা সংগ্রহের জন্য, সেখানে গিয়ে শুনলাম সেই বিশেষ ব্যক্তিটি নাই, অন্য গ্রামে কাজে চলে গিয়েছেন। এইভাবে ঘোরাফেরার পর হ'য়তো সংগ্রহ হ'লো একটা লোককথা। এইভাবে নানা কষ্ট স্বীকার ক'রে লোককথাগুলি সংগ্রহ করেছি।

বৈষ্ণব সাধক পণ্ডিত ৺ড: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় আমাকে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

সাধক কবি ও গবেষক এম. আব্দুর রহমান, সাহিত্যভারতী, অনুসন্ধান বিশারদ আমার এই সংগ্রহের কাজে সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন, আজও দিচ্ছেন।

বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত মুহম্মদ ইসমাইল বিদ্যানিধি, আমার এই সংগ্রহ কাজে উৎসাহ ও সংগৃহীত উপাদানগুলি দেখে নিজে যেমন পুলকিত হয়েছেন, আমাকেও তেমনি সস্নেহে আজো সংগ্রহের উদ্দীপনা যোগাচ্ছেন।

সর্ব্বশ্রী সুধী প্রধান, মাণিক সরকার, রামশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীগোপীনাথ সেন, পুলকেন্দু সিংহ, পবিত্র সরকার, দুলাল চৌধুরী ও মানস মজুমদার প্রমুখ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন সংগ্রহ কর্মে।

"পল্লীগীতি ও লোকগাথা"-র অন্যতম সংগ্রাহক শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব পত্রদ্বারা এই সংগ্রহ কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

মরহুম মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব আমার লোককথাগুলির সংক্ষিপ্তসার পাঠ করে বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। বইটি ছাপা যখন শেষ হলো তখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, চলে গিয়েছেন পরলোকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমার লোককথার ছাপা বইটি দেখার। এজন্য আমিও আজ দুঃখবোধ করছি।

কাটোয়া কুমোর পাড়ার তরুণ পটুয়া শ্রীমান মাণিক মণ্ডল আমার এই বইটির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন নিজের শিল্পীমন নিয়ে। তাঁকেও স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাই।

কাটোয়া শ্যামল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর কর্মীবৃন্দ মুদ্রণ কাজে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। উক্ত প্রেসের পক্ষে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত ননী রায় মহাশয় আমার প্রতি স্নেহবশতঃ

স্বেচ্ছায় প্রুফ দেখার ভার নিয়ে প্রুফ দেখে দিয়েছেন ; এজন্য তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আজ সেইসব মানুষদের স্মরণ করি যাঁদের নিকট হতে লোক-কথাগুলি সংগ্রহ করেছি। তাঁরা কৃষিজীবি, সারাদিন কর্মক্লান্তির পর সন্ধ্যায় তাঁদের আমি বিরক্ত করেছি লোককথা সংগ্রহের জন্য। কিন্তু তাঁরা বিরক্ত না হ'য়ে উৎসাহ ভ'রে আমাকে লোককথাগুলি শুনিয়েছেন। বিশেষ করে সেইসব গ্রাম্য মহিলাদের আজ আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি, যাঁরা আমার কথা শুনে স্বেচ্ছায় আমাকে বিভিন্ন লোককথা শুনিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পরিচালিত বাংলা একাডেমীর আর্থিক সাহায্য না পেলে লোককথাগুলি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হতো না। এই আর্থিক সাহায্যের জন্য একাডেমীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই 'লোককথা' সংগ্রহ ও ছাপা ইত্যাদি নিয়ে আমাকে যাঁরা আন্তরিক সহায়তা দিয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীরাধাশ্যাম আচার্য, মহবুবা খান ও আব্দুল করীম প্রমুখ। ইঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাই। প্রুফ দেখার মধ্যে কিছু বানান ভুল হয়তো রয়ে-গেছে। এর জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

লোককথাগুলি সংগ্রহকালে লোককথার অধিকাংশ কথকগণ লোককথাটি শেষ করে একটি বিচিত্র ছড়া কাটতো, তাহলো :

'আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো
: হ্যাঁ নটেগাছ মুড়ালি কেনে ?
: গরুতে খায় কেনে ?
: হ্যাঁ গরু খাস্ কেনে ?
: রাখাল চরায় না কেনে ?
: হ্যাঁ রাখাল তু চরাস না কেনে ?

: গিন্নী ভাত দেয় না কেনে ?

: হ্যাঁ গিন্নী ভাত দিস্ না কেনে ?

: কলার পাত্ পড়ে না কেনে ?

: হ্যাঁ কলার পাত্ পড়িস্ না কেনে ?

: জল হয় না কেনে ?

: হ্যাঁ জল হয় না কেনে ?

: ব্যাঙ ডাকে না কেনে ?

: হ্যাঁ ব্যাঙ ডাকিস্ না কেনে ?

: সাপে খায় কেনে ?

: হ্যাঁ সাপ তুই খাস কেনে ?

: খাবার ধুন খাবো

: গুড়গুড়িয়ে যাবো।

ইতি

শ্রদ্ধাবনত

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন

গ্রাম—রাজুয়া

ডাকঘর – চুরপুনী

থানা – কাটোয়া

জেলা – বর্ধমান (পঃ বঃ)

ঈদ্-উল্-ফিত্র / ১৪০৮ হিজরী

সন ১৩৯৫। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ

ইং ১৮ই মে, ১৯৮৮

: সূচিপত্র :

		পৃষ্ঠাঙ্ক
	প্রসঙ্গকথা—	I
১।	আয়নাবতী—	১
২।	শ্বেত বসন্ত—	১১
৩।	জ্ঞারেবত—	৪০
৪।	জলদানা রাজকন্যা—	৪৮
৫।	রত্নমালা—	৫৪
৬।	চাষী, তার স্ত্রী ও পুত্র	৫৮
৭।	চতুরঙ্গ ফল—	৬০
৮।	রাজপুত্র ও তার চার বন্ধু	৬৮
৯।	কণ্ঠকমল পাখী—	৮২
১০।	আপাং দুলাল—	১১৮
১১।	চোর চক্রবর্তী—	১২৮
১২।	সতী কমলা—	১৪০
১৩।	মধুমালা—	১৫৩
১৪।	ভাগ্যধর—	১৬১

		পৃষ্ঠাঙ্ক
১৫।	সাদ ও সাইদ—	১৬৮
১৬।	ঠাকুর ও তার ভৃত্য মধুসূদন—	১৮২
১৭।	চার নাগর চাঁদা—	১৯৪
১৮।	পুনকাবতী—	১৯৯
১৯।	সিঁদুর—	২০৯
২০।	চূনী—	২১৪
২১।	রত্নমালা—	২১৭
২২।	সর্ষীসোনা—	২৩২
২৩।	মিয়াফল—	২৪৫
২৪।	পটুয়াদের পট আঁকার আদিকথা—	২৫৩
২৫।	চাব বিলাস—	২৫৭
২৬।	লিঙ্গ বদল—	২৬২
২৭।	গব্য গরাং—	২৬৫

যে সব গ্রন্থাবলীর সাহায্যে "প্রসঙ্গ কথা" লিখিত হয়েছে তার তালিকা

(১) বাংলার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) লোকসাহিত্য (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

(৩) পূর্ব বাঙ্‌লার লোকসংস্কৃতি—ডঃ দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত

(৪) বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন

(৫) বেদ-সম্পাদনা—হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা

(৬) কোরান শরীফ—মোবারক করিম জওহর অনূদিত

(৭) ধর্মপদম্‌—হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত

(৮) শেকশুভোদয়া—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত

(৯) **Motif Index of Folk Literature—Thompson Stith**

(১০) আর্য সভ্যতার সন্ধানে—খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(১১) শারদীয়া নূতন পত্রিকা (বর্ধমান) ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

(১২) আলমগীরনামা—এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত

(১৩) **Rehala of Iban Batuta—**

(১৪) বিশ্বপরিচয়—দেবসাহিত্য কুটীর

(১৫) লোকসাহিত্য (৪র্থ খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

॥ প্রসঙ্গ কথা ॥

আমরা ভারতীয়। ভারতের যে কোন প্রান্তের সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাক্-ইতিহাস যুগে, ভারতের বুকে যে প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছিল, আমরা তাদের উত্তর পুরুষ। তাদের রক্তের ধারা, আমাদেব শিবা-উপশিরায় যেমন প্রবাহিত, তাদের দেহের গঠন ভঙ্গিমা তেমনি আমাদেব অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে তরঙ্গায়িত। তাদের সম্পদের ও নিবাসভূমির যেমন আমবা অধিকারী, তেমনি তাদেব সংস্কৃতিরও আমবা উত্তবাধিকাবী। তাদের সংস্কৃতির ধারা আমাদের জীবন ধারায় প্রবাহিত। বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নানা অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত, যথা:— অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাভূমি, অরুণাচল, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর ও কেরল প্রভৃতি। একদা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল অবিভক্ত। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে হ'লো দুটি রাষ্ট্র— "ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্র" ও "পাকিস্তান"। পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকল, আর বঙ্গের বাকী বৃহত্তর অংশ "পূর্ব পাকিস্তান" নাম নিয়ে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হলো। কয়েক বৎসর পূর্বে "পূর্ব পাকিস্তানের" বাঙালীরা সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা ক'রল "বাংলাদেশ" নামক এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। পরে সেখানে আবার পট পরিবর্তন হয়েছে। 'গণতন্ত্রকে' ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ আজ উত্তাল। ইতিহাস চলমান। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত বঙ্গদেশ নানা প্রাচীন বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা:— রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, গৌড়, দণ্ডভুক্তি, সমতট, বঙ্গ, হেরিকেল ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন ইত্যাদি। উত্তর ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা পূর্ব-বাহিনী হয়ে এসে রাজমহলের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এর প্রধান ধারা পদ্মা নাম নিয়ে চলে গেছে বাংলাদেশে। এর

অন্য একটি শাখা ভাগীরথী নাম নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির কাছাকাছি দক্ষিণবাহিনী হয়ে বেরিয়ে এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন বিভাগের বরেন্দ্র, রাঢ়, দণ্ডভুক্তি এবং ব্যাঘ্রতটী বা বাগড়ীর কিছু ও পুণ্ড্রের কিছু আছে। ছোটনাগপুর পর্বতমালা হতে পূর্ববাহিনী হয়ে বয়ে এসেছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, কংসাবতী ও রূপনারায়ণ পড়েছে এসে ভাগীরথীর বুকে। উড়িষ্যার প্রান্ত হতে বেরিয়ে এসেছে সুবর্ণরেখা, মিশেছে গিয়ে সাগরে। গঙ্গার উত্তরে বরেন্দ্র, গঙ্গার দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিমে ও সুবর্ণরেখার উত্তরের বিরাট ভূভাগ—রাঢ়, সুবর্ণরেখার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের নাম দণ্ডভুক্তি, ভাগীরথীর পূর্বাংশে ব্যাঘ্রতটী বা বাগড়ী, বাগড়ীর পূর্বের স্বল্পাংশ পুণ্ড্র। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, করতোয়া, জলঢাকা, মহানন্দা ও তোরসা প্রভৃতি নদী পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে প্রবাহিত এইসব নদীর বহু উপনদী, শাখানদী ও কান্দর আছে। এগুলির বিচিত্র বিচিত্র নাম, যেমন: কুনুর, কোপাই, চন্দ্রভাগা, বাবলা, সিঙ্গটীয়া, ফড়ে, ব্রহ্মাণী, গোঁড়, খড়ি, বেহুলা, কানা, গাঙ্গুড়, রত্নাণু, গুসকরা, আহার, পূর্ণিমা, চূর্ণি, কুমার ও জলঙ্গী প্রভৃতি। এইসব নদনদীর তীরবর্তী ও মধ্যবর্তী অঞ্চলে একদা প্রাগৈতিহাসিক যুগে গড়ে উঠেছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। এই সব নদীতীরবর্তী ও মধ্যবর্তী অঞ্চলে মাটির নীচে কৃষিভিত্তিক জীবনচর্যার বহু প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তনকারী জনগোষ্ঠী একদা তাদের সমাজ জীবনে, ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, উৎসব-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবর্তন ক'রেছিল এক সংস্কৃতির ধারা। সভ্যতার সেই উষাকাল থেকে, সেই পূর্বপুরুষদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা উন্নত হ'তে আরও উন্নত হয়ে মানবধারার সাথে সাথে চলে এসেছে আমাদের কাছে। আবার তা পৌছে যাবে আমাদের মাধ্যমে আমাদের উত্তর পুরুষদের জীবনে। সংস্কৃতির এই ধারা মুখে মুখে, কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়ায়, গানে, গাথায়,

লোককথায়, পাঁচালী ,ও ঝুমুরের ছন্দে, নৃত্যে, গীতে, হেঁয়ালি-ধাঁধাঁয়, কাহিনী-কিংবদন্তীতে, কথায়-উপকথায়, রূপকথায়, রূপকের কথায় যেমন চলেছে, তেমনি চলেছে মন্দিরে, মসজিদে, চণ্ডীমণ্ডপে, দলিজে, খানকায়, মাটির কাজে, মাঠের কাজে, কাঠের কাজে, কৃষাণ-কৃষাণীর মুখে মুখে, নাঙ্গল-যোঁয়ালে, গরুর গাড়ীর চাকায়, টপ্পরে, জলসেচা তুনিতে, সিনিতে, কোদালে, বিদেই-মই-এ, কাস্তেতে, মাথালি-পেকেয়, পাঁচালিতে, বাউল-বৈরাগীর একতারায়, গুপীযন্ত্রে, খঞ্জনীতে, ডুবকীতে, ঢোলকে, লাউএর খোলে, বায়েনের ঢোলে, খোলে, গায়েনের গানের তালে, কাঁসীর ধ্বনিতে, তাল-পাতার বাঁশিতে, ছুতোরের কাঠকাটা করাতে-বাসুলী-বাঁটালিতে, কুমোরের চাকে, কামারের হাপরে, নাপিতের চুলকাটা ক্ষুর-কাচিতে, ধোপানীর পাটে, তাঁতির তাঁতে, ময়রার ভিয়েনের কড়াইয়ে, চর্মকারের জিনিসে, পাটনীর নৌকায়, ডোঙ্গায়, সেঁউ-তিতে, জেলের মাছধরার জালে, কুড়ুনীর গোবর-কুড়ানো ঝুড়িতে, ফকিরের বেহালা ও সারিন্দায়, রাখালের পাঁচনে, ডাহুক-ডাকা গাছে, বটগাছের তলে, দীঘি ও পুকুরের পাড়ে, ধানভানা ঢেঁকি ও কুলোতে পালকি ও ডুলিতে, আঁকা-বাঁকা মজানদী ও কাঁদরের কূলে, বনে-বাদাড়ে, ডাঙ্গালে, ধান, গম, আইড়ির ক্ষেতে, মা, মাসী-পিসীর, খালা-ফুফু, দাদী-নানী, ঠাক'মা-দিদিমা, ঠাকুরদা'-র মুখে ও সিঁদুর-মাখানো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে, রাঙাচেলীর নোলক পরা গ্রাম্য বধূর শাড়ীর আঁচলে বাঁধা ছোরানে কত শত ঢেউ বয়ে চলে আসছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সাথে। এ সবের মাঝে লুকিয়ে-ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান তথা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও।

[*লোকসংস্কৃতি*] ইংরাজীতে ফোকলোর (**Folklore**) বলে একটি শব্দ আছে। শব্দটি সারা বিশ্বে এখন বহুল প্রচারিত। এই ইংরাজী শব্দটির বাংলা বা ভারতীয় প্রতিশব্দ কী হবে, এখনও পণ্ডিতগণ তা স্থির করতে পারেন নি। এর প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে

কেহ বলেছেন লোকবিজ্ঞান, কেহ বলেছেন লোকায়ন, কেহ বলেছেন লোকযান, কেহ বলেছেন লোকশ্রুতি, কেহ বলেছেন লোকবৃত্ত। কেহ বলেছেন লোকলোব এবং কেহ বলেছেন লোকচর্যা। কিন্তু সকলের অগোচরে ধীরে ধীরে 'লোক সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী Folk lore শব্দের বাংলা তথা, ভারতীয় প্রতিশব্দ হয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় কে প্রথম Folklore শব্দের প্রতি-শব্দরূপে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা আজ গবেষণার বিষয়। লোকসংস্কৃতিবিদ্ প্রয়াত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর ইংরাজী 'Folk Lore of Bengal' নামক পুস্তকটি ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে। নাম দেন 'বাংলার লোকসংস্কৃতি।' অনূদিত এই পুস্তকে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "ভারতীয় ভাষায় Folklore শব্দটির সর্বজন গৃহীত কোন প্রতি-শব্দ নেই; অনেকে অনেক রকম ভাব অনুবাদ করেছেন, কেউ কারো অনুবাদ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেননি। যদিও 'লোক-সংস্কৃতি' শব্দটি দিয়ে ইংরেজী Flok lore শব্দটির ভাব পুরো-পুরি বুঝায় না, তথাপি শব্দটি এই অর্থে বহুল প্রচারিত হয়েছে বলে শব্দটি এখানে গ্রহণ করা হলো।" ডঃ ভট্টাচার্য্য তাঁর উক্ত অনূদিত পুস্তকে স্বীকার করেছেন লোকসংস্কৃতি শব্দটি "বহুল প্রচারিত হয়েছে।" এর কারণ কি? কারণ একটাই। তা হলো: পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় এসে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের মাধ্যমে গঠিত করেছিলেন, "লোক সংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদ।" এই পরিষদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে ১৯৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান বিভা-গের পুরুলিয়া, প্রেসিডেন্সী বিভাগের বহরমপুর ও জলপাইগুড়ি বিভাগের জলপাইগুড়ি শহরে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি উৎসব ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সমগ্র পশ্চিম বাংলার সকল জেলার গ্রামাঞ্চল হতে যেমন এসেছিলেন লোকশিল্পীগণ, তেমনি এসেছিলেন এ বিষয়ে গবেষক, অনুসন্ধিৎসু ও সাংবাদিকগণ।

লোকসংস্কৃতি উৎসবের মাধ্যমে 'লোক সংস্কৃতি' শব্দটি বহুল প্রচারিত হয়। এরপর উক্ত সরকারি বর্ষ হ'তে শুরু হয় জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতি উৎসব ও ওয়ার্কশপ। এই সব জেলার উৎসবগুলিতে প্রতি জেলার গ্রামান্তর হ'তে যেমন লোকশিল্পীগণ এসেছিলেন, তেমনি এসেছিলেন প্রতি জেলার উৎসাহী গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও পঞ্চায়েত কর্মীগণ। এই শব্দটি ছড়িয়ে পড়ে সারা পশ্চিম বাংলায়। এরপর হয় পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র রাজধানী কলিকাতা শহরের রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার আসে। অধ্যাপক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু, গায়ক, সাংবাদিক ও কলিকাতার সংস্কৃতিপ্রেমীদের মনে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি মনের গহনে লাভ করে স্থায়ী আসন। প্রথম রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার এক তরজা গায়ক লোকশিল্পী শ্রীআব্দুস সাত্তার লোকসংস্কৃতি মঞ্চে উঠে একটা তরজা গানের ধুয়ো ধরেন:—

"বামফ্রন্ট সরকার করিলেন
লোকসংস্কৃতি মেলা।
জুটেছে উভয় পক্ষে উপলক্ষ্যে
পুরুষ আর ঐ মহিলা॥
বামফ্রন্ট সরকার করিলেন
লোকসংস্কৃতির মেলা॥"

—দ্বিতীয়বার আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি উৎসব যখন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত হয়, তখন একজন ঢুলি লোকসংস্কৃতি মঞ্চে ঢোলের বোলে "লোকসংস্কৃতি", "লোকসংস্কৃতি" শব্দটি তুলে সকলের প্রশংসাহ হন। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে "লোকসংস্কৃতি উপদেষ্টা পরিষদ" ও পরে নাম পরিবর্তন হয়ে লোকসংস্কৃতি পর্ষদের পরামর্শক্রমে 'গ্রাম', আঞ্চলিক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি উৎসবের মাধ্যমে

বহুল প্রচারের ফলে "লোকসংস্কৃতি" শব্দটিকে আমরা পেয়েছি। বলা যেতে পারে লোকসংস্কৃতি উৎসবের মানস সরোবরে, ইংরাজী Folklore শব্দের প্রতিশব্দরূপে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে "লোক-সংস্কৃতি" শব্দটি।

এখন "লোকসংস্কৃতি" শব্দটি নিয়ে সামান্য একটু বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই এই শব্দটি ইংরাজী Folklore শব্দের চরিত্রের অনুরূপ। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম জন থমস্ নিরক্ষর জনগণের সাংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বোঝানোর জন্য সর্বপ্রথম Folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। শব্দটি প্রথমে Folklore ছিল না। Folk ও lore নামক দুটি আলাদা আলাদা শব্দ নিয়ে মাঝে একটি 'হাইফেন' দিয়ে শব্দটি ব্যবহার করা হতো। দুটো শব্দই ছিল আলাদা আলাদা অর্থবহ। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে Folk-lore Society গঠিত হয়। মুখপত্রটির নাম হয় "Folk-lore Records' পরে "Folk-lore আরও পরে Folklore। Folk শব্দটি প্রথম দিকে ইংরাজীতে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হতো। পরে শব্দটির অর্থ সংকোচন হয়; জনসাধারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জার্মাণ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শব্দটির অর্থ যথাক্রমে 'সাধারণ গণ-সমাজ", "সমাজের নিম্ন উপজাতি", "মৌলিক সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠী" ইত্যাদি করা হয়। "lore" শব্দটির প্রাচীন টিউটনিক অর্থ হলো "জ্ঞান দান বা আহরণ করা"। সারা পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষায় গঠিত এই "Folklore" শব্দটি প্রচারিত হয়ে গেছে। Folklore বলতে আমরা Folkloreই বুঝি। এর কোন ভাষাগত অর্থ নেই। আছে মনে মনে উপলব্ধি। "লোকসংস্কৃতি" এখন আমাদের কাছে Folklore শব্দের প্রতিশব্দ হয়ে গেছে। শব্দটি "লোক" ও "সংস্কৃতি" দুইটি আলাদা আলাদা শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে। 'লোক' শব্দটির অর্থ দুইটি: যথা— (১) 'লোক' অর্থে জনসাধারণ বা মনুষ্য, যেমন "লোকে লোকারণ্য"। (২) "লোক" শব্দ আবার ভুবন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। যথা মনুষ্যলোক, স্বর্গলোক, কিন্নর লোক, 'দেবলোক', পরলোক প্রভৃতি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির একটা ব্যাপক অর্থ আছে। পৃথিবী বা মনুষ্যলোকের যে কোন একটা প্রান্তের মনুষ্য সমাজের রীতি, নীতি। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষি-শিল্প তথা মানবমণ্ডলীর সমগ্র জীবনচর্যাকেই বুঝায়। 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ভাবগত অর্থ হচ্ছে সমগ্র মনুষ্য-লোকে বসবাসকারী লোকমণ্ডলীর সমগ্র জীবনচর্যা। ইংরাজী Folklore শব্দটি এই একই অর্থের দ্যোতক। তাই এই শব্দটি ইংরাজী Folklore শব্দের উপযুক্ত ভারতীয় প্রতিশব্দ।

। ***লোকসংস্কৃতির বিভাজন*** । লোকসংস্কৃতিকে লোক-সংস্কৃতিবিদ পণ্ডিতগণ নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। আমি লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছি। দেখেছি বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব, পার্বণ, মেলা ইত্যাদি। গভীরভাবে মিশেছি বাংলার আপামর জনের সঙ্গে। এই দেখাশুনা ও মেলামেশায় আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার আলোকে "লোকসংস্কৃতি"-কে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভাজন করলাম। যথা—(ক) লোকসাহিত্য (খ) লোকসঙ্গীত (গ) লোকনাট্য (ঘ) লোকনৃত্য (ঙ) লোক-বাদ্য (চ) লোকশিল্প (ছ) লোকবিদ্যা (জ) লোকশিক্ষা (ঝ) লোককর্ম (ঞ) লোকক্রীড়া (ট) লোকচিকিৎসা ও ঔষধ (ঠ) লোকখাদ্য (ড) লোক আচার (ঢ) লোকসংঘর্ষ (ণ) লোক উৎসব ও পার্বণ ও (ত) লোক দেবতা ইত্যাদি। এই বিভাগ-গুলির আবার নানা উপবিভাগ আছে। তা হলো—

(ক) লোকসাহিত্য :—লোককথা, ছড়া, লোকগাথা, হেঁয়ালি, ধাঁধাঁ, কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রবাদ, প্রবচন, ব্রতকথা ও মরছিয়া বা শোকগাথা।

(খ) লোকসঙ্গীত :—পাঁচালী, তরজা, কবির লড়াই, শাঁখী, বাউল, বাঁদ, ময়ূরপঙ্খী, ঘেঁটু, পট, ফকিরী, মুসলিম বিয়ে, পীরের

ভাওইয়া, অষ্টক, ভাদু, ঝাঁপান, হাপু, বোলান, ছাদ পেটানো, সইফুল. গাড়োয়ান, ভারতোলা, নলকূপ বসানো, যাঁতা পেষা, সুতা কাটার গান এবং আর অনেক।

(গ) লোকনাট্য :—লেটো, আলকাপ, ছেঁচ্ড়া, গম্ভীরা, কৃষ্ণযাত্রা, সত্যপীরের গান, মাণিক পীরের গান, বেহুলার ভাসান-যাত্রা, লোককাহিনী, কাপঝাঁপ, কুষাণ ও কাপ (মুসলিম বিয়ে গানে) ইত্যাদি।

(ঘ) লোক নৃত্য :—গাজন, বোলান, ঝুমুর, ভাঁজো, কথক, ছৌ-নাচ, পুতুল, বাঘ, কাঠি, ঘোড়া, পাতা, মাদার, সাঁওতালী, রাভাদের মাছধরা, ওঁরাওদের কাঠি, মহরমের লাঠি, বাঙালীর উজুলি পিজুলি, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের নাচ।

(ঙ) লোকবাদ্য :—ঢাক, ঢোল, বাঁশী, কাঁসী, ডুবকী, ঢোলক, মাদল, বেহালা, সারিন্দা, খঞ্জনী, একতারা, দো-তারা, তানপুরা, গাব্‌গুবাগুব্‌, ঘুঙুর, টামাক, তুমদা, সাড়পা, সাকেয়া ও বিষম ঢাকী ইত্যাদি।

(চ) লোকশিল্প :—মাটির কাজ, শোলার কাজ, বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, শীতলপাটি, তালপাতা, সুতো ইত্যাদির হাত পাখা, আলপনা, নক্‌শীকাঁথা, পট, নকশা, দেওয়াল চিত্র, ধাতুর কাজ, মাটি ও ধাতুর তৈরি মূর্তি, পাথরের তৈরী নানা দ্রব্য, হাতির দাঁতের কাজ ও সুতোর নানা কাজ ইত্যাদি।

(ছ) লোকবিদ্যা :—মন্ত্র, তন্ত্র, কৃষি, শিল্প, নৌ-চালনা, মাছ ধরা, গোপালন ও সাপ ধরা ইত্যাদি বহু বিবিধ কাজের প্রণালী মনেরাখা ও শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া।

(জ) লোক শিক্ষা :—দেশের এক একজন মানুষ এক এক রকম বা অনেক রকম বিদ্যা জানেন, তাদের নিকট গিয়ে এই লোকবিদ্যার শিক্ষা নেওয়া, প্রয়োগ করা ইত্যাদি হলো লোক-শিক্ষা। এইসব লোকশিক্ষা হলো রান্না-বান্না, খাবার তৈরী ইত্যাদি শিক্ষা, কৃষির কাজ, শিকার, পশু বধ, চামড়া, মাংস ও হাড় আলাদা করা ইত্যাদি বহু বিবিধ কাজ শিক্ষা করা।

(ঝ) লোককর্ম :—কৃষি, জলসেচ, নৌ চালনা, বিদে, কোদাল-ফাউড়া চালান, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, চামার, তাঁতী, ছুতোর, মাছধরা ও খৎনা (Circumcision) ইত্যাদি।

(ঞ) লোকক্রীড়া :—হা-ডু-ডু, কপাটি, নোনডাড়ী, রাই-বেঁশে, খেটে খলা ও মালামো ইত্যাদি।

(ট) লোকচিকিৎসা ও ঔষধ :—ভারত তথা গ্রামবাংলায় বহু লোকচিকিৎসক আছেন, এঁরা গাছ গাছড়া, জড়ি বুটি, মন্ত্র, তন্ত্র, কোরান শরীফের সুরা পাঠ ইত্যাদি দ্বারা ভূত-ছাড়ানো, উলাওঠায় মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও পাখী ইত্যাদির চিকিৎসা করে থাকেন। এঁরা হলেন ওঝা, গুণীন ও পীর প্রভৃতি।

(ঠ) লোকখাদ্য :—ভাত, মুড়ি, মুড়কী, মোয়া, নাড়ু, ধকি, পাটালি, খণ্ড, পিঠে, ভুরো, ফুলবাতাসা, পাকান, আঁদশা, ছুড়ুম, ঝাঁকিয়া, সরুচিকুলী, পায়েস, ক্ষীর, চিড়ে, মোরব্বা, আচার সিরকা, কাঁজি, ভাডজাড়ো গুড়, শিরণী, কিরণী, হালুয়া, পুয়ো, ফলড়ি, বেগুনি, আলুর দম, আলুর চপ ও তরিতরকারী ইত্যাদি।

(ড) লোক আচার :—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, নামকরণ, উপনয়ন, উৎসব, পার্বণ ও কৃষি ইত্যাদি উপলক্ষে নানা মেয়েলী, গ্রাম্য বা লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা।

(ঢ) লোক সংঘর্ষ :—পৌষ স্নানের মারামারি বা পিঠে লড়াই, কার্ত্তিক লড়াই, নারকেল কাড়াকাড়ি বা নন্দোৎসব গ্রাম্য দেবতার পূজা উপলক্ষে স্থানীয় সংঘর্ষ, মহরমের লাঠি খেলা ও মূকাভিনয় ও গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে বলির পাঁঠার মুণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি ইত্যাদি।

(ণ) লোক উৎসব ও পার্বণ :—মেলা, ডাক, মুঠ, নবান্ন, বেরা, ঈদ, শব-ই-বরাত ও শিকার ইত্যাদি।

(ত) লোক দেবতা :—ষাট্ মা, ওলাবিবি, রঙ্গিনী, পাঁচু ঠাকুর, পাঁচু শাহ্ পীরের মকবেরা ও আতুর আড়ার বৃক্ষ ইত্যাদি।

লোককথার উৎস সন্ধানে :—লোকসংস্কৃতির লোক-সাহিত্য শাখার অন্যতম উপশাখা লোককথা। লোককথা শব্দটি "লোক" ও "কথা" নামক আলাদা আলাদা দুইটি শব্দ দ্বারা গঠিত। "লোক" শব্দটির স্বল্প ব্যাখ্যা "লোকসংস্কৃতি" আলোচনা প্রসঙ্গে করার চেষ্টা করেছি। এখানে সেই একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। এখন "কথা" শব্দটির ব্যাখ্যা : 'লোক' অর্থে মানুষ এবং 'লোক' অর্থে স্থান। এই লোক বা মানুষের মুখগহ্বর বিশ্বস্রষ্টা, এমন সুনিপুণ ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে লোক বা মানুষ তার জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, চোয়াল, তালু, কণ্ঠ ও নাক ইত্যাদির সঞ্চালনে অর্থবহ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই অর্থবহ উচ্চারণ হলো "কথা"। মানুষের মত অর্থবহ উচ্চারণ পশু, পাখী, সরীসৃপ ও জলজ প্রাণী করতে পারে না। এইজন্য মানুষকে বলা হয় "আশরাফুল মখলুকাত" অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

মানুষ ও কথা :—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষই শক্তি রাখে অর্থবহ কথা বলার। এই বিশ্বলোকে বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষ। ভূ-পৃষ্ঠের এক এক স্থান এক এক প্রকার, যেমন—কোন কোন স্থান সবুজ বৃক্ষশোভিত তৃণমণ্ডিত সমতল ভূমি, কোন কোন স্থান বনময়, কোন কোন স্থান তৃণময়, কোন কোন স্থান মরুভূমি ও পর্বতময়, কোন কোন স্থান আবার বরফে ঢাকা, কোন কোন স্থান বন্ধুর, কোন কোন স্থান নদ-নদী বেষ্টিত জলময় ও কোন কোন স্থান শুধু জলময়। জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির জন্য কোন স্থান গ্রীষ্মপ্রধান, কোন স্থান শীত প্রধান, কোন স্থান নাতিশীতোষ্ণ ও কোন স্থানের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। মানুষ উক্ত সব এলেকাতেই বসবাস করে। এই সব বসবাসের জন্য কোন মানুষ ফর্সা, কোন মানুষ কালো, কোন মানুষ ঘোর কালো ও কোন কোন মানুষ পীত। ঐ একই কারণে কেহ কৃশ, কেহ স্থূল, কেহ দীর্ঘ, কেহ খর্ব ও কেহ নাতিদীর্ঘ। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু ও দৈহিক গঠন ইত্যাদির

জন্য মানুষ বিভিন্ন ভাষাভাষী। এইসব কারণের জন্য পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী।

পৃথিবীর যে কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যখন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তখন সেই সেই গোষ্ঠীর মানবশিশু মাতৃদুগ্ধ পান ক'রে ধীরে ধীরে বড় হয়। তারপর শিশু এক বিশেষ বয়সে নিজ গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতে শেখে। শিশু প্রথমে মায়ের মুখে, তারপর বাড়ীর আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীর নিকট, তারপর ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র, বিবাহ, কুটুম্বিতা, খেলাধূলা, বিদেশযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ ও নানা প্রকার ভাষার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে, কথা বলতে শেখে। তাই "কথা" শব্দটির সাধারণ ও প্রথম অর্থ হলো লোক বা মানুষের মুখে উচ্চারিত স্বভাষাভাষীর বোধগম্য অর্থপূর্ণ শব্দ কিন্তু এই "কথা" শব্দটির আর একটি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। তা'হলো এই বিশ্বলোকে বসবাসকারী মনুষ্য জীবনধারা ও সংগ্রামময় জীবনের কাহিনী। সেই আদিম যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কথায় কথায় চলে আসছে মনুষ্য জীবনের সংগ্রামধারার কথা। এই কথার উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে অনেক দূরে, সেই আদিম মানব বসতি-কালে। কিন্তু সেই আদিমযুগের মানুষ এখন বেঁচে নাই। আছে তাদের বংশধর ও নানা প্রকার প্রত্ন-নিদর্শন কিংবা ভাষার কিছু কিছু চিহ্নাবশেষ।

পৃথিবীতে মানুষের জন্মকাল—পৃথিবীতে মানব বসতি কখন শুরু হয়েছিল? এ নিয়ে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। তবে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়সকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন: যথা—(১) প্রত্নজীবক (Palaeozoic), (২) মধ্যজীবক (Mesozoic) ও (৩) নব্যজীবক (Cainozoic)। এই প্রতিটি বিভাগ আবার নানা উপবিভাগে বিভক্ত। নব্যজীবকে শুরু হয়েছিল মানব বসতি। এই নব্য জীবক (Cainozoio) আবার সাতটি বিভাগে বিভক্ত: যথা—

(১) প্রাগাধুনিক (Eocene), (২) অল্লাধুনিক (Oligocene) (৩) মধ্যাধুনিক (Miocene) (৪) বহ্বাধুনিক (Poliocene). (৫) অন্ত্যাধুনিক (Pleislocene), (৬) উপাধুনিক (Sub-holocene) এবং (৭) আধুনিক (Holocene) ইত্যাদি। নব্যজীবক যুগের কোন উপযুগে পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি শুরু হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ থাকলেও সকল ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত একমত যে অন্ত্যাধুনিক যুগ হতে পৃথিবীতে মানব বসতি শুরু হয়েছিল। লোককথার উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের এই অন্ত্যাধুনিক উপযুগ হতে মানব বা লোকের উষা-কালীন জীবনযাত্রা হতে অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। কিন্তু এই কথা লেখা যত সহজ, সন্ধান করা তত সহজ কাজ নয়। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি সেযুগের মানুষ আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে নাই। তবে তাদের উত্তরপুরুষ আমরা বর্তমান। আমাদেরই লোকজীবনচর্যা হতে সন্ধান করতে হবে লোককথার উৎসের।

ধর্মগ্রন্থে মানুষের জন্মকথা :—প্রাচীন মানব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইসব ধর্মগ্রন্থে মানুষের জন্মকথা আছে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো "জবুর", "তওরাত", "ইঞ্জিল", "কুর-আন", "বেদ" ও "জেন্দাবেস্তা" প্রভৃতি। এই গ্রন্থগুলির প্রথম চতুষ্টয় হতে জানা যায় যে সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা সর্বপ্রথম হজরত আদমকে তৈরী করে তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন; তারপর তার বাম পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করেন তার সঙ্গিনীকে যাঁর নাম ঈভ বা হাওয়া। তারা স্বর্গের উদ্যানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। সর্বশক্তি-মানের আদেশ অমান্য করে এক দেবদূত শয়তান হয়ে যায়। এই শয়তানের প্ররোচনায় আদি পিতা ও আদি মাতা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে মর্ত্যে নেমে আসেন। এই আদি পিতা-মাতার সন্তান পৃথিবীর মনুষ্যকুল। আদিপিতা সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে এক পর্বতশৃঙ্গে অবতরণ করেছিলেন। বর্তমান শ্রীলঙ্কার "আদমশৃঙ্গ" নামক পর্বতটি

এই পর্বত বলে অনেকে মনে করেন। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর উপর "আদমের সেতু" (ADAM'S BRIDGE)-র নিদর্শনও আছে বলে অনেকের ধারণা। সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এই সময়টা অন্ত্যাধুনিক যুগ ছিল।

"বেদ" আর্য জাতির ভারতীয় শাখার ধর্মগ্রন্থ; বেদের দশাবতারের কথা আছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য অবতারের সৃষ্টি। দশাবতার হলো মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভৃগুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। মৎসাবতারের সময় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় হয়েছিল। জলমগ্ন হয়েছিল পৃথিবী। মনু একটা নৌকায় উঠে একটা বড় মাছের কাঁটায় বেঁধে রেখেছিল তার নৌকার দড়ি। তার জন্য নৌকা অন্যত্র ভেসে যায়নি। এই "মনু" হতে মানুষের বংশবিস্তার হয়েছিল পৃথিবীতে। "জেন্দাবেস্তা"-য় এই মহাপ্রলয়ের উল্লেখ আছে। উক্ত প্রথম গ্রন্থ চতুষ্টয়ে এই মহাপ্রলয় ও পৃথিবীব্যাপী বন্যার উল্লেখ আছে। আদমের এক বংশধর ছিল "নূহ"। তাঁর সময় মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর পাখীকুল, সারা পৃথিবীর জীবজন্তু ও মনুষ্যকুল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই নূহই হলো মনু। আর্যরা মধ্য এশিয়া হতে ভারতে এসেছিল ইরান হয়ে। সেমেটিকরা ডাইনে হতে বামে লিপি পাঠ করে। ইরানীয় আর্যরা করে বাম হতে ডাইনে। 'নূহ'—এই ইরানী উচ্চারণে "নুম"। 'হ' স্থলে 'ম' উচ্চারণ করতো ইরানীরা। 'নুম' তাই ভারতে এসে হয়ে গেল মনু। ধর্মগ্রন্থে মনুষ্য বসতির বিবরণী হলো এই।

[***মানুষের গুহাজীবন ও পরবর্ত্তী যুগ***]—প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ পর্বত গুহার মধ্যে বসবাস করতো বলে এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ মতামত প্রকাশ করেছেন। ধর্মগ্রন্থ হতে জানা যাচ্ছে যে আদি মানব পর্বতের উপর প্রথম নেমেছিল। পর্বত গুহাই হলো মানবগোষ্ঠীর প্রথম নিবাসস্থল। জল ছিল মানব জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু, তাই আদিম মানব গোষ্ঠী পর্বত নিঃসৃত

জলধারার নিকটবর্তী গুহায় বসবাস করতো। পর্বতের উপর সাপ, নানা বন্য জীবজন্তু বসবাস করতো, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হতো। প্রথমে পাথর ছুড়ে, পরে পাথরকে একটু মেজে ঘষে হাতে ধরার মত করে তাই নিয়ে মানুষ তার শত্রুদের বধ করতো, এ ছাড়া গায়ে ঢাল নিয়েও মানুষ শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতো। এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন পুরাতন পাথরের যুগ (Palaeolithic Age)। এরপর মানুষ ক্রমে ক্রমে পাথরকে ঘষে ঘষে আরও মসৃণ করে তা নানা কাজে ব্যবহার করতে শিখল। এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন নূতন পাথরের যুগ (Neolithic Age)। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে মনের কৌতূহলে জলের উৎস ধরে নেমে এলো নীচে, আরও নীচে। পেল জল আর মাটির সন্ধান। বনের বন্য পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, গাধা, শূকর প্রভৃতি জীব; হাঁস, মুরগী ও বিভিন্ন পাখী। ভালুক, কুকুর, হনু, বানর ইত্যাদি জন্তু ও সাপ প্রভৃতি ধরে পোষ মানাল ও সাপকে করল ঝাঁপিবন্দী। তারপর এক এক দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল একস্থান থেকে অন্য স্থানে। তৃণক্ষেত্র, জল ইত্যাদি নিয়ে হলো এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর যুদ্ধ। তারপর একদিন সূর্যের পরিক্রমা, বায়ুর গতি দেখে নদী তীরে তীরে মানুষ শুরু করল চাষবাস। রচিত হলো নীড়। একদল মানুষ হলো স্থায়ী। মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলল। মানুষ আবিষ্কার করল তামা, গড়ল মাটির হাঁড়িকুড়ি, থালা, ঘটিবাটি। এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন তামা-পাথরের যুগ (Challioethic Age)। এই সময়, বিশেষ মানুষের কার্যকলাপ সমগ্র মনুষ্য সমাজের মনে ফেলতো ছাপ। যেমন আদিম মানবেরা দেখতো সাপ ও জন্তু। ভয় পেতো তা দেখে। কিন্তু একজন কি দু'জন সাহসে ভর করে সেই সাপ বা জন্তুকে মেরে ফেলল। সেই সাপ বা জন্তু অনেক মানুষকে ইতিপূর্বে মেরে ফেলেছিল। তখন সেই আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের কার্যকলাপ সকল মানুষের মনে ফেলল ছাপ। তাদের কথা মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

[*বীরত্ব*]—গুহাজীবনে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে পাহাড়ী জন্তু, সরীসৃপ ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হতো। গুহাজীবনে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ অবশ্যই ছিল। কেহ ছিল দৈহিক গঠনে যেমন সুপটু, তেমনি ছিল সাহসী। অসমসাহসে ভর করে পাথর ছুঁড়ে, গাছের ডাল ভেঙে হাতিয়ার করে তার সাহায্যে বন্যজন্তু, সাপ ইত্যাদি বধ করে গুহা মানব মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার কথা মুখে মুখে ফিরতো। পরবর্তী কালে যাযাবর জীবনে, বসতি স্থাপনের পর তৃণভূমি, কৃষিভূমি, জল ও নারী ইত্যাদির জন্য গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লাগতো সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে এক পক্ষ জিততো, অন্য পক্ষ হার স্বীকার করে হটে যেতো। এক্ষেত্রে যুদ্ধে যারা বীরত্ব প্রদর্শন করতো, তাদের কথা গোষ্ঠীর মানব-মানবীর মুখে মুখে ফিরতো।

[*সাপ ধরা*]—আদিম মানবগোষ্ঠীর এক এক শাখা বিষধর সাপকে সুকৌশলে ধরে তার বিষের থলি উপড়ে ও দাঁত ভেঙে তাকে ঝাঁপিবন্দী ক'রে, ছেলে মেয়েদের সাপের খেলা দেখাতো। এরাও ছিল সাহসী। তাই এদের কথাও ফিরতো গোষ্ঠীর মানব মানবীর মুখে মুখে।

[*জীবজন্তু পাখী ইত্যাদি ধরা ও পোষ মানানো*]—এক এক গোষ্ঠীতে এমন এমন নারী পুরুষ থাকতো, যে তারা সুকৌশলে গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হরিণ, মহিষ, খরগোস, বানর, ভালুক, বাঘ, হাঁস, মুরগী নানা প্রকার পাখী ইত্যাদি ধরে তা পোষ মানাতো। গরুর দুধ খেতো, গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, হরিণ, মহিষ ও খরগোস ইত্যাদির মাংস খেতো। এইসব পোষ মানানো মানব মানবীর কথা ঘুরতো গোষ্ঠীর মানব-মানবীর মুখে মুখে।

[*গৃহনির্মাণ ও কৃষি*]—গুহাজীবনের পর মানবগোষ্ঠী পর্বত নির্গত নির্ঝরের ধারাপথ ধরে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল সমতল ভূমিতে। প্রথমতঃ গোষ্ঠীপতি নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোকজন

পশুপাখী নিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। তারপর যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষেরা নদীর তীরে তীরে গৃহ নির্মাণ ও সূর্যের গতি এবং বায়ুর গতি, মেঘের গমনাগমন দেখে কৃষিকাজ শুরু করেছিল। যারা কৃষি কাজের কৌশল উদ্ভাবন তথা গৃহনির্ম্মাণের কৌশল শিখেছিল তাদের কথা গোষ্ঠীর মানব-মানবীর মুখে মুখে ফিরতো।

[**যুদ্ধ**]—**আদিম জীবন** হতে শুরু করে অদ্যাবধি গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, দেশে দেশে নানা কারণে যুদ্ধ বাধতো। এই যুদ্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন যোদ্ধা তাদের নৈপুণ্য দেখাতো। পরাজয়ের পর হয়তো কোন গোষ্ঠীকে বিজয়ী গোষ্ঠী নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করতো। কিন্তু পরাজিত গোষ্ঠীর কোন কোন সুনিপুণ যোদ্ধা বুদ্ধিবলে সুকৌশলে পরাজিত গোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন হিংসা, বিদ্বেষ ছিল, তেমনি ছিল উদারতা। অস্ত্রহীন শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতো। যুদ্ধের পর এমনি নানা কাহিনী গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মানব মানবীর মুখে মুখে ফিরতো।

[***নারী***]—নারী প্রিয়ারূপে যেমন পুরুষের মনোরঞ্জন করে, তেমনি মাতৃরূপে, ভগিনীরূপে স্নেহ দিয়ে মানবশিশু লালন পালন করে। সুন্দরী নারীর প্রতি পুরুষের মন চিরকাল আকৃষ্ট হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কোন আদিমকালে কোন গোষ্ঠীর সুন্দরীকে হয়ত ভালবেসেছিল অন্য গোষ্ঠীর যুবক, সুগঠিতদেহী যৌবনোচ্ছল যুবককে ঐ সুন্দরীও ভালবেসেছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরীর পিতা, যিনি গোষ্ঠীপতি। যুবক নিজ শক্তি বলে সুন্দরীকে নিয়ে শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি, বন্যাপ্লাবিত নদী, দুস্তর পথ পার হয়ে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, বহু কষ্ট স্বীকার করে নিজ গোষ্ঠীতে ফিরে এসেছিল। কিংবা কোন পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী অন্য জনের সঙ্গে ভালবাসাবাসি ক'রে পালিয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ইত্যাদি হতো। গোষ্ঠীতে

গোষ্ঠীতে মানব-মানবীর মুখে মুখে নারীদের প্রেম ভালবাসা, হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কথা ফিরতো।

[***পাহাড়***]--ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে মানব বসতি বিস্তার লাভ করতে লাগল। মানুষ দেখল পাহাড়, নদী, বন, সমুদ্র, মেঘ ইত্যাদি। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করার জন্য মানুষ চিনল মানুষকে। এক মানুষের মন, চরিত্র ইত্যাদির জন্য সেই সেই মানুষের প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন পার্থিব বস্তু, পশু, পাখী ও সরীসৃপ ইত্যাদির কল্পনা করল মানুষ। পাহাড় সুউচ্চ। অনেক অত্যাচার সে সহ্য করে, তবুও সে অটল। তাই যে মানুষ ধৈর্যশীল, নিজে অত্যাচারিত হলেও সব সহ্য করে, সকলের উপকার করে চলে, সেইসব মানুষকে পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করলো মানুষ।

[***সাপ***]—সাপ খল। এঁকে বেঁকে চলে। সামান্য দোষ পেলেই ফোঁস করে ছোবল তোলে। এমন মানুষ সমাজে আছে, যারা এই সাপের মত। চরিত্রে খল, আবার সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে। সামান্য ফাঁক পেলেই মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে।

[***কুমীর***]—কুমীর জলজ জীব, তবে ডাঙ্গায় উঠলেও মরে না। কিন্তু কুমীর হিংস্র। মানুষ বা ছোটখাটো জীব পেলে তাকে গিলে নেয়। আবার কুমীরেরা কিছুটা বোকা। তাহলেও হিংস্র স্বভাবের। অনেক মানুষকে তার চরিত্রের জন্য কুমীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[***সিংহ ও বাঘ***]—সিংহ, বাঘ শক্তিশালী ও হিংস্র জন্তু। বলপূর্ব্বক নিরীহ বন্য জন্তুকে বধ করে ভক্ষণ করে। সমাজে এমন মানুষ আছে যারা শক্তিশালী। তারা নিরীহ মানুষদের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক নিয়ে নেয়। বাঘেরা নানা জাতের। বড় বাঘ, চিতা, নেকড়ে প্রভৃতি। নেকড়ে বাঘ চতুর ও হিংস্র। চিতা বাঘও চতুর।

[***গরু, ভেড়া, ছাগল***]—এগুলি নিরীহ জীব। উপকার করে মানুষের। তবু মানুষ এদের বধ করে। বনের মধ্যে এরা

বাঘ, সিংহ ইত্যাদির ভক্ষ্য। শক্তিমান মানুষেরা চিরকাল নিরীহ মানুষদের উপর মোড়লী করে। তবে গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদি সুযোগ পেলে জমির ফসল নষ্ট করে।

[**মহিষ**]—মহিষ তৃণভোজী জন্তু হলেও বেশ শক্তিশালী। বাঘ, সিংহ সহসা তাকে কাবু করতে পারে না। দুর্বল মানুষদের দলে এমনি দু' একটি বলশালী মানুষ জন্মায়। শক্তিশালী চালকেরা সহসা তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

[**বানর**]—বানর মানুষের মত দেখতে, তবে কথা বলতে পারে না। গাছে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করে। এরা নিরীহ হলেও দল বেঁধে থাকে, ফসলাদি নষ্ট করে। বনেও থাকে, মনুষ্য সমাজের নিকটেও থাকে। মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা নিরীহ হয়ে থাকে, শক্তিশালী পক্ষেও যায়, আবার দুর্বল পক্ষের নিকটেও আসে। সুযোগ পেলে লোকের ক্ষতিও করে। এইসব মানব চরিত্রকে বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[**গাধা**]—গাধা নিরীহ, বোকা, কর্মঠ জীব। সহজে পোষ মানে। আজীবন বোঝা বয়ে বেড়ায়। কোন প্রতিবাদ নাই। মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যারা খেটে মরে, বোকামির জন্য জীবনে উন্নতি করতে পারে না। তাদের প্রতীক গাধা।

[**ঘোড়া**]—ঘোড়া সুন্দর, বুদ্ধিমান, কর্মঠ, শক্তিমান, দ্রুতগামী জীব। যানবাহনে ঘোড়া আজও কাজে লাগে। ঘোড়াকে উপযুক্ত খাবার দিতে হয়, পরিচর্যা করতে হয়। মানুষের মধ্যেও এমনি গৌরবময় অশ্বসুন্দর চরিত্র আছে।

[**শিয়াল**] শিয়াল ধূর্ত জীব। কৌশলে দ্রব্যাদি চুরি করে নিয়ে পালায়। আবার নিরীহ জীবের মত থাকে। এমনি মনুষ্য চরিত্রও সমাজে বিদ্যমান।

[**হাতী**] হাতী খুব বড় জন্তু। কিন্তু বুদ্ধি কম। দল বেঁধে জঙ্গলে থাকে। দল বেঁধে বড় জলাশয়ে স্নান করে, অপর জন্তুর

কথা ভাবে না। চলমান বন্য হাতী শব্দ শুনলেই সেই দিকে অহেতুক আক্রমণ করে সব নষ্ট করে দেয়। মেরে ফেলে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু। এমনি চরিত্রের মানুষও সমাজে আছে।

[**মেঘ**]—মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। জলদানে পৃথিবীকে শস্যশালী করে। প্রবল বারিপাতে বন্যা হয়। বিদ্যুৎপাতে বৃক্ষ জীব, জন্তু ও মানুষ মারা যায়। তহেলেও মেঘ মানুষের উপকার করে। মেঘকে তাই মানুষ ভালবাসে। মানুষের সমাজে এমনি চরিত্রের মানুষও আছে।

[**নদী**]—নদী পাহাড় থেকে নেমে আসে সমতলে; অবশেষে গিয়ে সাগরে মিশে যায়। নদী মানুষের প্রভূত উপকার করে। বন্যা, ভাঙন ইত্যাদির মতো যেমন কিছু কিছু ক্ষতি করে, তার চেয়েও বেশী করে উপকার। নদীর জল পান করে মানুষ, জলে হয় চাষ। নদী নূতন পলিমাটি বহন করে এনে জমিকে উর্ব্বরা করে। মনুষ্য সমাজে এমনি চরিত্রের মানুষও বিদ্যমান।

[**বন ও বৃক্ষ**]—বৃক্ষময় স্থানই বন। বনে নানা পশুপাখী আশ্রয় লাভ করে। বৃক্ষ ছায়া দেয়, ফল দেয়। তার কাঠ জ্বালানী ও নানা কাজে ব্যবহৃত। এমন মানুষ আছে যার আশ্রয়ে বহু মানুষ থাকে, আবার সেই ব্যক্তি সমাজে নানা উপকার করে। তাদের বন ও বৃক্ষের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঝড়ে যেমন বন ক্ষিপ্ত হয়ে বৃক্ষাদি ভূপাতিত করে, আশ্রয়দাতাও তেমনি নানা কারণে রাগান্বিত হয়ে, মানুষের কষ্টের কারণ হয়।

[**সমুদ্র**]—বিশাল জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত সমুদ্র। নানা জলজ জীব সমুদ্রকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। সমুদ্র হতে মেঘ সৃষ্টি হয়। বায়ু তা বয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র শান্ত হলেও ঝড়ের সময় অশান্ত হয়ে উঠে। সমাজে এমন মানুষ আছে যারা সমুদ্রের মত শান্ত ও আশ্রয়স্থল। নানা কারণে এইসব মানুষও রুষ্ট হয়। তখন তারা অনেকের সর্বনাশ করে।

[**বায়ু**]—বায়ু মানুষের বন্ধু। বায়ুর সমুদ্রে মানুষ ডুবে

আছে। বায়ু মেঘ বহন করে আনে। বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবী শস্যশ্যামল হয়। এই বায়ু প্রবল বেগে বইলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এমনি চরিত্রের মানুষও আছে পৃথিবীতে।

[*আকাশ*]—আকাশ বিরাট, বিশাল। তার শেষ নাই। আকাশ নীল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আকাশে বিরাজমান। পাখীরা আকাশের বুকে উড়ে উড়ে বেড়ায়। মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। আকাশ উদার। এমনি চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে বিরল নয়।

[*সূর্য*]—সূর্য আলো দিয়ে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সূর্য না হলে পৃথিবীর মানুষ জীবজন্তু বৃক্ষাদি বাঁচতো না। তাই সূর্যকে মানুষ ভালবাসে, তাকে মানুষ আপন করে নিয়েছে। সূর্য নিয়ে নানা গল্প সৃষ্টি হয়েছে।

[**চন্দ্র**]—সূর্য ডুবে গেলে 'চন্দ্র' আকাশে ওঠে। তার আলো স্নিগ্ধ। কলায় কলায় চন্দ্র বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতা লাভ করে, আবার কলায় কলায় ক্ষয় পেয়ে চন্দ্র অদৃশ্য হয় অমাবস্যায়। চন্দ্র নিয়েও নানা গল্প সৃষ্টি হয়েছে।

[**নক্ষত্র**]—রাতের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রচুর নক্ষত্র দেখা যায়। এগুলির বিভিন্ন নাম। বিভিন্ন নক্ষত্র নিয়ে গল্প সৃষ্টি হয়েছে।

[*পাখী*] মানুষ দেখেছে অনেক পাখী। কিছু পাখী নিরীহ এবং সহজে পোষ মানে। এইসব পাখী হলো হাঁস, মুরগী, কবুতর, টিয়া, ময়না, শালিখ, ইত্যাদি। কিছু পাখী মাংসাশী, কাক, শকুন, চিল, বাজ ইত্যাদি। এক এক পাখীর এক এক রকম চরিত্র। মানুষের মধ্যেও এমনি চরিত্রের মানুষ প্রচুর আছে।

সেই গুহাজীবন থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ পরিক্রমা করেছে সভ্যতার পথ। মানুষের জীবনে মানুষ দেখেছে অনেক কিছু। তাই দেখে শিখেছে ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কৌশলে, শক্তিবলে পশু ধরা ও তাকে পোষ মানানো, বন্যজন্তু

সরীসৃপ ইত্যাদি বধ, ঈপ্সিত নারী লাভ, গুচারণ ভূমি আবিষ্কার, যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, বীরত্বের কথা, কৃষিজমি হাসিল, কৃষি দ্রব্য তৈরী করার কৌশল, কৃষিকাজের কৌশল, নৌকা, ডোঙ্গা তৈরীর কৌশল, জালবোনা, মাছ ধরার কৌশল, আলো জ্বালার কৌশল, সুতা তৈরী ও কাপড় বোনার কৌশল, রান্না খাবার তৈরীর কৌশল, গৃহনির্মাণ কৌশল ও নানা কর্ম ইত্যাদি মানুষই উদ্ভাবন করেছিল। এইসব কথা মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। বৃদ্ধার কাছে ছেলে মেয়ে, কিশোরেরা শুনতো। আবার তারা বড় হতো। তারা এইসব কথা পরবর্ত্তী প্রজন্মকে বলতো। এইভাবে কথার কথায় চলে আসতো মানুষের কথা। মানুষের জীবনের চলার পথের কথা, মানুষই বলতো মানুষকে। মানুষ তা শুনতো আবেগ ভরে। যা সে দেখে নাই, তা সে শুনে পুলকিত হতো। নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের কথা শুনে গর্ববোধ করতো তারা। এক কথার সাথে মিশে যেতো আর এক কথা। একই কথা মুখে মুখে অন্যত্র গিয়ে নূতন রূপ লাভ করতো। এমনি করে ছড়াতো কথা। কথা এইভাবে চলে বেড়াতো। এইভাবে পর্বত নির্গত নির্ঝরের সুমধুর ধ্বনি, পর্বতমালার দৃশ্য, পাখীর কূজন, পশুবধ ও শত্রুনিধনের সময় জয়ের উল্লাস, হিংস্র পশুর গর্জন, পশুর ডাক, সরীসৃপের হিস্ হিস্ শব্দ, একশ্রেণীর সাপের শিস্, পাতার মর্ম্মর, মেঘমালা, মেঘের ডাক ও বিদ্যুৎচমক, বৃষ্টির শব্দ, মৃদুমন্দ বায়ুর মিষ্টি শব্দ, ঝড়ের গর্জন, বন্যার তাণ্ডব, সমুদ্রের শান্ত ও অশান্ত রূপ, জোয়ার ভাটার টান, নদীর আঁকাবাঁকা নৃত্যময়ী পথচলা ও তার শব্দ, জলপ্রপাতের গর্জন, পর্বতগাত্র হতে স্থানচ্যুতির শব্দ, বনের বৃক্ষরাজির দৃশ্য ও ছায়া, গৃহপালিত পশু-পাখী ও পোষমানা বন্য জন্তু সাপ ইত্যাদির প্রতি স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, প্রিয়জন বিয়োগ, পরাজয়ে দুঃখের বেদনা ও কান্না, আকাশে উড়ন্ত বিহঙ্গের বিহারছন্দ, মেঘের উড়ে যাওয়া, পশুপাখী, মানব-মানবীর যৌন-মিলন, যুদ্ধবিগ্রহে দল ও ব্যক্তি বিশেষের বীরত্বগরিমা, যুবকযুবতীর

প্রেম-ভালবাসা, এই নিয়ে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহ-মিলন, শিশুর হাসিকান্না, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি, প্রতিহিংসা, হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি মানব-মানবীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মানব-মানবীর জীবনচর্যা, আর মানব সভ্যতার অগ্রগতির কথা, কথায় কথায় চলে এসেছিল মানব-মানবীর মধ্যে। একজন আর একজনকে বলেছিল, আর অন্যজন অন্যজনকে শুনিয়েছিল। এইভাবে কথায় কথা গতি পেয়েছিল, মানুষের জন্মধারা ও সভ্যতার ধারাপথে। এই ধারাপথে, এইকথাগুলি মানব-মানবীর মনের মণিকোঠায় যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছিল। সেখানে ঘটেছিল নূতন নূতন সংযোজন, তারপর তা সরস সতেজ হয়ে জারক রসে জারিত হয়েছিল। তারপর পুরাতন মানব-মানবীর কাছ হতে তা এসেছিল নূতন মানব-মানবীর কাছে। এরা আবার পুরাতন হয়েছিল, এরা আবার পৌঁছে দিয়েছিল নূতন মানব-মানবীকে। এক গোষ্ঠীর একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গিয়েছিল অন্যত্র। সেখানেও তারা নিয়ে গিয়েছিল তাদের গোষ্ঠীর কথা। এইভাবে এক গোষ্ঠীর কথা অন্য গোষ্ঠীতে গিয়েছিল, অন্য গোষ্ঠীর আর এক গোষ্ঠীতে এসেছিল। এইভাবে কথাগুলি পরিক্রমা করেছিল নানা পথে, নানা পরিবেশে। এইভাবে মানব-মানবীর কণ্ঠের বাঁকে বাঁকে কণ্ঠ পরিক্রমা ও পুষ্টিলাভ ক'রে এসেছে আমাদের কাছে 'কথা', 'কাহিনী', 'রূপকথা', 'উপকথা' রূপে। আমাদের মন এগুলি শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করেছে। এই হলো লোককথার উৎসের উৎস।

[**সংজ্ঞা**]—মনুষ্যলোকে বসবাসকারী, লোকের অতীত জীবন ও সভ্যতার অগ্রগতির ঘটনাবহুল নানা কথা ও কাহিনী, লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। এই ঘটনাবহুল নানা কথা ও কাহিনীগুলিই "লোককথা"। লোকজীবন ধারায় এগুলির জন্ম; লোকসমাজে ঘটেছে এগুলির বিকাশ, লোকসমাজের এক বিশেষ লোকমণ্ডল এর ধারক, বাহক ও প্রচারক।

[*প্রকৃতি*]—লোককথাগুলি লোক জীবনধারাপথের নানা ঘটনার সুসমএকত্র সমাবেশ। মানুষের মুখে মুখে এগুলি প্রচারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশে বিদেশে। এগুলির বিরাট অংশ যেমন একস্থানে নষ্ট হয়ে গেছে, আবার অন্যস্থানে কথায় কথায় ফলিত প্রথায় তার নবজন্ম ঘটেছে। একদিকে নষ্ট হয়েছে অন্য দিকে তা পুষ্টিলাভ করেছে। মানুষের স্মৃতি ধরে রেখেছে মানুষের কথা। আর মানুষের চলার পথে প্রেম, বিরহ, সংঘাত, সংঘর্ষ, হিংসা বিদ্বেষ, স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা তথা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

[*লোককথার প্রকারভেদ*]—লোককথার নানা প্রকার-ভেদ আছে। এক এক স্থানে, এক এক সময়ে এগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। স্থান বিশেষে এগুলির নাম কেচ্ছা, পুরাণ কথা, শাস্তর। প্রস্তাব, উপকথা, গুপ্তকথা, রূপকথা, রসকথা, ব্রতকথা, খোশগল্প ও বৈঠকী গল্প প্রভৃতি। এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

'কেচ্ছা' শব্দটি গ্রাম বাংলায় খুব শোনা যায়। কেহ বলেন কিস্‌সা, কেহ বলেন কেচ্চা, কেহ বলেন কেস্‌সা ইত্যাদি। শব্দটি মূলত আরবী। আরব বণিকগণ ইসলাম-পূর্ব যুগ হতে ভারতে তথা বাংলায় বাণিজ্য করতে আসতো। সেই সূত্রে শব্দটি এদেশে এসেছে। আরবীতে শব্দটির অর্থ হলো গল্প-কাহিনী। গ্রাম-বাংলায় শব্দটির পরে কিছু অর্থ-অবনতি ঘটেছে। উচ্চারণেও ঘটেছে বিকৃতি। অবৈধ গ্রাম্য প্রণয়ের ঘটনাকে আমরা "কেচ্ছা" বলি। পবিত্র কুরআনে হজরত ইউসুফের কাহিনীকে "আহ্‌সানাল কাসাস" শ্রেষ্ঠতম কাহিনী বলা হয়েছে দ্রঃ সূরা ইউসুফ।

'পুরাণ কথা'—পুরাণ+কথা এই দুইটি শব্দদ্বারা 'পুরাণ কথা' শব্দটি গঠিত। পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন অর্থাৎ প্রাচীনকালের কথা বা কাহিনী। বহু প্রাচীনকালের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে চলে এসেছে বর্তমানকালে। তাই বলা হয়েছে

পুরাণ কথা। 'শাস্তর' শব্দটি গল্পকাহিনীরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে। শাস্তর শব্দ—শাস্ত্র শব্দাগত। "শাস্ত্র" বলা হয় মহাপুরুষদের মুখের বাণীকে। কী কী মানব জীবনে করণীয়, কী কী করণীয় নয়, এই বিধি-নিষেধ নিয়ে 'শাস্ত্র'। মহাপুরুষগণ উপদেশছলে নিষেধ না মেনে কাদের অমঙ্গল ঘটেছে এবং বিধি পালন করে নিষেধ মেনে কাদের মঙ্গল হয়েছে তা জনসমক্ষে বর্ণনা করে গিয়েছেন। এই শ্রেণীর কাহিনা হজরত ইসা (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক)-র জীবনে প্রচুর পাওয়া যায়। পাওয়া যায় হজরত মহম্মদের (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) হাদিসের বর্ণনায়। ধম্মপদ ইত্যাদিতেও এই শ্রেণীর কাহিনী আছে। তাই গল্প কাহিনীগুলিকে স্থান বা অঞ্চল বিশেষে শাস্তর বলা হয়।

'প্রস্তাব' কথাটির ভাব এই যে কোন গ্রামের কোন বৈঠকখানায় বা দলিজে কিংবা গ্রাম্য মাঝারি ধরণের মুদিখানার দোকানের বারান্দায় সন্ধ্যাকালে গ্রামের কিংবা খুব কাছাকাছি গ্রামের অনেক মানুষ সমবেত হয়ে নানা গ্রাম্য আলোচনার পর গল্প বলার প্রস্তাব করেন। গ্রাম্য বৃদ্ধদের একজন প্রস্তাব আজ অমুক একটা "কেচ্ছা গাক্"। বৃদ্ধের প্রস্তাব অনুসারে সেই ব্যক্তি গল্প বলা সুরু করলেন। তার গল্পটি হয়ত চল্‌ল দু' রাতব্যাপী। আর একজন প্রস্তাব করল অমুক গল্পটা হোক ইত্যাদি। এই অর্থে গ্রাম্য গল্পকাহিনীগুলিকে প্রস্তাব বলা হয়।

'উপকথা' শব্দটি উপ+কথা এই দুইটি শব্দ দ্বারা গঠিত। উপ শব্দের অর্থ হলো সংক্ষিপ্ত বা অসমাপ্ত। অর্থাৎ অসমাপ্ত কথা, যে কথার সমাপ্তি নাই। উপকথার অর্থ করা হয়েছে সুন্দর সুন্দর কাহিনী, নীতিকথা ইত্যাদি। লোককথার মধ্যে বহু প্রেমকাহিনী ও নীতিকথা আছে, তাই উপকথা নামটি এসেছে।

'গুপ্তকথা'-টি গুপ্ত+কথা শব্দদ্বারা গঠিত. 'গুপ্ত' শব্দটি অর্থ হলো গোপন। নর-নারীর জীবনে প্রেম ও ভালবাসা আসে,

কিন্তু অবনয়ন আসে এক 'অসতর্ক মুহূর্তে'। এই প্রেম ভালবাসায় কোন সময় ঘটে মিলন, কোন সময় ঘটে বিরহ। সামাজিক রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যদিয়ে নরনারীর বিবাহ হয়। অনেক সময় দেখা যায় যুবতী বিধবা, তার যৌবনের তাগিদে একজনকে ভালবেসে তাকে নিয়ে অন্যত্র ঘর বেঁধেছে। যুবক যুবতী স্ত্রী ঘরে রেখে অন্যজনের কুমারী মেয়ে বা অন্যকারও যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হ'য়ে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। এইসব প্রেমকাহিনী সমাজের গুপ্ত কথা। প্রকাশ্যে এগুলি বলা যায় না। নারী মহলে একান্তে ও যুবক মহলে একান্তে এইসব গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীগুলো সরসে আলোচিত হয়ে থাকে এবং আজও হয়। তাই বলা হয়েছে 'গুপ্তকথা'।

'রূপকথা' শব্দটি রূপ+কথা শব্দদ্বারা গঠিত। 'রূপ' শব্দের অর্থ হলো রূপজ সৌন্দর্য (সুন্দর)। সাধারণতঃ সুন্দরী, রূপসী, সৌন্দর্যময়ী রাজকন্যা, লাবণ্যময়ী পরী ইত্যাদির সঙ্গে রূপবাণ, সুন্দর রাজপুত্র, যুবা ইত্যাদির প্রেমবিরহ, ভালবাসা ইত্যাদির কাহিনীগুলোকে রূপকথা বলা হয়। রূপকথা শব্দটি শিশুমনে এক স্থায়ী আসন নিয়ে বসে আছে। রূপবতী ও রূপবানদের কথা, তাই এর নাম রূপকথা। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন আদিতে শব্দটি ছিল "অপরূপকথা"। পরে অপরূপের "অপ খসে গিয়ে হয়েছে রূপকথা।

'রসকথা' শব্দটি রস+কথা এই দুইটি শব্দসহযোগে গঠিত। 'রস' শব্দটির অর্থ হলো তরল মিষ্টি পদার্থ। ভাব-অর্থ সরস। এমন কিছু গল্পকাহিনী আছে যে গুলির মধ্যে শুষ্কতা নাই, আছে সরসতা। সামান্য কাহিনী ভাল কথকের কথা বলার ভঙ্গিমায় তা রসসিক্ত হয়ে শ্রোতাকে রসাপ্লুত করে। তাই গ্রাম্য গল্পগুলিকে রসকথা বলা হয়।

'ব্রতকথা' শব্দটি ব্রত+কথা শব্দদ্বারা গঠিত। ব্রত শব্দটির ভাব-অর্থ হলো মানসিক মানত ইত্যাদি। এদেশের মেয়েরা

বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন ব্রত পালন করেন। এক একটি ব্রতে এক একটি গল্পকথা আছে। ব্রত উদ্‌যাপনের সময় গল্পাকারে, ছড়ায়, গানের সুরে ব্রতপালনকারী মেয়েরা আবৃত্তি করেন। এই শ্রেণীর ব্রত-আশ্রিত কাহিনীগুলিকে "ব্রতকথা" বলা হয়। এগুলি ধর্ম্মাকুল মনের সংস্কৃতিপুষ্ট ব্রতায়ন।

প্রকৃত "খুশ" এটি ফারসী। "খুশ"-এর অপভ্রংশ শব্দ খোশ। 'খোশগল্প' শব্দটি খোশ+গল্প এই দুইটি শব্দদ্বারা গঠিত। 'খোশ' শব্দটি ফার্সী শব্দাগত। এর অর্থ হলো 'আনন্দ'। কিচ্ছা কাহিনী সবগুলিই মানুষকে আনন্দ দান করে। কোন গল্প এমন ভাবে কথকদ্বারা পরিবেশিত হয় যে, সেখানে হাস্যরসের প্রাধান্য থাকে। ছেলেমেয়েদের নিকট এইসবগুলি এক সময়ে খুশীর বারতা নিয়ে আসতো, তাই এগুলিকে স্থানে স্থানে "খোশ-গল্প বলা হতো।

'বৈঠকী গল্প' শব্দটি বৈঠক+ই+গল্প শব্দসহযোগে গঠিত। যেখানে মানুষ বৈঠক করে সেই স্থানটিকে বলা হয় বৈঠকখানা। পূর্বে গ্রামের মধ্যস্থলে একটি করে বৈঠকখানা থাকতো। এখানে সমবেত হতো সন্ধ্যার সময় অনেক লোকজন। গ্রামে গ্রামে এরকম বৈঠকখানা খোঁজ করলে দু' একটা পাওয়া যাবে। এখানে বসে নানা প্রকার গল্পকাহিনী চলে। বৈঠক খানায় বৈঠক করে চলতো গল্প তাই নাম ("বৈঠক" হিন্দী, "খানা" ফারসী।)

। ***লোককথার বিভাজন*** ।—লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির টানে লোককথা সংগ্রহের জন্য আমি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ঘুরেছি। বহু গল্প, কাহিনী সংগ্রহ করেছি। এই অভিজ্ঞতার আলোকে লোককথাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভাজন করা যেতে পারে। যথা—(ক) সাধারণ (খ) প্রেম-কাহিনী (গ) ধাঁধাঁমূলক (ঘ) পশু-পক্ষী-সর্প-কুমীর-বৃক্ষ-নদী ইত্যাদি বিষয়ক (ঙ) শ্লোকমূলক ইত্যাদি।

লোককথা বলার ভঙ্গিমা — লোককথার ভঙ্গিমাকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ লোককথার কথক শ্রোতাদেব দিকে মুখ করে চাতুর্য্যে কথা আরম্ভ করে। এ বিষয়ে আমার শৈশবকালের একটা মধুর স্মৃতি আছে। আমাদের গ্রাম অজয় নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটা পুকুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল আমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল রাবেয়া খাতুনদের বাড়ী। রাবেয়া খাতুনকে আমি "বুবু" (দিদি) বলতাম। রাবেয়া খাতুন ছিল সুন্দরী, রূপসী গ্রাম্য কন্যা। রাবেয়া খাতুনের বিয়ে হয়েছিল তরুণ জোয়ান ঝড়ু শেখের সঙ্গে। ঝড়ু শেখ ছিল দৈহিক শক্তিতে শক্তিমান। যেমন ছিল কোদালে, তেমনি ছিল নাঙ্গলে, নিড়ানে, গাছানে। আবাব অম্বুবাচীর দিনে যখন মালামোর আসরে ঢোলে কাঠি পড়তো, তখন পা নেচে উঠতো ঝড়ু শেখের কুঁদি মেরে নেংঅট খেঁচে যখন মালামোর আসরে লাফিয়ে দাঁড়াত তখন যে কোন মানুষ তাব হাতে হাত দিতে ভয় পেতো। আবার অলস সন্ধ্যায় চাঁদনীর আলোকে লালমাটি গোবর নিকানো আঙিনায়, শীতল পাটির উপর বসে শ্রোতাদের "কেচ্ছা" বলতো ঝড়ু শেখ। তখন দেখেছি তার আলাদা আর এক রূপ। শ্রোতারা তাঁকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে বসতো। আর শ্রোতাদের দিকে মুখ করে বসতো ঝড়ু শেখ। কেচ্ছা বলার আগে সে আসর বন্দনা করতো, যথা :—

আরশ উপর আল্লার কুরশ
আল্লার মেহের মান কি চায়।
আজ আপাং দুলালের কেচ্ছা
মিলাইয়া যায়।
শোন শোন নর-নারী
আপাং দুলালের কথা।
আপাং দুলালের কথা শুনলে
লোকের বুকে বাজবে ব্যথা।

এই বন্দনাগান গাইতো ভরাট গলায়। তারপর গ্রাম্য ভাষায় চলতো নানা কেচ্ছা, যেমন "আপাং দুলাল", "শ্বেত বসন্ত", "পেঁচো চোর", ও "সখীসোনা" প্রভৃতি। আমি এই শৈশবকালে আমাদের বারান্দাযুক্ত মাটির কোঠা ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালায় বসে, পড়া ফেলে এই কেচ্ছা শুনতাম। এর জন্য মায়ের নিকট অনেক বকুনী খেয়েছি। তবে সেই শৈশবে কেচ্ছা শুনতে শুনতে চলে যেত মন এক অজানা রাজ্যে। ঝড়ু শেখ ও তার স্ত্রী রাবেয়া খাতুন এখনও বেঁচে আছে। তাঁর নিকট হতে বেশ কয়েকটি লোককথা সংগ্রহ করেছি।

লোককথার দ্বিতীয় ভঙ্গিমা হলো, কথক লোককথাটি শ্রোতাদের নিকট লোককথার আকারেই প্রকাশ করে, যার জন্য শ্রোতাদের মনে থেকে যায় একটা জিজ্ঞাসা। তারা বিরক্ত না হয়ে আরও লোককথার শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে। দ্বিতীয় ভঙ্গিমা নিম্নরূপ। এক গ্রামে ছিল এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তার পেশা গুরুগিরি। চারিপাশের বহু গ্রামে তার বহু শিষ্য। শিষ্যরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ ইত্যাদি। সকলে শ্রদ্ধাভরে 'ঠাকুর মশায়' বলে ডাকে। এই ঠাকুর মশায়ের বাড়ী গঙ্গা নদী হতে অনেক দূরে। একবার ঠাকুর মশায় ইচ্ছা করলেন তিনি গঙ্গা স্নানে যাবেন। কিন্তু হাঁটাপথে হেঁটে যেতে পারবেন না। কারণ বয়স হয়েছে। পাশের গ্রামে তার এক কায়স্থ শিষ্য আছে। তারা চাষী, বেশ ভাল চাষী। তার ছেলেরা যেমন জোয়ান, তেমনি গরু মহিষগুলো বলিষ্ঠ। গুরু মশায়কে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাবে এ তো পুণ্যের কাজ। চাষী বললে বেশ গুরুদেব, আমরা গাড়ীতে করে আপনাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনবো। চাষীর মধ্যম পুত্র বেশ শক্তিশালী জোয়ান। গুরুকে নিয়ে যাবার জন্যে সে গাড়ীর চাকায় হাল লাগাল। তাতে দিল গোবর মাটি। গাড়ীতে লাল তেল দিয়ে গাড়ীতে ভাল টপ্পর বাঁধল। গরুর ছানি খাবার ডালা, খড়ের ছানি চটের বোরায় ভরে নিল। সাঙ্গালে রাখলো

নানা টুকিটাকি দ্রব্য। ' গাড়ীর উপর খড়ের আটি খুলে পুরু করে বিছিয়ে দিল। তার উপর কম্বল বিছিয়ে দিল। দুটো বলদই তেজী। চাষীর ছেলে গুরুমশায়কে বলল, গুরু মশায়! আমি আপনাকে নিয়ে যাব। কিন্তু পথে যা দেখবো, তার মানে বলে দিতে হবে। মানে বললেই গাড়ী চালাব। আর মানে না বললে গরুর জোঁ নামিয়ে দিব। পূর্ণিমার আগের রাতে গাড়ী ছাড়া হলো। গাড়ী চলেছে চলেছে, এলো চৌমাথার মোড়। ঠাকুর মশায় বলল, গাড়ী থামাও। গাড়ী থামল। ঠাকুর মশায় গাড়ী হতে নেমে চৌমাথার উপর রক্ষিত সিঁদুর মাখানো দুটো মড়ার মাথার উপর লাথি মেরে গাড়িতে চাপল। তারপর বলল, গাড়ী চালাও। চাষীপুত্র বলল, মড়ার মাথার উপর লাথি মারলেন কেন? ঠাকুর মশায় বলল, ও কিছু না, এমনি। চাষীপুত্র বলল, তাহলে গাড়ী আর চালাব না। ঠাকুর মশায় শুরু করল দুই মড়ার মাথার কাহিনী। এই কাহিনী শেষ হলে আর একটা কিছু দেখা যাবে পথি পার্শ্বে। সেই কাহিনী বলতে বলতে যাবেন ঠাকুর মশায়। এইভাবে গঙ্গার তীর পর্যন্ত এগারোটা গল্প চলবে। তারপর স্নান সেরে ঠাকুর মশায় অন্য পথে যাবেন, তাঁর এক বড় শিষ্যের বাড়ীতে দেখা করতে। এই পথেও স্থানে স্থানে দেখা যাবে এগারোটা দ্রব্য। তারও কাহিনী বলতে বলতে যাবেন ঠাকুর মশায়। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে গল্প যেন চলমান। গ্রাম্য এই গল্প বলার ভঙ্গিমার মাধ্যমে আছে এক গতি। "ঠাকুর ও মধুসূদন" এই শ্রেণীর গল্প।

একটা লোককথা কথক যখন বলছে, তখন নায়ক নায়িকা, সহনায়ক সহনায়িকার মুখ দিয়ে প্রসঙ্গক্রমে চলে আসছে অন্য দু' একটি লোককথা। এ প্রকার গল্প বলার ভঙ্গিমাও গ্রাম বাংলায় প্রচলিত আছে। এই পুস্তকে "সতীকমলা", "সাদ ও সাইদ" ও 'রত্নমালা"-[২] গল্পে, গল্পের মধ্যে গল্প বলার নিদর্শন আছে।

একটি "খাট"-কে ঘিরে নানা গল্প প্রচলিত আছে। এটিও

গল্প বলার এক বিশেষ ভঙ্গিমা। কোন রাজা একটা খাট কিন্‌লেন, এবং রাতে সেই খাটে শয়ন করলেন। রাতের চার প্রহরে একটি করে পায়া নগর ভ্রমণে গেল ও নগর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলল। এই চারটি পায়া রাজার রাজ্যের গোপন খবর দিল। পরদিন সকালে রাজা খাটের পায়াগুলির কাহিনী প্রত্যক্ষ করে দোষীদের শাস্তি দিলেন। এমনি খাটের গল্প দুইটি সংগ্রহ করেছি। "ঠাকুর ও মধুসূদন" গল্পে এই শ্রেণীর একটি গল্প আছে।

"একশো তোতার" গল্পও গল্প বলার একটা বিশেষ ভঙ্গিমা। এক সদাগরের ছিল সুন্দরী স্ত্রী। আর ছিল এক তোতা পাখী। সে মানুষের মত কথা বলতে পারতো। সদাগর বাণিজ্য করতে যাবে। তোতাকে বলে গেল সব কিছু দেখতে। এদিকে সদাগরের সুন্দরী বৌ তার স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে গোপনে প্রেমাসক্ত। প্রতি রাতে যখন প্রেমের অভিসারে যেতে চায়, তোতাপাখী বুঝতে পেরে তাকে একটি করে গল্প বলে। এইভাবে একশোটি গল্প সে একশো রাতে বলল। একশ দিন পর সদাগর ফিরে এলো। পাখীর নিকট সব শুনে সদাগর তার বন্ধুকে উচিৎ শাস্তি দিল। নীতিগল্প শুনে বৌটি গোপন প্রেম ত্যাগ করল।

ষোলকলায় চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি ও ঘটে। সংসারে মেয়েরা খুব চালাক। চন্দ্রের ষোলকলা, আর মেয়েদের "আঠার কলা"। প্রবাদ "মেয়ের আঠার কলা, যদি যায় পাঁপুড়া তো বলে যায় খলা"। স্ত্রীরা স্বামীর অগোচরে অনেক কিছু করে কিন্তু স্বামীকে নানা গল্প ফেঁদে আসল ঘটনা জানতে দেয় না। কোনও স্বামী তার স্ত্রীর কাছে আঠার কলা জানতে চাইবে, তখন একটা করে কলা দেখাবে। বলাবাহুল্য সেগুলিও একটা করে গল্প বলার এক বিশেষ ভঙ্গিমা।

ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ। ঐশ্বরিক গ্রন্থ "বেদ" এখানে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। বেদ চারিভাগে বিভক্ত, যথা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। বেদের ভাষ্য নিয়ে উপনিষদ রচিত।

বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন প্রকার গল্পের প্রচলন আছে।

"রামায়ণ" ও "মহাভারত" ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাকাব্য। এই মহাকাব্য দুইটির মধ্যে নানা প্রকার গল্পকে একত্রিত করা হয়েছে। এদেশে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ছাড়া তুলসীদাসের রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, দশরথজাতক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও আরও অনেক রামায়ণ প্রচলিত আছে। এক রামায়ণের সঙ্গে অন্য রামায়ণের নানা গরমিল দেখা যায়। সবচেয়ে মজার কথা গ্রাম বাংলার নিরক্ষর হিন্দু-মুসলিম নরনারীর মুখে মুখে রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক নায়িকাদের নিয়ে নানা প্রকার গল্পের প্রচলন আছে, যার সঙ্গে মূল রামায়ণ. মহাভারতের গল্পের মিল নাই।

"ধম্মপদম্" বৌদ্ধদের অন্যতম একটি ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ মধ্যে গল্পচ্ছলে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন।

"ইঞ্জিল" (বাইবেল) গ্রন্থ হজরত ঈসা (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক)-র উপর প্রত্যাদেশ রূপে এসেছিল। এর মধ্যে তিনি গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়েছেন। "কোরান শরীফ" হজরত মোহাম্মদের (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) নিকট এসেছিল প্রত্যাদেশ রূপে। এই গ্রন্থে "আদ", "সামুদ" "নূহের প্লাবন", "আসহাবে কাহয়ফ বা "গুহাবাসীদের কাহিনী", ও "হজরত মুসা (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) ও হজরত যোজেরের কাহিনী গল্পের মত উপাদেয়। হজরত মোহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) উপদেশচ্ছলে নানা গল্প বলেছেন। "আলহাদিসের" মধ্যে তা সংকলিত আছে।

ভারতবর্ষের কাশ্মীরে রাজা দেবশর্মার সভাপণ্ডিত বিষ্ণু শর্মা বা বিধপাই, দুরন্ত রাজপুত্রদের নীতি শিক্ষা দিবার জন্য সংকলন করেন "পঞ্চতন্ত্র" নামক বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটি খ্রীস্টীয় ৫ম শতকের শেষে অথবা যষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে সংকলিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের গল্পের মধ্যে গল্প বলার ভঙ্গিমা আছে।

একাদশ শতাব্দে সোমদেব রচনা করেন "কথা সরিৎ সাগর"।

এই গল্পগ্রন্থের মধ্যে একটি গল্প বলতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে।

ঐ একই শতাব্দে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎ কথামঞ্জরী" একটি বৃহৎ গল্পগ্রন্থ। এর মধ্যেও গল্পবলার বিশেষ ভঙ্গিমা আছে।

"জাতকের কাহিনী" এক সুবৃহৎ গল্প সংকলন। এখানে বুদ্ধদেবকে নায়ক করে, তাঁর পূর্ব জন্মের নানা কাহিনী বলা হয়েছে।

"হিতোপদেশ"-এর গল্পগুলিও গল্পবলার এক বিশেষ ভঙ্গিমাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বেতাল পঞ্চ বিংশতিতে রাজা বিক্রমাদিত্যকে নায়ক সাজিয়ে বৃক্ষ হতে এক শবকে আনতে বলেছে এক সন্ন্যাসী। শবের কথামত শব রাজা বিক্রমাদিত্যকে একটা করে গল্প ব'লে বৃক্ষে চলে যাচ্ছে; রাজা আবার তাকে নিয়ে আসছে। এইভাবে চব্বিশটা গল্প আছে।

"বত্রিশ সিংহাসনে" বত্রিশটা পুতুলের উপর সিংহাসনটি বসান আছে। এই সিংহাসনটি ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের। অন্য এক রাজা সিংহাসনটি উদ্ধার করে যেই বসতে যাবে অমনি পুতুল একটা গল্প বলে সিংহাসন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এইভাবে বত্রিশটা গল্প।

আমি গল্প সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করেছি। এই সময় গ্রামবাংলার কৃষিজীবি, শ্রমিক প্রভৃতি মানুষের মুখে শুনেছি নানা গল্প-কাহিনী। খাটের গল্পের সঙ্গে বত্রিশ পুতুলের, গল্পের মধ্যে গল্প (সতী কমলা, সাদ ও সাইদ) জাতক ধরণের বেশ কয়েকটি গল্প ও আলাদা একটা বেতাল পঞ্চ বিংশতি ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছি। এই গল্পবলার বিভিন্ন ভঙ্গিমার মূল কারণ হলো, এক ঘেয়ে গল্পবলার বিরক্তি নিরসন করা। কথক যখন গুরুদেবের গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে যাত্রাপথে বিভিন্ন দ্রব্য দেখে তার রহস্য ভেদ করতে গিয়ে একটা করে গল্প বলছে, কৌতূহলী শ্রোতাদের মন চলেছে যেন গল্পের

সাথে সাথে খাটের 'কাহিনী, জাতকের কাহিনী এবং অন্যান্য কাহিনী এই ভাবে নব নব ভঙ্গিমায় শ্রোতাদের নিকট পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষরা। আমার ধারণা মানব সমাজের মধ্যেই পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুল, এমন কি রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও প্রচলিত ছিল। এগুলি সংগ্রহ করে বিশেষ ভঙ্গিমায় গল্প রূপ ও কাব্য রূপ দেওয়া হয়েছে।

[**কথক প্রসঙ্গ**]—লোককথা যারা বলেন তাদের বলা হয় "কথক"। লোককথা বলার প্রচলন কখন হতে শুরু হয়েছিল তা বলা মুশকিল। তবে অনুমান করা যেতে পারে সেই আদিম জীবনে মানুষ যখন নির্ঝরের সন্নিকটে পর্বতের গুহায় বসবাস করতো, তখন হতেই সম্ভবতঃ গল্পবলার শুরু। পাহাড়ের গঠন কেমন? জল কেমন করে গড়িয়ে পড়ে? আদিম শক্তিশালী মানুষ কিভাবে সর্প, হিংস্র জন্তু ইত্যাদির সঙ্গে লড়াই ক'রে জিততো-সে কথা এক শ্রেণীর নারী পুরুষ শোনাতো, প্রতিবেশী গুহার মানব-মানবীকে, ছেলেমেয়েকে। এমনি করেই একদিন লোককথা বলা শুরু হয়েছিল। একে অপরকে কথা বলতো। তাই হলো "কথপোকথন" (কথা + উপকথন = কথোপকথন—সংস্কৃত শব্দ)। কথক গল্পকথা খুব সরস করে বলে এক রসময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে থাকেন। অনেক কথা, অর্থাৎ একটা গল্পে নানা চরিত্রের মানুষ, পশু, পাখী, সাপ কত কি প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। কত-কথা কথক বলে থাকেন, এই "কত-কথা" হয়ত একদিন "কথকথায়" রূপ নিয়েছিল। "কথাকলি" শব্দটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কথা ও কলি। কথা অর্থাৎ কাহিনী, কলি অর্থাৎ একটি প্রসঙ্গ। ফুলে যেমন কলি সাজানো থাকে। অর্থাৎ কলি সাজিয়ে সৃষ্টি হয় একটি সুন্দর ফুল। গানের কলি সাজিয়ে হয় সম্পূর্ণ একটা গান। কথার কলি সাজিয়ে একটি সুন্দর জমাট কাহিনী তৈরী হয়। তাই 'কথাকলি'।

"লোককথা" যারা বলেন, স্থান ও অঞ্চল বিশেষে তাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন "কথক", "আলাপনী". "কেচ্ছাগায়ক" ও শাস্তরওয়ালা ইত্যাদি। ভারতবর্ষে 'কেচ্ছা' বলার যেমন লোক ছিল, তেমনি ছিল কেচ্ছা শোনার লোক। বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে যে ভরত মাতুলালয়ে গিয়েছে, মন তাঁর বিষণ্ণ, আলাপিনী তাঁকে গল্প শোনাচ্ছে, বিষণ্ণ মনে প্রসন্নতা আনয়নের জন্য। অযোধ্যার রাজ-গৃহে গর্ভবতী সীতাকে পট দেখিয়ে পটের গল্প শোনাচ্ছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে গর্ভবতী সীতাকে আলাপিনী উপকথা শোনাচ্ছে বলে উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ যুগে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারে আলাপিনী ও মালিনীগণ একটা বিশেষ সময়ে পরিবারের সকলকে গল্প শোনাতো। এরা ছিল বেতনভূক। মালিনী যখন মেয়েদের মাথার চুল বাঁধতো বা পায়ে আলতা পরাতো, তখন বলতো নানা গল্প।

পাল বংশীয় অন্যতম বিখ্যাত রাজা হলেন ধর্মপাল (খ্রীঃ ৭৭০-৮১০)। তাঁর শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী রূপকথার মতো। আলাপিনীগণ যখন তাঁর বীর গাথা কথায় ও গানে গেয়ে গেয়ে তাঁকে শোনাতো, রাজা তখন নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় অধোবদন হতেন।

সেন রাজাদের রাজত্বকালে এক শ্রেণীর কর্মচারী তাঁদের প্রশস্তির কথা নেচেগেয়ে শোনাতেন। "শেক শুভোদয়ায়" এই প্রকার উল্লেখ আছে। বাংলায় এরপর (১) মুসলিম শাসকদের আবির্ভাব ঘটে। যদিও মুসলিম রাজত্বের প্রথমদিকে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির জন্য শাসকগণ ব্যস্ত থাকতো, তবুও অবসর সময়ে গল্প কথকগণ তাঁদের গল্প শুনিয়ে তৃপ্তি দিত।

মুঘল সম্রাট আকবর শাহ (খ্রীঃ ১৫৫৬-১৬০৫) তাঁর নবরত্ন সভাসদ্ নিয়ে অবসর সময়ে নানা হাস্য পরিহাস করতেন। নবরত্নের অন্যতম (৩) রত্ন বিখ্যাত হাস্যরসিক বীরবল, সম্রাটকে

নানা গল্প শোনাতেন। সম্রাট দরবারে বিভিন্ন পটশিল্পী প্রাচীন আখ্যায়িকার পট এঁকে সম্রাটকে দেখাতেন। হামজানামায় অঙ্কিত পট ও তার কাহিনী তার মধ্যে অন্যতম।

(৩) বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবনবতুতা যখন শ্রীহট্ট হতে সোনার গাঁও যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে সরাইখানায় তিনি গল্প বলিয়েদের গল্প বলতে দেখেছেন।

(৪) মুঘলসম্রাট ঔরঙ্গজেব (খ্রীঃ ১৬৫৮-১৭০৭) তাঁর দরবারের এক কথাবলিয়ের নিকট গল্প শুনতেন নিয়মিত এক বিশেষ সময়ে। "আলমগীর নামা"-য় এর উল্লেখ আছে।

(৫) সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণবকবি যদুনন্দন দাস তাঁর "গোবিন্দলীলামৃতে' কথা ও কাহিনী বলিয়েদের উল্লেখ করেছেন।

(৬) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলীওয়ার্দী খান ও তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্-দওলা বিশেষ এক অবসর সময়ে গল্প শুনতেন। যেদিন মীরজাফর পুত্র মীরণ বজ্রপাতে মারা যায়, সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিল গল্প বলিয়ে আলাপিনী।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের ও বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ার (পূর্বতন পুরুষপুর) শহরে কেচ্ছার বাজার আছে। এখানে গল্প বলিয়েরা শতরঞ্চ বিছিয়ে বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে। উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা শ্রোতাদের গল্প শোনায়। মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন শহরেও নাকি এই প্রকার কেচ্ছার বাজার আছে বলে শোনা যায়।

ত্রিপুরা রাজ্য যখন দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল, তখন কয়েকজন বেতনভুক গল্প-বলিয়ে এক নির্দিষ্ট সময় রাজপুত্র ও রাজাদের গল্প শোনাতেন। বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের সাভার এলেকার এক ভারতচন্দ্র রায় মাসিক ৬০ টাকা বেতন উক্ত রাজসভায় কথা বলিয়ের কাজ করতেন। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী একথা তাঁর "লোক সাহিত্য" ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন।

পূর্বে আমাদের দেশে বড় বড় সড়কের পাশে পাশে ছিল

সরাইখানা। তখন রেল, বাস ইত্যাদি দ্রুতগামী যান আবিষ্কার হয়নি। লোকে পায়ে হেঁটে অথবা গো, মহিষ, উট ও ঘোড়ার গাড়ী বা ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিত। এই সময় শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকেরা পথিপার্শ্বে সরাইখানায় রাত্রিযাপন করতো। এই সময় কথা-বলিয়ে ও পুঁথিপাঠকগণ কেচ্ছা ব'লে ও সেকালের কাব্যরূপ পুঁথি পাঠ করে শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদের শুনিয়ে তাদের ক্লান্তি দূর করতো। ইবনবতুতা শ্রীহট্ট হতে সোনারগাঁও যাবার পথে, পথিমধ্যে বিভিন্ন সরাইখানায় এইসব কথা-বলিয়ে ও পুঁথি পাঠকদের দেখেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন।

নদীপথে ব্যাপারীরা নৌকাযোগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিত। তখন তাদের পথশ্রম দূর করার জন্য গল্প-বলিয়ে ও পুঁথি পাঠক থাকতো নৌকায়। তারা গল্প ব'লে ও পুঁথি পাঠ ক'রে ব্যাপারী ও তাদের অনুচর তথা মাঝিমাল্লাদের শুনিয়ে পথশ্রম লাঘব করতো।

মাঠে ফসল কাটার সময় অথবা জমিতে মাটি কাটার সময় কিংবা পথ তৈরীর সময় মজররা যখন পথে মাটি ফেলতো তখন এইসব মজুরদের একজন ছোট, মাঝারি গল্প বলে সঙ্গিদের ক্লান্তি তথা কাজে উৎসাহ দিত। তারা গল্প শুনতো ও কাজ করতো; তার জন্য কাজের ক্লান্তি বুঝতে পারতো না। এইভাবে গল্প বলা আমি নিজে শুনেছি।

বিবাহ মজলিসে বরযাত্রীগণ নিজেদের মধ্যে গল্প বলে বা পুঁথি পাঠ করে একঘেয়ে বসে থাকার বিরক্তি দূর করতো। অনুরূপ গল্প বলতো বর কনে একত্রিত হয়ে যখন বাসর ঘরে যেত। তখন দিদিমা, ঠাকুরমা-রা বরবধূকে নানা নীতিগল্প তথা হাসির গল্প শোনাতো।

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, বাঁধানো, আবাঁধানো বটতলে, দলিজে, গ্রাম্য মুদিখানার বারান্দায় সন্ধ্যাকালে বসতো গল্পের আসর। জমতো বহু শ্রোতা। আমি নিজে শৈশবে ফসল কাটা ও মাটির কাজ করার সময় শ্রমিকদের মুখে গল্প শুনেছি। আমাদের

গ্রামের মধ্যস্থলে "মরহুম মোহাম্মদ হোসেনের একটি বড় মুদি-খানার দোকান ছিল। তিনি নিজে ছিলেন গল্প রসিক। সাঁঝ রাতে তাঁর মুদিখানার বড় বারান্দায় বসতো গল্প বলার আসর। এই পুস্তকে পরিবেশিত "কণ্ঠ কমল পাখী" উক্ত আসরে বহুবার কথিত হয়েছে।

গ্রাম বাংলায় নবজাতকের জন্ম হলে ষষ্ঠীর রাতটা মেয়েরা জেগে কাটিয়ে দিতো। আর এই সময় তারা নিজেদের মধ্যে নানা কাহিনী, গল্প, রূপকথা, ব্রতকথা বলে জাগরণের ক্লান্তি দূর করতো।

[মুসলিম পরিবারে কোন লোক দেহত্যাগ করলে চল্লিশদিনের দিন হয় "মীলাদ"। এই সময় কোরান শরীফের শ্লোক পাঠের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট নীতিগল্প শোনান মৌলভীগণ।]

গ্রাম বাংলায় কোন কোন মুসলিম পরিবারে শিশুর জন্মের চল্লিশ দিনের দিন রাতে, শিশুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকে অনেক মেয়ে। নিজেদের মধ্যে অনেক ছোট বড় কেচ্ছাকাহিনী বলে, জেগে থাকে সারা রাত। বিশ্বাস, এই শিশু যেখান হতে এসেছে, সেখান হতে সোনার চৌদোল নিয়ে সেখানের দূতেরা আসে ও শিশুকে সেই দোলায় চাপতে বলে। শিশু সেই দোলায় চাপলেই মরে যায়। তাই মা, মাসী, খালা, ফুফু, দাদি, নানা প্রকার গল্প বলে শিশুর মন ভুলিয়ে রাখে। রাত শেষ হলে দোলা ফিরে যায়, আর দূতেরা বলে যায় সোনার চৌদোলে চাপলি না, ভোগ কর পৃথিবীর দুখ্।

আমাদের এই বৃহত্তর বাংলায় একদা রাজার প্রাসাদ হতে দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত ছিল গল্প-কেচ্ছা বলার এক বিশেষ ধারা। কথকেরা নানা ভঙ্গিমায়, নানা ঢঙে, নাচে, গানে হাত পা নেড়ে গল্প কেচ্ছা বলতেন। এই দেশের এক এক স্থানে বিভিন্ন পূজো পার্বণ উপলক্ষে আজো "কথক নৃত্য" হয়ে থাকে। এদেশে আরবীয়দের আগমন ছিল দীর্ঘদিনের ; বাণিজ্য ও তীর্থব্যপদেশে

তারা ভারতে আসতো। তারা যেমন এদেশের দ্রব্য সম্ভার বিকিকিনি করে নিয়ে যেত, তেমনি আমদানী রপ্তানী করতো গল্প-কাহিনী। নানা প্রেমকাহিনী এদেশে আরবদের দ্বারা আনীত হয়ে, এদেশের প্রেমকাহিনীকে পরিপুষ্ট করেছিল।

এইসব প্রেমকাহিনী আর এদেশের প্রেমকাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার গ্রামে গ্রামে। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, বৈঠকখানায়, বটতলের নীচে, দলিজে, তখনকার বাড়ীর আঙিনায় ও মুদির দোকানের বারান্দায় কেচ্ছাগায়কেরা কেচ্ছা বলে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতো। এইভাবে রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত ছিল কেচ্ছাকাহিনীর প্রচলন। বাংলায় এক সময় ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রচণ্ড প্রভাব। সমুদ্র-নদীপথে ইসলামধর্মাবলম্বী বণিক ও পীরগণ এসে বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। এর ফলে এই শ্রেণীর মানুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময় হিন্দু সমাজের কর্তাব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণদের শাসনে সমাজকে বাঁধার চেষ্টা যেমন করলেন, তেমনি সমাজে রূপকাহিনী, কেচ্ছা ইত্যাদিতে বর্ণিত নরনারীর অবাধ প্রেমের কথা যাতে না ছড়ায় সেদিকে মন দিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ ইত্যাদির কাহিনী সমাজে বহুল প্রচলনের চেষ্টা হলো। ফলে "..... এবার কথকঠাকুর গলায় শ্বেতশুভ্র পৈতা দোলাইয়া মাথা ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরিয়া বেদীর উপর চাপিয়া বসিলেন। তাহারা মহাভারতের কথা, রামায়ণের কাহিনী, ভাগবতের কথা, ধ্রুব-উপাখ্যান......প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সেই যে রাজপুত্র, সদাগরের পুত্র ও নায়িকার কথা তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল......।" (বৃহৎ বঙ্গ-পৃষ্ঠা ৩৮৬ দীনেশচন্দ্র সেন) ভাঙন ধরল সমাজ নদীর লোককথা-কেচ্ছা কাহিনীর কূলে। গড়ে উঠল ব্যাপকভাবে ধর্মীয় কাহিনীর কথকতা। কিন্তু এই

ভাঙনকে সম্পূর্ণভাবে ঠেকানো গেল না। নয়া ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে এদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল ইসলাম ধর্ম। গ্রাম বাংলায় এইসব নিম্নবর্ণের কৃষিজীবি হিন্দু ও নবধর্ম গ্রহণকারী মুসলমানেরা নূতন করে বাঁচিয়ে রাখল এই গল্পকাহিনীগুলিকে। চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তে, দলিজে, মুদির দোকানের বারান্দায়, গৃহস্থ বাড়ির উঠানে, নূতন করে বসল গল্প বলার আসর।

[দুঃখ ও বেদনার কথা -রেডিও, টি, ভি, সিনেমার যৌন আবেদন ভিত্তিক শহুরে যাত্রা আজ এগুলির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ঐসব গল্পকথকদের মৃত্যুর সাথে সাথে হয় গল্পগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে নয়তো চিরতরে চাপা পড়ছে কবরের নীচে, মাটির তলায়।]

লোককথার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান—বিভিন্ন লোককথায় স্থান, ব্যক্তি, নদী, দেশ, শহর, সমুদ্র, বিল ও গ্রামের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু কেচ্ছা, কাহিনী, লোককথা ইত্যাদিতে উল্লিখিত নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, শহর, বাজার, সমুদ্র, দেশ ও রাজার নাম ইত্যাদি নিয়ে কোন তথ্যভিত্তিক গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়নি। আমি এই প্রবন্ধে তার চেষ্টাও করিনি। তবে এগুলি করা প্রয়োজন। এবিষয়ে তথ্য-ভিত্তিক গবেষণা হলে, লোককথার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হতে পারে। আমার এই "বাংলার লোককথা" পুস্তকে "মধুমালা" নামে একটি 'লোককথা' আছে। এই লোককথাটিতে উল্লিখিত স্থান, নদী, নাম ইত্যাদি নিয়ে এই প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা করতে চাই।

[***ভৌগোলিক অনুসন্ধান***] এই লোককথায় "অজয় নদ", "উজানি নগর", "ভাটি নগর", "চাট গাঁ" প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। "অজয় নদ" একটি বিখ্যাত নদ। বিহারের হাজারীবাগের চাকাই একটি পাহাড়ে এর উৎপত্তি। তারপর

বর্ধমান, বীরভূমের সীমানা রচনা করে কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথী নদীতে পতিত হয়েছে।

"উজানি নগর" একটি প্রাচীন নগর। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানায় মঙ্গলকোট-কোগ্রামের মধ্যে প্রাচীন উজানি নগর ছিল।

কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আছে ঃ

"উজানি নগর অতি মনোহর
বিক্রম কেশরী রাজা।"

ইহা ছাড়া, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য ও বিভিন্ন লোককথায় উজানি নগরের উল্লেখ আছে।

'ভাটি নগর'—দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এই নগব ছিল। মধ্যযুগে এই এলাকাকে 'ভাটি মুলুক' বলা হতো। বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিশাল অঞ্চল হলো ভাটি মুলুক। নদীর জলধারা পাহাড়, পর্বত হতে প্রবাহিত হয়ে এসে সমুদ্রে পড়ে। নদী জলধারার প্রতিকূল দিককে বলা হয় "উজান" আর অনুকূল দিককে বলা হয় "ভাটি"। লোকগানে আছে ঃ

উজান বেয়ে এলোরে লৌকো
ভাটি বয়ে যায়।
ধর ধর ধর রে লৌকো
ধরা নাহি দেয়॥"

জোয়ারের সময় সমুদ্রেব জল উজান বেয়ে নদীতে প্রবেশ করে, ভাটার সময় ভাটির টানে স্রোতের অনুকূলে নীচে নেমে যায়। পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বিভিন্ন নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে। এখানের সব নদীতে জোয়াব ভাটা খেলে। একদা এইসব অঞ্চল সমুদ্রভুক্ত ছিল। নদীবাহিত পলি জমে মাটি উঁচু হয়েছিল আর সমুদ্রের জল নীচে ভেটিয়ে গিয়েছিল। স্থানটিও বাংলার নিম্নাংশ। নদীর নিম্নাংশকে ভাটি বলা হয়। বাংলার

এই নিম্নাংশ বিভিন্ন নদীরও নিম্নাংশ। তাই স্থানটি ভাটির দেশ, ভাটি মুলুক ও জনবসতিকে ভাটি নগর বলা হয়েছে।

"চাট গাঁ" এক প্রাচীন জনপদ। চট্টগ্রাম নামের সংক্ষিপ্ত রূপ চাট গাঁ। অবিভক্ত বাংলা তথা বর্তমান "বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীব তটে শহরটি অবস্থিত। এটি একটি বিখ্যাত বন্দর।

একদা যুক্তবাংলার বেশীর ভাগ নদী নাব্য ছিল। এই নদীপথে চলতো নৌবাণিজ্য। অজয় নদ এসে ভাগীরথীতে পড়েছে। ভাগীবথী গঙ্গার একটি শাখা। গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মা নামে পূর্ববাহিনী হয়ে মেঘনায় পড়েছে। মেঘনা পড়েছে সমুদ্রে। উজানি নগর হতে এইসব নদী বেয়ে সাগরের তটরেখা ধরে চট্টগ্রামে যাওয়া যেতো।

[*ঐতিহাসিক অনুসন্ধান*] উজানির রাজা দণ্ডধর অথবা ভাটি নগরের রাজা বাসিকর প্রভৃতির নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। ইহাদের কোন শিলালিপি বা তাম্রপট লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে এই দুই অঞ্চল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। উজানিতে বিক্রমকেশরীর ডাঙ্গায় নানা প্রত্ন-বস্তুর সন্ধান যেমন মিলেছে, তেমনি ভাটি মুলুকের খনা-মিহিরের ঢিপি, বারাসত, বালান্দা, চৌরাশী গ্রাম, চন্দ্রকেতুগড়, বেড়াচাপা ও হামাদামা অঞ্চলে একই প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলেছে। এইসব অঞ্চল একদা নানা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অদ্যাবধি এইসব রাজার নাম বা সঠিক ইতিহাস উদ্ধার হয়নি। উদ্ধার হলে রাজা দণ্ডধর ও রাজা বাসিকরের পরিচয় পাওয়া যেতো। ভবিষ্যতে আমাদের দেশের ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে। তখন হয়তো এইসব রাজার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

সংগৃহীত লোককথাগুলির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করলে এমনি নানা তথ্যের সন্ধান মিলবে। আমাদের দেশের ইতিহাস ও ভূগোল আরও সমৃদ্ধ হবে। আমি এবিষয়ে

অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই আলোচনার সূচনা ক'রলাম।

ভারতীয় লোককথার বিশ্ব পরিক্রমা ঃ— আমি গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষাণ কৃষাণী, গ্রাম্য বহু বৃদ্ধ, যুবক যুবতীর মুখে মুখে প্রচলিত বহু ছড়া, পাঁচালী, লোকগাথা ও লোককথাগুলি সংগ্রহ করেছি। লোককথাগুলি সংগ্রহের পর সেগুলির উপর তুলনামূলক পঠন-পাঠন করতে গিয়ে বাংলা তথা ভারতীয় লোককথার সঙ্গে ইউরোপীয়, বিশেষ করে জার্মান দেশীয় বিভিন্ন লোককথার সঙ্গে লোককথাগত, কাঠামোগত ও লোককথার গল্পাংশগত সাদৃশ্য পাচ্ছি। ইউরোপের জার্মান দেশীয় লোককথার পৃথিবী বিখ্যাত সংগ্রাহক দুই ভাই Jacob Ludwig Karl Grimm (খ্রীঃ ১৭৮৫ —১৮৬৩) ও Wilhelm Karl Grimm (খ্রীঃ ১৭৮৬—১৮৫৯) বহু ইউরোপীয় লোককথা কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহপূর্বক সম্পাদনা করে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। নাম দেন "Kinder Und Hous-Marchen" (কিণ্ডার-উণ্ড-হাউস মারচেন)। গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয় খ্রীস্টীয় ১৮১২-১৮১৫ অব্দের মধ্যে। এই দুই খণ্ড লোককথা গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর করেছেন শ্রীকামাক্ষাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের "এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী" তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন "গ্রিম ভাইদের রচনাবলীর নাম দিয়ে। মৎ সংগৃহীত বাংলা তথা ভারতীয় লোককথাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে আমি উক্ত তিন খণ্ড বাংলা ভাষান্তর "গ্রিম ভাইদের রচনাবলী" ব্যবহার করেছি। মৎ সংগৃহীত লোককথা "মিয়াফল", "লালু ও কালু", "বকাসুর", "ডুবকুড়ি সাক্ষী", "নাতির বাসনা" ও "রাজপুত্র ও তার চারবন্ধু" প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় গল্পগত সাদৃশ্য আছে গ্রিম ভাইদের সংগৃহীত "গোল্ডেন বার্ড", "দুই ভাই", "গ্রেইফ পাখী-তিনগাছা সোনার চুল", "পাপের সাজা", নাতি ও ঠাকুরদা" ও "ছয় ভৃত্য" প্রভৃতি। ইহাছাড়া "রত্নমালা"

"সাদ ও সাইদ", "খাঠের কাহিনী", 'কণ্ঠকমল পাখী" "ফকীরকে রাজকন্যা দান", "রাজপুত্র ও তার চার বন্ধু", "কেশবতী", "পালোয়ান ঘোড়া নিয়ে যাও", "নাকলম্বা রাজা", "পুনকাবতী", "গুরু শিষ্য", "বানরবতী" প্রভৃতি গল্পের গল্পাংশের সঙ্গে গ্রিম ভাইদের সংগৃহীত লোককথার "ঢাক," "স্ফটিকের বল", "নাচিয়ে গাইয়ে ভরত পাখী", "থ্যাশচঞ্চু রাজা", "পৃথিবীর বামন", "র‍্যামপিয়ান", "ধূর্ত গ্রেখেল", "প্রভুভক্ত জন", "ভালবাসার জয়", "বাজীকর আর তার ওস্তাদ" ও "স্যালাড গাধা" প্রভৃতির সঙ্গে মিল লক্ষনীয়। এই সাদৃশ্যের কারণ কি? কারণগুলি নীচে আলোচনার চেষ্টা করা হলো।

[***আর্য জাতি***] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, এক এক জনগোষ্ঠীর এক এক অংশ, এক স্থান হ'তে অন্যস্থানে ছাড়য়ে পড়েছিল। আর্য-জাতি এই সব জনগোষ্ঠীর অন্যতম। এই আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্য জাতির মূল বসতি কোথায় ছিল? এনিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের অনুমাণ আর্যজাতির মূল বসতি ছিল মধ্য এশিয়ায়। এখান হ'তে এই জনগোষ্ঠীর একটি শাখা চলে যায় ইউরোপে; অন্য একটি শাখা ইরান হয়ে চলে আসে ভারত-বর্ষের উত্তর ও মধ্যাংশে। কোন কোন পণ্ডিত এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আদিম যুগে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য ইউরোপে। এখান হতে আর্যদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই সব অভিমত অনুমাণভিত্তিক। যাই হোক, আর্যদের মূল বসতি যেখানে থাকুক বা যেখানেই হোক, ইউরোপ, ইরান ও ভারতবর্ষের আর্যরা যে আদিম যুগে এক সঙ্গে বসবাস করতো সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে একটা যোগাযোগ নিশ্চয় ছিল। যাতায়াতও চলতো। তাই লোককথা বা লোককথার গল্পাংশগুলো এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

(১) [***দারায়ুস ও জ্যাক্রেসাস***] গ্রীসের ঐতিহাসিক

হেরডটাসের "History" নামক বিখ্যাত বিবরণী গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, পারস্য সম্রাট দারায়ুসের রাজত্বকাল (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৫) ও তৎপুত্র জেরাক্সেসাস (খ্রীঃ পূঃ ৫১৯-৪৬৫) বিভিন্ন দেশের বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন। এই দলে ছিল ভারতবর্ষ হতে সংগৃহীত হস্তিবাহিনী। যুদ্ধশেষে এই বাহিনীর বিভিন্ন যোদ্ধা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহাদের কেহ কেহ এই সব লোককথা নিশ্চয়ই জানতো। ইহাদের দ্বারাও লোককথাগুলি ইউরোপে গিয়েছিল।

(২) **আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।** দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ছিলেন গ্রীসের রাজা। ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক ভারতের উত্তরাপথের বিপাসা নদীর তীর পর্যন্ত এসেছিলেন। গঙ্গা রাঢ়ীদের যুদ্ধখ্যাতি শুনে তিনি আর পূর্বদিকে অগ্রসর হন নাই। তাঁর অভিযানের ফলে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে স্থলপথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। এই যোগসূত্রের ফলে নানা কারণে ভারতীয়গণ ইউরোপে যেতেন এবং ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষে আসতেন। লোককথাগুলির ভারত-ইউরোপ ও ইউরোপ-ভারত যাত্রার অন্যতম একটা কারণ।

(৩) **জিপসী।** ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যত্র প্রচুর ভারতীয় জিপসী আছে। এরা যাযাবর। নিজেদের গাড়ী, ডেরা-ডাণ্ডা, পশু-পাখী নিয়ে এক একদলে বিভক্ত হয়ে এরা দেশ হতে দেশান্তরে শত শত ক্রোশ চলাফেরা করে বেড়ায়। ইহাদের বিভিন্ন নাম আছে। ইংলণ্ডে ইহাদের "জিপসী", সোভিয়েত রাশিয়ায় ইহাদের "সগান", ইরানে ইহাদের "লুলী" বলা হয়। কিন্তু এরা নিজেদিগকে "রোম-রোমনী" বলে। "রোম-রোমনী", ভারতীয় "ডোম-ডোমনী" বিকৃত রূপ বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। ইহাদের মূল বসতি ছিল একদা ভারতবর্ষে। কয়েক বৎসর পূর্বে রোম রমণীর একটা দল নিজ মাতৃভূমিতে শ্রদ্ধা জানাতে

এসেছিল। ইহারাও বহু লোককথা ইউরোপে বা দেশে দেশে নিয়ে গিয়েছে।

(৪) [**লুট বাদ্য ও লুট-লুরি**] মহাকবি ফিরদৌসীর "শাহনামা" গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, পারস্য সম্রাট বাহারাম গড় ভারতবর্ষে কনৌজের সম্রাট সঙ্কলকে অনুরোধ করেছিলেন, লুট বা লুর বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য-গীত জানা লুট বা লুরি নট-নটী পাঠাতে। সম্রাট সঙ্কল প্রায় দশ হাজার লুট ও লুরি, নট-নটীকে পাঠিয়ে ছিলেন। এরা আর দেশে ফিরে আসেনি। ইরান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ছিল ইউরোপে। আরবী "আলাত" মানে বাদ্যযন্ত্র। "আল আলাত" মানে কাঠের বাদ্যযন্ত্র বা সারিন্দা"। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গ (অবিভক্ত বঙ্গদেশও), বিহার ও অন্যত্র "মুসলমান ফকীর" ও "আলহা গানকারীগণ" কাঠের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নেচেনেচে সুর করে গান করে। কাঠের এই বাদ্যযন্ত্রকে "সারিন্দা" বলে। "আলহা" গান "আলাত"শব্দাগত বলে অনুমিত হয়। জিপসীদের একটি শাখাও আলহা গান করে। এরাও ভারতীয় লোককথা, ইরান ও ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল।

[***আরবদের বাণিজ্য যাত্রা***] আরব দেশীয় বণিকগণ হজরত মহম্মদের (তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) জন্মের বহু পূর্ব হতে জলপথে ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় ক'রে তা উচ্চ মূল্যে ইউরোপে বিক্রয় করতো। এই বাণিজ্যিক ব্যপদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে এদেশে। অর্থাৎ বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেনও হতো। এই আরবদের দ্বারা বহু লোককথা ভারত হতে ইউরোপে গিয়েছিল।

[***পঞ্চতন্ত্র***] "পঞ্চতন্ত্র' একটি বিখ্যাত ভারতীয় গল্প গ্রন্থ। ভারতবর্ষের কাশ্মীরের এক রাজা দেবশর্মার দুরন্তপুত্রদের নীতি-শিক্ষার জন্য তাঁর সভাপণ্ডিত বিধপাই এই গ্রন্থটির সংকলন করে-ছিলেন। ইরানদেশে এই পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো কিভাবে আনীত হলো, তা নিয়ে এক চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি

হলো নিম্নরূপ :—

ইরান সম্রাট আঁান ও শোরোয়াঁর (ন্যায় পরায়ণ প্রথম খুসরোর ৫৩১ —৫৭৯) দরবারে বারযুইয়া নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কোন একটি গ্রন্থপাঠে জেনেছিলেন যে, ভারতবর্ষের কোন এক পাহাড়ে একটি আজব গাছ আছে। এই গাছের পাতার রস মৃত মানুষকে জীবিত করে। চিকিৎসক বারযুইয়া এই আজব গাছের খোঁজে এলেন ভারতবর্ষে। ইরান সম্রাট আঁানও শোরোয়াঁ চিকিৎসককে সাহায্য করার জন্য একটি পত্র লিখে দিলেন কাশ্মীরের সম্রাট দেবশর্মাকে। চিকিৎসক ভারতবর্ষে এসে পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন আজব গাছ। কিন্তু কোথায় গাছ? চিকিৎসক তার সন্ধানই পেলেন না। অবশেষে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি চিকিৎসককে বললেন, "ভারতের সবকিছু রূপক। পাহাড় হলো জ্ঞানী ব্যক্তি। আজব গাছ হলো জ্ঞানী ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাণী। মৃত ব্যক্তি হলো মূর্খগণ। জ্ঞানীব্যক্তির মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী মূর্খদের জ্ঞান দান করে। তিনি চিকিৎসককে আরও উপদেশ দিলেন যে, কাশ্মীরের রাজা দেবশর্মার ধনাগারে পণ্ডিত বিধপাই সংকলিত পঞ্চতন্ত্র নামে একটি গল্পগ্রন্থ রক্ষিত আছে পঞ্চতন্ত্র নামক গল্প গ্রন্থটিই হলো অমূল্য আজব গাছ। বারযুইয়া সম্রাটের নিকট গেলেন ও পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি দেখতে চাইলেন। সম্রাট চিকিৎসককে বললেন যে তিনি তাঁর দরবারে বসে গ্রন্থটি দেখতে পাবেন কিন্তু নকল করতে দেওয়া হবে না। চিকিৎসক দিনের পর দিন দরবারে বসে একটি করে গল্প কণ্ঠস্থ করে ঘরে গিয়ে রাতে নিজ ভাষায় (পাহ্লবী) লিখতে লাগলেন। এইভাবে সমগ্র গল্প নকল করে আজব বৃক্ষ নিয়ে দেশে গিয়ে তা উপহার দিলেন সম্রাটকে। এই হলো পঞ্চতন্ত্র গল্পের ইরান যাবার কাহিনী।

সম্রাট আঁান ও শোরোয়াঁ তাঁর দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বুজর চামেহেরকে দিয়ে "আজব গাছটির" পাহ্লবী ভাষায় অনুবাদ করান। পঞ্চতন্ত্রের গল্পের "করতক ও দমনক" নামক দুই শিয়ালের

গল্প হতে পহ্লবী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটির নাম হয় "কলিলগ দিমনাগ"। ন্যায়পরায়ণ প্রথম খুসরোর রাজত্বকাল খ্রীঃ ৫৩১—৫৭৯। তাঁর রাজত্বকালের ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে পঞ্চতন্ত্রটি ইরানে আনীত ও অনূদিত হয়েছিল।

৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বাড্ এই পাহ্লবী ভাষা হতে গ্রন্থটির একটি প্রাচীন সিরিয় ভাষায় অনুবাদ করেন। নাম দেন "কলিলগ ওয়া দিমনাগ"।

৭৫০ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা আবু জাফর আল মনসুরে (খ্রীঃ ৭৫৪—৭৫) আদেশে তাঁর সভা পণ্ডিত আবু হসন অব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফা এর একটি আরবী অনুবাদ করেন। নাম দেন কলীলাঃ ওআ দিমনাঃ"।

আবুল হসন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফা অনূদিত আরবী অনুবাদ "কলীলাঃ ওআ দিমনা" হতে ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এ সম্পর্কে Prof. E. G. Browne তাঁর Literary History of Persia গ্রন্থে বলেছেন: "Few books in the world have achieved so great a success as that of Kalila and Dimnah or have been translated into so many languages. Originally of Indian origin it was brought to Persia in the sixth century of our era, in the reign of Kisra Anushirwan and translated into Pahlawi version sprang immediately the earlier Syrial and the Arabic versions from the Arabic it was rendered into numerous other languages, Eastern and Western".

আরবী ভাষা হতে পৃথিবীর যেসব ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয় তারও একটা তালিকা Prof. E. G. Browne দিয়েছেন; তা'হলো, "Greek, Persian, Hebrew, Latin, Spanish.

Italian, Slavonic, Turkish, German, English, Danish, Dutch and French."

গ্রীক পণ্ডিত Symeon Seth একাদশ শতাব্দীতে উক্ত আরবী হতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন।

দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে ঐ আরবী অনুবাদ হতে আবার পারশী ভাষায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন আবুল ম' আলা নসরুল্লাহ গযনভী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এই পারশী অনুবাদ অবলম্বনে সুললিত পারশী ভাষায় মুল্লা হুসাইন ও আইয আল ফাসিকী "আন ওয়ার-ই-সুহয়লী" রচনা করেন। ভারত সম্রাট আকবর শাহের উদ্যোগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল আলেমী উক্ত "আনওয়ার-ই-সুহয়লী"র কিছু গল্প ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করে নাম দেন "ইয়ার দানেশ"।

I. G. N. Kith Falconer ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ ক'রে নাম দেন "Light of Canopus", ইহা "Fables of Bibpai নামেও পরিচিত।

ফরাসী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটির নাম "Fables de Pilpay"। হিব্রুতে অনুবাদ করেন Rabbi Joel। লাটিন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটির নাম হয় "Directarium Vita Humane"। লাটিন ভাষা হতে ডোনী (Doni) স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে নাম দেন "La Moral Filosophia." এই স্পেনীয় গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ হয়ে নাম হয় "The Moral Philosophy of Doni". এর পর গ্রন্থটির অনুবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে।

বাংলাদেশের ঢাকা বাংলা একাডেমী গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করে নাম দিয়েছেন "কালিলা ও দীমনা"।

অর্থাৎ আর্যদের গোষ্ঠীর শাখার গমনাগমন, দারায়ূস ও জেরাকসাসের সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদলের ইউরোপে অবস্থান, আলেকজান্দারের ভারত অভিযান, জিপসীদের গমনাগমন,

লুটবাজ, লুটলুরি নটনটীর গমনাগমন, আরবদের বাণিজ্য এবং পঞ্চতন্ত্রের গল্পের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার ইত্যাদির দ্বারা ভারতীয় লোককথা ইউরোপে গিয়েছে, আর ইউরোপীয় লোককথা ভারতে এসেছে। তাই এদেশের লোককথা ও লোককথাংশের সঙ্গে সাদৃশ্য সম্ভব হয়েছে ইউরোপীয় লোককথা ও লোককথাংশের।

লোককথা সংগ্রহের কথা **:**—ভারতবর্ষের তথা বাংলার গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে প্রচুর লোককথা। এগুলি সংগ্রহের যে খুব একটা চেষ্টা হয়েছে তা বলা যায় না। একক চেষ্টায় অনেকে কিছু কিছু লোককথা সংগ্রহ করেছেন। এগুলি যখন সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা হয় তখন দেশ ভাগ হয় নাই। তাই এই সব সংগ্রহে পশ্চিমবাংলার ও পূর্ববাংলার লোককথাই বেশী করে সংগৃহীত হয়েছে। নীচে এই সংগ্রহের একটা তালিকা দিবার চেষ্টা করা হলো।

পাদ্রী উইলিয়ম কেরি আমাদের দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি ইংরাজী ১৮১২ অব্দে "ইতিহাসমালা" নাম দিয়ে কিছু লোককথা সম্পাদনাপূর্ব্বক প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রকাশ করেন "Folk Tales of Bengal"। এরপর বাংলা ভাষায় বিদেশী লোক-কথা অনূদিত ও বিদেশী লোককথার ছায়া অবলম্বনে কিছু বই লিখিত হয়েছিল। এগুলি হলো নীলমণি বসাকের "আরবীয় উপন্যাস (১৮৫০ খ্রীঃ)", হরিশচন্দ্র নন্দীর "চাহার দরবেশ" (১৮৫৪ খ্রীঃ)", আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ ও রাধামাধব মিত্রের "আরব্যোপন্যাস (১৮৫৭ খ্রীঃ)", আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের "বৃহৎ কথা (১৮৫৭ খ্রীঃ", অন্য একজনের "মনোহর উপন্যাস (১৮৫৭ খ্রীঃ)", হরিনাথ মজুমদারের "বিজয় বসন্ত ১৮৬৯)", মহেন্দ্রচন্দ্র সিংহের "হাতেম তাই (১৮৭৩)", এবং মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লিখিত ও প্রকাশিত Bengal Family Library-র উদ্যোগে "পুত্র শোকাতুর দুঃখিনী মাতা

(১৮৫৮ খ্রীঃ)", "ছোট কৈলাশ ও বড় কৈলাশ (১৮৬৩ খ্রীঃ)", "চকমকির বাক্স (১৮৬৭ খ্রীঃ)", "চীন দেশের বুলবুল পক্ষির বিবরণ (১৮৬৭ খ্রীঃ)", "হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিবরণ বিষয় (১৮৭০ খ্রীঃ)", ত্রিলভের গল্প (১৮৭০ খ্রীঃ)", ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রামসত্য মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন "Indian Folk lore"। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন "Popular Tales of Bengal"। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব প্রকাশ করেন "Folk Tales of Hindusthan"। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তাঁর "ঠাকুরমার ঝুলি", "ঠাকুরদার ঝুলি" প্রকাশ করেন যথাক্রমে খ্রীষ্টীয় ১৯০৭ ও ১৯০৯ অব্দে। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ম্যাককালক প্রকাশ করেন "Bengal House hold Tales"। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রকাশ করেন "দাদা মহাশয়ের থলে"। শোভনা দেবী তাঁর "The Orient Pearls" প্রকাশ করেন ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর "The Folk Literature of Bengal"। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন তাঁর "রাক্ষস খোক্কসের গল্প"। কালীমোহন ভট্টাচার্য্য ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর "ঠাকুর দাদার রূপকথা"। জ্ঞানেন্দ্রশশী বাবু ১৩১২ বাংলা অব্দে প্রকাশ করেন তাঁর "ঠাকুরমার ঝুলি"। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে সুনীতি দেবী প্রকাশ করেন "Indian Fairy Tales"। মরহুম মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর "শিরনী"। ১৩৩৩ বাংলা অব্দে ইন্দুমতি দেবী তাঁর "বঙ্গ নারীর ব্রতকথা" প্রকাশ করেন। Joseph Jacobes প্রকাশ করেন "Indian Fairy Tales"। ত্রিভঙ্গ রায় প্রকাশ করেন "বাংলা মায়ের রূপকথা"। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন "এক যে ছিল রাজা"। তুলসীদাস সিংহ প্রকাশ করেন "সেকালের খোস গল্প"। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রকাশ করেন "টুনটুনির বই"। শান্তাদেবী ও

সীতাদেবী প্রকাশ করেন "হিন্দুস্থানী উপকথা"। বর্ধমান শহরের সন্তান ডঃ সুধীননাথ ঘোষ লিখিত ও রূপ এণ্ড কোং (By-arrangements with Y. B. Joccard, Switzerland 1983), "The Fables of Aesop", "Folk Tales and Fairy Stories from India", "Folk Tales and Fairy Stories from Farther India". অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেন "ক্ষীরের পুতুল" ও "বাংলার ব্রতকথা"। আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন "বাংলার লোকসাহিত্য" (চতুর্থ খণ্ড)। অরুণ রায় ও জার্মানীর Dr Heinz Mode যৌথভাবে প্রকাশ করেন "Benglische Merken (Fairy Tales of Bengal)" ও "Benglische Erzah Jungeh (Bratakathas of Bengal)"। শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার প্রকাশ করেন লোক-সমাজ ও পশুকথা"। ডঃ রফিকুল ইসলাম প্রকাশ করেন "নিম্ন দামোদরের লোকগল্প"। ডঃ অমলেন্দু হাজরা প্রকাশ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার "উপকথা ও লোকসংস্কৃতি"।

আমি নিজের প্রচেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক, কৃষক-রমণী, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ইত্যাদির নিকট হতে সাধারণ লোককথা প্রায় পাঁচশত ও অশ্লীল লোককথা প্রায় একশত সংগ্রহ করেছি।

এই লোককথাগুলি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। "আয়নাবতী" লোককথার মধ্যে রূপকথা ও সাধারণ মানুষের মিশ্রণ ঘটেছে। এইরূপ লোককথা অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি।

"শ্বেত বসন্ত" লোককথাটির নানা পাঠান্তর আছে। রেঃ লাল-বিহারী দে-র "Folk Tales of Bengal"-এ এর এক রকম পাঠান্তর আছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি"তে অন্য এক পাঠান্তর আছে। আমি যে পাঠ সংগ্রহ করেছি, তার সঙ্গে উক্ত দুই পাঠের মিল নাই। ইহা ছাড়া শ্বেত বসন্তের অন্য একটি পাঠও আমি সংগ্রহ করেছি।

"রাজপুত্র ও তার বন্ধু" লোককথার সঙ্গে গ্রীম ভাই দ্বয়ের সংগৃহীত "ছয় ভৃত্য" এবং এর গল্পাংশের সাথে রেঃ লালবিহারী দে-র Folk Tales of Bengal-এর "ফকীরচাঁদ" ও গ্রীম ভাইদের সংগ্রহ "জোয়ান হান্স"-এর সাথে মিল আছে।

"কণ্ঠকমল পাখী" লোককথার অনুরূপ আলাদা একটি লোককথা "ময়ুর পঙ্খী" আমাদের দেশে চালু আছে। এই লোককথার গল্পাংশের সাথে গ্রীম ভাইদের "নাচিয়ে গাইয়ে ভরত পাখী" গল্পাংশের মিল আছে।

"চোরচক্রবর্তী রাজা" লোককথাটির বিভিন্ন পাঠ এদেশে প্রচলিত আছে। চোর সম্পর্কিত একটি গল্প রেঃ লালবিহারী দে-র Folk Tales of Bengal ও Amabel Williams Ellis-এর "Fairy Tales from East and West"-এ আছে।

"মধুমালা" লোককথার একটি পাঠ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরদার ঝুলি"তে আছে।

মনসুর উদ্দীন সাহেবের "শিরণী"তে এর একটি পাঠ আছে যার সাথে আমার সংগৃহীত মধুমালার আংশিক মিল আছে। দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এই লোককথার অন্য একটি পাঠ আছে। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্য ১ম খণ্ডে এর একটি আলাদা পাঠ আছে। আমার পাঠটি আলাদা।

"পুনকাবতী" লোককথার তিন চারটি পাঠ এদেশে প্রচলিত আছে। আমি দুইটি পাঠ সংগ্রহ করেছি। জ্ঞানেন্দ্রশশীর "ঠাকুরমার ঝুলিতে" পুনকাবতীর অন্য একটি পাঠ আছে।

"সখীসোনা" লোককথার একটি পাঠ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরদার ঝুলিতে" আছে, নাম "পুষ্পমালা"।

"মিয়া ফন্স" লোককথার অনুরূপ লোককথা বেশ কয়েকটি এদেশে প্রচলিত আছে। এই লোককথার সঙ্গে গ্রীম ভাইদের "গোল্ডেন বার্ড" লোককথার কাঠামোগত মিল আছে।

"রত্নমালা-২" লোককথার সাথে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব সংগৃহীত

"বাংলার লোকগীতি কথা"-র "চম্পকলতা" লোকগাথার কাঠামো-গত মিল আছে।

"গব্য গবাং" নামক ছোট এই লোককথাটি বিচিত্র একটি লোককথা। এই শ্রেণীর একটি গুরু শিষ্যের কাহিনী "জৈন প্রবন্ধ' গ্রন্থে আছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বঙ্গভূমিকা" গ্রন্থে এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।

"চার বিলাস" লোককথার মধ্যে তিন বিলাসের গল্প "বেতাল পঞ্চবিংশতি" আছে। এই লোককথাটি পরিবেশনার সময় অসাবধানতা বশতঃ প্রথম দিকে 'নারী বিলাসের' কথাটি বাদ পড়ে গিয়েছে।

এইসব লোককথা ছাড়া বাকী যেসব লোককথা এই সংকলনে সংকলিত হলো, সেগুলি অন্যত্র সংগৃহ ও সংকলিত হয়েছে বলে শোনা যায় না।

লোককথার কাহিনীর অংশ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তি ও লোকসংস্কৃতি সংস্থা, লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককথা সংগ্রহ করেছেন। লোকসংস্কৃতিবিদ্ পণ্ডিতগণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককথা বিশ্লেষণ করে, লোককথার কাহিনী অংশের সমতার সন্ধান পেয়েছেন। এই কাহিনী অংশকে ইংরাজীতে বলা হয় মোটিফ (Motif)। এ বিষয়ে আমেরিকার বিখ্যাত লোক-সংস্কৃতিবিদ্ S. Thompson রচনা করেছেন "Motif Index of Folk Literature"। এই বিখ্যাত গ্রন্থে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন লোককথার Motif Index আছে।

লোককথার কাঠামো সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। একই দেশে ও দেশে দেশে একই লোককথার বিভিন্ন পাঠান্তর আছে। কিন্তু লোককথার কাঠামোটি এক। যেমন 'শ্বেত বসন্ত' নামক লোককথায় শ্বেত-বসন্তের বিমাতা, প্রথমে শ্বেত বসন্তকে খুব স্নেহ করতো।

রাজ বাড়ীর পাশে ছিল এক কৃষকের বাস। তার প্রথমা পত্নী দুটো ছেলে রেখে মারা গেলে, কৃষক আবার বিয়ে করলো ও নানা কৌশলে সপত্নীর সন্তানদ্বয়কে মেরে ফেললো। এই দেখে রানী শ্বেত বসন্তের বিমাতা প্রেরণা পেল ও শ্বেত বসন্তকে কৌশলে বাড়ী হতে খেদাল। এই একই লোকথার অন্য পাঠান্তর হলো রাজ বাড়ীর পাশে একটা তেঁতুল গাছ ছিল, সেই গাছে এক বক ও বকী বাস করতো, তাদের ছিল দুটো ছা। ছা দুটো রেখে বকী মরে গেল. বক আর একটা বকী আনল। এই বকী তার সন্তান দুটোকে স্বামীর (বকের) অবর্তমানে ঠোকরিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে মেরে দিল। শ্বেত বসন্তের বিমাতা এই দেখে শ্বেত বসন্তের প্রতি রুষ্ট হলো ও কৌশলে শ্বেত বসন্তকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিল। এই উভয় ক্ষেত্রে লোককথার কাঠামো এক। এনিয়ে লোক-সংস্কৃতিবিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক বই রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলো S. Thompson ও Roberts এর "Types of Indic Oral Tales" এবং Anti Aarna-র "The Types of the Folk Tale" প্রভৃতি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোক-কথার কাঠামোগত মিল এঁরা দেখিয়েছেন।

[***গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি***] ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম প্রধান। অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে দেশ। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ করে, সৃষ্টি করে দেশের সম্পদ। গ্রামের চারি পাশে মাঠ সেই মাঠে কৃষক কাজ করে, ফসল ফলায়। মাটির সাথে তার গড়ে উঠে মমতা। কৃষকের যাওয়াআতের পথ মাটির। বাড়ীঘর মাটির, খড়ের ছাওয়া চাল। নদীর তীরে, সমুদ্র তটে, রেল, বাস ইত্যাদি সংযোগ পথে দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে শহর। পাকারাস্তা, দালান বাড়ী, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কোনস্থানে বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রঙ্গালয়, বিজলী বাতি, ইত্যাদির সমাহারে শহর যেন সৌখিন যুবক।

গ্রামের মানুষ যেমন মাটি হতে উৎপন্ন ফসল দিয়ে পেট ভরায়,

তেমনি মন ভরায় মাটি হ'তে উঠা গানে। গ্রামে তাই বটতলে, পথের ধারে বসে কেচ্ছাকাহিনী, ভাদু, ভাঁজো, ঝাঁপান, বাউল, লেটো ও কবি গানের আসর। শহরে তা নেই, শহরে আছে কেতাদুরস্ত শহুরে সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র, নাটক, থিয়েটার, ফুটবল, ক্রিকেট, বেতার, দূরদর্শন, কত কি! গ্রামে কৃষক আর কৃষক পুত্রেরা-রাখালেরা নীল আকাশের নীচে, প্রাণভরা সূর্যালোকে, গাছের ছায়ায়, নদী ও জলের কলতানে, বাতাসের সুরে সুরারোপ করে উদাত্ত কণ্ঠে মেঠো সুরে গান গায়। শহরে তা হবার বাগ নেই। সেখানে আছে সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্র; সুর তাল লয় কড়িকোমল প্রভৃতির বেড়াজালে গান শিক্ষা চলে। সুর সেখানে সংকুচিত হয়ে যায়।

শহরে সকাল হলেই যে যার কাজে যায়। একজন আর একজনকে বড় চেনে না। যেন তার প্রয়োজনও নেই। গ্রামে কিন্তু তা নেই। কৃষকের লাঙলটা গোলমাল করছে, তাই আর একজন কৃষকের কাছে লাঙলটা চেয়ে এনে মাঠে গেল। কেহ কার কোদাল, মই নিল, নিল গাড়ী। সকলের সঙ্গে যেন সকলের একটা সম্পর্ক; কেহ খুড়া, কেহ জেঠা, কেহ চাচা, কেহ বৌদি, কেহ ভাবী। নবান্ন হলে প্রতিবেশী সকলে এক সাথে পাত পাড়ছে। পাত্ পাড়ছে একসাথে উৎসবে-পার্বণে, বিবাহে, পৈতেতে, শ্রাদ্ধে, ঈদে, বকরিদে, সুন্নত উৎসবে।

কিন্তু দুঃখ ও বেদনার কথা, আধুনিক সভ্যতার চাপে গ্রাম আজ শহরমুখীন। শহুরে সংস্কৃতি গ্রামে সংক্রামিত হ'য়ে তার ধ্বংস ডেকে আনছে। তবুও এরই মাঝে এখনও গ্রামে একের প্রতি অপরের মমতা, সামাজিকতা এবং উৎসব-পার্বণ-মেলা সবই আছে। হেরিকেনের কাঁচটা কালিতে ঢাকলেও দীপ এখনও নিভিয়ে যায় নি। অন্তরের অন্তঃস্থলে আলো জ্বলছে।

[**কৃষক**] পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ও বিশ্বের কৃষক সমাজ হলো দেশের ভিত্। এই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যে আছে

মানুষের সভ্যতা। কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শীতের কাঁপুনি তুচ্ছ করে মাটিতে হলকর্ষণ, বীজ বপন ক'রে ধান, গম, ডাল, পাট, তৈলবীজ, আলু, পটল, আখ, কাপাস, রেশম, এমনি কত প্রকার ফসল ফলায়। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বেশীর ভাগ স্বল্পমূল্যে চলে যায় বড় বড় কল-কারখানার মালিকের হাতে। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক পরিবারের মধ্য হতে সুলভে মজুর সংগ্রহ ক'রে এইসব মালিক কৃষকদের কাঁচা মাল নিয়ে তৈরী করে কাপড়, গামছা, লুঙ্গী, ছিট, বিস্কুট, চিনি, তেল, চট এমনি কত কি! এগুলি যখন বাজারে পণ্য হয়ে ফিরে আসে তখন তার মূল্য হয় অনেক। আর কৃষককে এগুলি বাধ্য হয়ে উচ্চ মূল্যে কিনতে হয়। কৃষক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের জন্য খাদ্য প্রভৃতি ও নানা পণ্যের কাঁচামাল উৎপাদন করে। এই অন্নদাতা থাকে অন্নহীন বছরের বেশ কয়েক মাস। আর কৃষকের আর এক অংশ কলে-কারখানায় গতর খাটিয়ে ঘাম ঝরিয়ে উৎপন্ন করে বস্ত্র ও নানা ধরণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। আর এর মনাফা ভোগ করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক। কোটি কোটি কৃষক যেমন আছে তেমনিই থাকে, কিছু ধনী কৃষক ছাড়া। এইভাবে লুণ্ঠিত হয় কৃষকের সম্পদ। এই একদিক।

কৃষক নর-নারীর মুখে সেই অতীতকাল থেকে কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠ পরিক্রমা করে চলে আসছে ছড়া, গান, গাথা, কথা, উপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী, কেচ্ছা, রূপকথা, প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালী, ধাঁধাঁ প্রভৃতি কত কী! একশ্রেণীর মানুষ কৃষক নর-নারীর এই সম্পদকে তাঁদের নিকট হতে নানাভাবে সংগ্রহ ক'রে বই লিখেছেন দেশী বিদেশী ভাষায়। আর সেগুলি দেশে-বিদেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। বেচারা কৃষক সামান্য স্বীকৃতিটুকুও পাচ্ছেন কি? এটাও লুণ্ঠনের আর এক দিক—সংস্কৃতির লুণ্ঠন।

আর একদল আছেন, যাঁরা নানা উৎসব-পার্বণে গ্রামে গ্রামে

গিয়ে কৃষকদের লোকসঙ্গীতের নানা সুর সংগ্রহ করছেন যান্ত্রিক উপায়ে। তারপর সেগুলি নিয়ে এসে সিনেমার গানে সুরারোপ করছেন। অনেকে এইসব লোকসঙ্গীতের সুর, তাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে তার সাথে দেশী-বিদেশী সুরের সংযোজন ক'রে নূতন সুর সৃষ্টি করছেন। এইভাবে বিকৃত হচ্ছে কৃষকদের অমূল্য সম্পদ। আদিবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ঐ একই বিকৃতির ঘটনা ঘটছে শহরে, নগরে ও রাজধানীর নানা অনুষ্ঠানের নামে। এগুলিও এক ধরনের ডাকাতি।

যাঁরা সভ্যতার বনিয়াদ গঠন করলেন, যাঁরা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, জীবন পাত করে মানুষের মুখে অন্ন জোগালেন, যাঁরা প্রাচীন মানুষের ভাবধারা নাচ-গান, কেচ্ছাকাহিনী ইত্যাদি ধরে রাখলেন, যাঁরা উৎসব-পার্বণ, মেলা, আচার-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে ধরে রাখলেন, যাঁরা কলে-কারখানায় কাঁচা মালের জোগান দিলেন, তাঁরা কি পেলেন? তাঁরা পেলেন শুধু অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। আর ছেঁড়া কাপড় পরে, আধপেটা খেয়ে তিলে তিলে করলেন মরণ বরণ। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মত তাঁর জীবন চলে আসছে। হাতে যে মানুষ মশাল জ্বেলে সভ্যতার আগে আগে গিয়ে সভ্যতাকে আলো দেখালেন তিনিই রইলেন চির অন্ধকারে! এই হলো 'সভ্যতার' নির্মম পরিহাস।

আজ প্রয়োজন শুধু কৃষির দিকেই নয়, কৃষকের দিকেও নজর দিতে হবে। কৃষককে দিতে হবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান। তাঁর নিকট হ'তে লোকসাহিত্যের সম্পদকে অবিকৃত ভাবে তুলে এনে বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃষকদের জীবনচর্যা, কৃষকদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। তাঁর উৎপাদিত শস্যের দিতে হবে উপযুক্ত মূল্য। তাঁর কণ্ঠের গান-গাথাকে সংগ্রহ করে তাঁকে সংবর্ধনা দিতে হবে, তাঁর কণ্ঠের সুরকে নিয়ে অন্যত্র সুরারোপ করলেও, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে তা করতে হবে,

তাঁর কণ্ঠের সুরকে তুলে এনে তার বিকৃতি করা চলবে না। এর জন্য সোচ্চার হতে হবে সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদেরও।

হে বাংলার কৃষক, আমি তোমাদেব পরিবার হতে এসেছি। তোমাদের রক্ত আমার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত, আমি তোমাদেরই একজন। আমি তোমাদের সম্পদ সশ্রদ্ধচিত্তে তুলে এনে তোমাদেরই গৌরব বৃদ্ধি করতে চাই। ব্যক্তি হিসাবে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। সমস্ত গৌরব ও কৃতিত্ব তাঁদের, যাঁদের নিকট থেকে আমি এসব সম্পদ সংগ্রহ করেছি, সেই অখ্যাত, অজ্ঞাতকুলশীল, মেহনতী মানুষগুলিকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা। কারণ সাধাবণ মানুষই অসাধারণ, তাঁরাই থাকেন সত্যের কাছাকাছি। তাঁরাই ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে গড়েছেন নব নব সভ্যতাকে, তার সংস্কৃতিকে। তাই দেশের বঞ্চিত মানুষের নানা ধরনের বঞ্চনার অবসান হোক। একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে, আসুন, প্রতিটি সৎ শিল্পী ও বুদ্ধিজীবি শপথ নিই লোকসংস্কৃতির লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, তার বিকৃতির বিরুদ্ধে। আর আমাদের সমবেত সাধনায় 'অন্নদাতা কৃষক' যেন অন্ন পায়। শুধু 'সভ্যতার পিলসুজ' হিসাবেই নয়, সর্বস্তরের কৃষকের সাংস্কৃতিক জীবনও যেন আলো-ঝলমল হয়ে ওঠে।

—o—

। আয়নাবতী ।

অজানা গাঁয়ে এক রাজা থাকে। তার নাম নাইবাবু। তার দুই ছেলে। বড়টির নাম আমীর চাঁদ আর ছোটটির নাম জামীর চাঁদ। আমীর চাঁদের বয়স যখন ১৬ বৎসর, জামীর চাঁদের বয়স তখন এক বৎসর। এই সময় রাজা নাইবাবু আমীর চাঁদের বিয়ে দিল। কিছুদিন পর নাইবাবু মারা গেল। দু বৎসর পর আমীর চাঁদ ও জামীর চাঁদের মা মারা গেল। তখন আমীর চাঁদের বৌ জামীর চাঁদকে মানুষ করতে লাগল। জামীর চাঁদ যখন কাঁদে তখন বড় বৌ, "তুমি কেঁদোনা ভাই, তোমার বিয়ে দেব আয়নাবতীর সাথে, আর তোমাকে সোনার ভেটা তৈরী করে দেব", এই কথা বলে খেলা দেয়। জামীর চাঁদ তখন চুপ করে। দিন যায় বৎসর যায়। এমনিভাবে বৌদির স্নেহ ভালবাসা পেয়ে জামীর চাঁদ বড় হয়ে উঠল।

একদিন পূর্ণিমা রাত। জ্যোৎস্না ভরা। সেই রাতে জামীর চাঁদ স্বপ্নে দেখল আয়নাবতীর সাথে তার বিয়ে হচ্ছে। ঘুম থেকে জেগে ওঠে, জামীর চাঁদের মন খারাপ হয়ে গেল। সে মনে মনে চিন্তা করল আয়নাবতীর খোঁজে সে যাবে। তবে যাবার সময় বৌদি আর দাদাকে সে বলে যাবে। এই কথা চিন্তা করে সে তার বৌদির কাছে যেয়ে বলতে লাগল :—

শোন শোন ও হারে বড় বৌ,
বড় বৌ বলি যে তোমারে।
আমি আয়নাবতীর দেশে যাব বড় বৌ
বড় বৌ বিদায় দাও আমারে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিয়েছেন বিধি রে।

এই কথা শুনে বড় বৌ কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল ঃ

শোন শোন ও হারে জামীর চাঁদ,
জামীর চাঁদ বলি যে তোমারে।
এক বিয়ের বদলা জামীর চাঁদ
পঞ্চ বিয়ে দেব রে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিয়েছেন বিধি রে ।।

জামীর চাঁদ বল্লে, না বৌদি ! আর কারুর কথা শুনবো না। তবে দাদাকে একবার এই কথা বলে যায় ঃ

শোন শোন ও হারে বড় দা
বড় দা বলিয়ে তোমারে
আয়নাবতীর দেশে যাবগো
ও বড়দা বিদায় দাও আমারে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে ।।

তখন বড়দা বলছে, না জামীরচাঁদ তোমার যাওয়া হবে না—

শোন শোন ও হারে জামীর চাঁদ
জামীর চাঁদ বলি যে তোমারে।
একটা বিয়ের বদলে জামীর চাঁদ
পঞ্চ বিয়ে দেব রে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে ॥

জামীর চাঁদ বলে, না দাদা ! আমি আজই চলে যাব, যেখানে গেলে আয়নাবতীকে পাব। এই বলে কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চলে যায়, চলে যায়। পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে চলে যায়।

যেতে যেতে একদিন সে মায়া নদীর ধারে এসে হাজির হলো। নদীর ধার ধরে চলে যায়। যেতে যেতে দেখতে পায় এক মুনি বসে বসে তপ করছে। মুনিকে দেখে সে চমকে উঠল। চিন্তা করল মুনির কাছে গেলে বস্তু পাওয়া যেতে পারে। তাই সে মুনির সামনে হাজির হলো। ইতি মধ্যে মুনির তপ ভেঙ্গে গেল।

বলে উঠল, কে রে বেটা! আমার তপ ভঙ্গ করলি। তাড়াতাড়ি আমার পিছনে এসে বস, তা নাহলে ভস্ম করে দেব। তখন জামীর চাঁদ বললে, মামাগো আমি। মুনি বলে উঠল, আয় আয় বাবা ভাগ্নে আয়, তা নাহলে এখানে কে আসবে, নারদ ভাগ্নে। পরে তুর কথা শুনবো, তুই চাট্টি চেলে ডেলে রান্না কর বাবা, দুই মামা ভাগ্নেয় খাই। অনেক দিন ভাত খাই নি, এই দেখ হাঁড়ি উনুন খড়ি সবই আছে। জামীর চাঁদ তাড়াতাড়ি নদী থেকে জল তুলে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। উনুনে জ্বাল ধরিয়ে দিল। সে তখন মামাকে বলছে, মামা চাল কই? মামা তখন ভাগ্নের হাতে তাড়াতাড়ি একটি চাল ও একটি ডাল দিয়ে বল্লে এই নাও বাবা হাঁড়িতে দিয়ে দাও। জামীরচাঁদ ভাবছে, কী করা যায়! তারপর বললে, যা হয় হবে দিয়েই দিই। এই বলে একটা চাল ও একটা ডাল হাঁড়িতে দিয়ে মসলা দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়ে উনুনে জ্বাল দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নুন দিতে গিয়ে দেখছে এক হাঁড়ি চেলোডেলে রান্না হয়ে গিয়েছে। তখন জামীর চাঁদ বলছে, এস মামা রান্না হয়ে গেছে। খেয়ে নি এস। এই বলে দুই মামা ভাগ্নেয় পেট ভরে খেয়ে ফেললো। খেয়ে দেয়ে মুনি বলছে, কিজন্যে এখানে এসেছ বাবা? জামীরচাঁদ বলে, আমি আয়নাবতীর জন্যে এসেছি, তুমি বলে দাও মামা, আমি কোথায় গেলে আয়নাবতীকে পাব। মুনি বল্লে, সে কি বাবা, তাই কি হয়? আমরা ছত্রিশ যুগ নদীর ধারে বাস করছি, আয়নাবতীকে চোখে দেখি নাই। তবে তার নাম শুনেছি। তুই নদীর ধার ধরে এগিয়ে যা, পথে নদীর ধারে তোর আর এক মামা আছে। তার কাছে সন্ধান পেতে পারিস। আমি তার সন্ধান জানি না। তবে তুই যদি পাস, তাহলে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

জামীরচাঁদ সেখান থেকে মায়া নদীর ধার ধরে চলে যায়। নদীর ধার ছাড়ে না। চলে যায়, চলে যায়। অনেক বন-জঙ্গল পার হয়ে চলে যায়। কিছুদিন যাওয়ার পর দেখছে নদীর ধারে এক মুনি বসে আছে। তার কাছে গিয়ে ডাকল, মামা! অমনি

মুনির তপ ভেঙ্গে গেল। মুনি বলে উঠল, কে রে তুই তাড়াতাড়ি বল, তা না হলে ভস্ম করে দেব। তখন জামীর চাঁদ বলে উঠল, মামাগো, আমি তোমার ভাগ্নে। তখন মুনি বললে, আয় বাবা ভাগ্নে আয়, ভাগ্নে না নারদ। তবে তোর কথা পরে শুনব। বহুদিন অন্ন খাই নাই, একটু চেলে ডেলে রান্না কর; তুই মামা ভাগ্নেয় খাই। ঐ খানে হাঁড়ি আছে, খড়ি আছে, উনন আছে। জামীর চাঁদ নদী থেকে হাঁড়ি ধুয়ে জল এনে চাপিয়ে দিল উননে। মুনি বললে, এই নে চাল, এই নে ডাল। এই বলে আধখানা চাল আর আধখানা ডাল জামীর চাঁদকে দিল। চালডাল হাতে নিয়ে ভাবছে আধখানা চাল, আধখানা ডাল, তাহলে এই মামা নিশ্চয় যার জন্যে এসেছি তার সন্ধান দিতে পারবে। জামীরচাঁদ হাঁড়িতে চালডাল দিয়ে জ্বাল দিতে লাগল। দেখল এক হাঁড়ি চেলেডেলে হয়ে গিয়েছে। মামা ভাগ্নেয় পেট ভরে খেল। মামা বললে, কিজন্যে এখানে এসেছ বলত বাবা। জামীর চাঁদ বললে আমি আয়নাবতীর খোঁজে এসেছি। মুনি বললে, সেকি! আমি এখানে যুগ-যুগান্তর বাস করছি, আয়নাবতীকে চোখে দেখি নাই, কানে শুনেছি। তবে তুই আর একটু এগিয়ে যা, তোর আর এক মামা আছে, তার কাছে যা, খোঁজ পেতে পারিস। তবে যদি পাস বাবা, আমায় একবার দেখিয়ে নিয়ে যাস।

এই কথা শুনে জামীরচাঁদ আবার মায়া নদীর ধারে ধারে চলে যায়। যেতে যেতে হঠাৎ একদিন নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেল, এক মুনি তপ করছে। সে মুনির নিকটে গেল আর মুনির তপ ভঙ্গ হয়ে গেল। মুনি বললে কে রে বেটা! আমার তপ ভঙ্গ করলি, তাড়াতাড়ি বল, নইলে ভস্ম করে দেব। জামীর চাঁদ বললে, মামাগো! আমি তোমার ভাগ্নে। মুনি বললে, আয় বাবা ভাগ্নে আয়, ভাগ্নে না নারদ। ভাগ্নে নাহলে কে আর আসবে? যাক বাবা, বহুদিন ভাত খাই নাই, চাট্টি চেলেডেলে রান্না কর ঐ উনন, খড়ি সব আছে। কথা পরে হবে। এই বলে সে ভাগ্নের

হাতে সিকিখানা চাল ও সিকিখানা ডাল দিল। জামীরচাঁদ নদীতে হাঁড়ি ধুয়ে জল এনে উনানে চাপিয়ে দিল। জ্বাল দিতেই এক হাঁড়ি চেলে ডেলে রান্না হয়ে গেল। জামীর চাঁদ ভাবল এই মামা সঠিক সন্ধান দিতে পারবে। মামাভাগ্নেয় খাওয়া-দাওয়া শেষ করল। তারপর মুনি বলল কিজন্যে এখানে এসেছ, বাবা! জামীরচাঁদ বলে উঠল: আয়নাবতীর সন্ধানে এসেছি, তোমার কাছে। মুনি বললে: তাইত বাবা, তুইকি আয়নাবতীকে আনতে পারবি। এই বনে তারা থাকে। এই বনের উত্তর দিকে আছে এক বড় সরোবর, তার উত্তর ধারে আছে দালান বাড়ী। আয়না-বতীরা সাতবোন। দিনে তারা ডালিম হ'য়ে গাছে ঝোলে, রাতে সরোবরে চাঁন ক'রে নাচ গান করে। সরোবরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ঝোঁপ আছে; আজ পূর্ণিমা, পরীরা সাত বোন চাঁন ক'রে নাচ গান করবে, দেখে আয়গা। সাড়া দিস্না, তাহলে ভস্ম করে দেবে।

সাঁঝ রাতে জামীর চাঁদ ঝোপে গিয়ে বসল। পরীরা ঘাটে কাপড় বেখে উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে জলে খেলা করতে লাগল। তারপর কাপড় পরে নাচ গান করতে লাগল। এই সাত পরীর ছোটটি হলো আয়নাবতী। ভাগ্নে মামার কাছে আবার ফিরে এলো। মুনি বলল আজ রাতে যখন পরীরা জল-খেলা করবে তখন তাদের কাপড়গুলো লুকিয়ে নিয়ে আস্বি। তাই হলো, পরীরা জলখেলা করছে। জামীরচাঁদ কাপড় নিয়ে চলে আসছে। পরীরা বলছে, কাপড় দাও; তোমার সাথে আয়নাবতীর বিয়ে দেব। যেমনি পিছনে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি পরীরা তাকে ভস্ম করে মুনির কাছে পাঠিয়ে দিল। মুনি তাকে আবার মানুষ করে দিল। মুনি বললে, আজ রাতে পরীরা সেজেগুজে থাকবে তুই একটা ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে যা। ছয়জন সুন্দরী গলায় মালা নিতে চাইবে। তুই বলবি, মালা দিব তার গলায় যে, কুঁজো হয়ে বসে আছে। গা দিয়ে পুঁজ ঝরছে। আমীর চাঁদ সেদিন রাতে গিয়ে সরোবরের

ধারে হাজির হ'ল। ছয়জনা সুন্দরী বলছে, আমাদের গলায় মালা দাও। জামীরচাঁদ পুঁজপড়া কুঁজো মেয়েটার গলায় মালা দিল। তারপর মুনির কাছে ফিরে এলো। পরীরা আয়নাবতীকে পোকা লাগা কুঁজো ডালিমের মধ্যে রেখে গাছে ঝুলিয়ে দিল। জামীরচাঁদ বললে, মামা কি ভাবে আয়নাবতী আমার কাছে আসবে? মুনি বললে, তাইতো বাবা, পরীরা খুব চালাক। ঐ বাড়ীতে এক ডালিম গাছ। ঐ গাছে অনেক ডালিম ধরে আছে। তার মধ্যে একটা ডালিম আছে কুঁজো, তার মধ্যে আয়নাবতী আছে। আনতে পারবি? জামীরচাঁদ বললে, কী উপায়ে আনি, মামা! মুনি বল্লে, তার জন্যে চিন্তা নাই ভাগ্নে, আমি তোকে কেয়ো বানিয়ে দেব। তুই উড়ে গিয়ে ঠোঁটে করে ছিঁড়ে ডালিমটা নিয়ে আসবি। পারবি বাবা? জামীরচাঁদ বললে, ঠিক পারবো মামা। মুনি অমনি তাকে একটা কেয়ো বানিয়ে দিল। বললে, যা বেটা উড়ে চলে যা। অমনি কেয়ো উড়ে চলে গেল। গিয়ে দেখতে পাচ্ছে— সত্যি একটা ডালিম গাছ। সে তাড়াতাড়ি কুঁজো ডালিমটা দেখতে পেয়ে ঠোঁটে করে ছিঁড়ে নিয়ে উড়তে লাগল। ইতিমধ্যে ছয় পরী জানতে পেরেছে। তারা পিছন পিছন ছুটে চলেছে আর বলছে: কুঁজো ডালিমটা দাও, ভাল ডালিমটা নাও, আয়নাবতীর ডালিম নাও, শুন শুন। কেয়ো যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে, অমনি তাকে পরীরা ভস্ম করে দিল। আর ডালিমটা তাদের ঘরের কোলঙ্গায় রেখে দিল। মুনি ভস্মটা ধরে আবার তাকে মানুষ করে দিয়ে বললে: যা ভাগ্নে আর পারবি না, ঘুরে দেশে চলে যা। জামীর তাড়াতাড়ি মুনির পা দু'টি জড়িয়ে ধরে বল্লে: আর একবার সন্ধান দিতে হবে, মামা, আমি আর একবার দেখবো। মুনি তার পরদিন তাকে আবার কেয়ো করে দিল। আর বলে দিল, ঘরের মধ্যে কোলঙ্গায় ডালিমটা আছে। কেয়ো উড়ে গিয়ে ডালিমটা ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে লাগল। ছয় পরী পিছন পিছন ছুটছে আর পূর্বের মত বলছে। কেয়ো আর পিছন ফিরে তাকায় না।

উড়তে উড়তে সোজা মুনির কাছে গিয়ে হাজির। মুনি তাড়াতাড়ি কেয়োকে মানুষ করে লুকিয়ে রাখল। পরীরা মুনির কাছে এসে বললে ডালিম মুখে একটা কেয়ো এখানে আসে নাই ? মুনি বললে, ফিরে বাড়ী যা, যার কপালে যা আছে তাই হবে। বেশী কিছু বাড়াবাড়ি করবি না, চলে যা। পরীরা সব বুঝতে পেরে চলে গেল। মুনি বল্লে, খুসীতো বাবা ? জামীরচাঁদ বল্লে, হ্যাঁ মামা, আমি খুব খুসী। মুনি বললে, যাও ডালিম নিয়ে সোজা বাড়ী চলে যাও।

নিজের গাঁয়ের কাছে এসে সে চিন্তা করছে, একাএকা যাব, না, বৌ সঙ্গে করে বাড়ী যাব ! শেষে ঠিক করল বৌ সঙ্গে করেই বাড়ী যাব। এইনা ভেবে সে ডালিমটাকে ভাঙতে যাচ্ছে। তখন ডালিমের ভিতর থেকে আয়নাবতী কেঁদে বললে ঃ

শোন শোন ওহা রে জামীর চাঁদ
জামীরচাঁদ বলি যে তোমারে।
বিদেশে ভেঙ্গো না ডালিম হে,
চোরে নেবে হরে রে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে॥

গানের মানে জামীর চাঁদ কিছুই বুঝতে পারল না। ডালিম ভেঙ্গে ফেললো এবং দেখতে পেল সোনার প্রতিমা আয়নাবতীকে। কি তার রূপ ! রূপ দেখে জামীরচাঁদ মূর্ছিত হয়ে গেল। সেখানে আর কেউ নাই। আয়নাবতী ভাবল, কী করি ! তাকিয়ে দেখল পুকুরে মেলা পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সে গিয়ে একটা পদ্ম ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকল। একটা মুচির মেয়ে যুবতী, দেখতে শুনতে ভাল। সে দেখল এক রাজার ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি পুকুর হতে জল এনে তার মাথায় দিল এবং তার মাথা কোলে নিয়ে আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে জামীর চাঁদের জ্ঞান ফিরল। সে মুচির মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, আয়নাবতী বসে আছো ? মুচির মেয়ে ভাবল এর ভিতর

কিছু মজা আছে। কি করি বল। জামীরচাঁদ ভাবল, সোনার বরণ রূপ এমন হল কি করে? মুচির মেয়ে বলে উঠল: সূর্য্যের তাপে আমার দেহ কি হল, দেখ দেখি। জামীরচাঁদ ভাবল, তাও হতে পারে, বাড়ী নিয়ে যায়। তখন সে বলে উঠল, চল আয়নাবতী আমরা বাড়ী চলে যাই। মুচির মেয়ে আয়নাবতী সেজে বললে, তাই চল। তাকে সঙ্গে নিয়ে জামীরচাঁদ বাড়ী এলো। তারা বড় দাদা ও বড় বৌদিকে প্রণাম করল। সকলে আশীর্ব্বাদ করল।

জামীরচাঁদ মনে মনে ভাবে এতো আয়নাবতী নয়! যা করেছে তাই করেছে, কাউকে কিছু না বলে জামীরচাঁদ আলাদা ঘরে থাকতে লাগলো। কয়েক দিন পর জামীব চাঁদ পুকুরে চাঁন করছে, দেখছে একটা ফুল ভাসতে ভাসতে তার দিকে আসছে। সে ভাবছে, একি! ফূলটা ভেসে আমার দিকে আসছে কেন? সে ফূলটা হাতে করে নিয়ে শুঁখে দেখল — ভারী সুগন্ধ। ফুলটা সে বাড়ী নিয়ে এলো ও একটা কোলঙ্গার উপর রেখে দিল। ফুলের ভিতর থেকে আয়নাবতী দুঃখে কাঁদছে তখন রাত জামীরচাঁদ ঘুমিয়ে আছে।

: গান :

শোন শোন ও হারে জামীর চাঁদ
জামীর চাঁদ বলিযে তোমারে।
বড় সাধের আয়নাবতী হে
কোলঙ্গায় বসে কাঁদে রে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে॥

কান্না শুনে জামীর চাঁদ চেতন হয়েছে। আপন মনে বলছে, কে কাঁদে, কে কাঁদে? মুচির মেয়ে বলছে প্রাণনাথ আমি। তোমার চিন্তা কি? তুমি ঘুমাও। এই বলে রাতখানা ভুলিয়ে রেখে দিল। সকাল হলে ফুলটা কোলঙ্গা থেকে নিয়ে বাড়ীর নালায় ফেলে দিয়ে বললে, সর্বনাশী এই নালায় থাক। আয়নাবতী ফুলের মধ্যে নালার জলে পড়ে থাকল। রাতে আবার ফুলের মধ্যে জামীরচাঁদকে সম্বোধন করে কাঁদতে লাগল:

শোন শোন ও হারে জামীর চাঁদ
জামীর চাঁদ বলিযে তোমারে।
বড় সাধের আয়নাবতী হে, জামীরচাঁদ,
কাঁদিছে নালাতে; দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে॥

গান শুনে জামীর চাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বললে, আমার নাম ধরে ডেকে কে কাঁদে! মুচির মেয়ে বললে, তুমি আলাদা ঘরে থাক; তাই আমি গান গাইছিলাম। তুমি স্বপ্ন দেখেছ, এখন ঘুমাও। কোন চিন্তা নাই। তার পর সে মনে মনে ভাবছেঃ দাঁড়া, সর্বনাশী! সকাল হোক। সকালে সে পদ্ম ফুলটা হাঁড়িতে ভ'রে সিদ্ধ করতে গেল। আয়নাবতীর সতীত্ব তেজে জল গরম হলো না। মুচির মেয়ে ভাবল ফুল সিদ্ধ হয়ে আয়নাবতী মরে গিয়েছে। সে জল সমেত ফুলটা ঘরের পিছনে ফেলে দিল।

আয়নাবতী ভাবে আর কতদিন এই ভাবে থাকা যায়। সে তখন তার ছয় পরী দিদিদের স্মরণ করল। দিদিরা জানতে পেরে সোনার রথ নিয়ে এলো। আয়নাবতী সেই রথে চাপল। এমন সময় জামীর চাঁদ দেখতে পেয়ে রথের চাকা ধরে ঝুলতে লাগল। রথ আস্তে আস্তে চললো। পরীরা চিন্তা করছে একি! রথ আস্তে আস্তে চলছে কেন? এমন সময় নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছে জামীর চাঁদ ঝুলছে। পরীরা তাকে ফেলে দিতে চাইল। আয়নাবতী বললে,·না ওকে রথে তুলে নাও। তারপর রথ সেইখানে নামিয়ে ফেলল। পরীরা আয়নাবতীকে বললেঃ

শোন শোন ও হারে আয়নাবতী
আয়নাবতী বলি যে তোমারে—
যাবে কি না হেথায় থাকবে—
বল গো আমারে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে॥

আয়নাবতী পরী দিদিদের বলছেঃ

শোন শোন ও হারে দিদি
দিদি বলি যে তোমারে—
বড় সাধের জামীরচাঁদ সে
অনেক দুঃখ পায় রে, আমার
লাগি রে, দারুণ দুঃখ রে
এ দুঃখ দিলেন বিধি রে ॥

এই বলে আয়নাবতী বললে তুমি ঐ মুচির মেয়ের একটা ব্যবস্থা কর, আমি এখন আকাশের উপরে থাকছি। এই বলে আয়নবেতী রথের উপরে উঠল। জামীরচাঁদ মুখ ভারী করে বাড়ী গেল। মুচির মেয়েকে ডেকে বল্লে সর্বনাশ হয়েছে। চিঠি এসেছে আমাদের বাড়ীতে ডাকাতি হবে। মাটিতে একটা খাল করে সব পুতে রাখতে হবে। শুনে মুচির মেয়ে খাল করতে লাগল। খাল যখন এক মানুষ ভ'র হলো তখন জামীরচাঁদ বললে খালের মধ্যে কিছু কাঁটা ফেলে দাও। মুচির মেয়েকে জামীর চাঁদ বললে খাল কেমন হয়েছে দেখ, ঠিকমত হয়েছে কিনা। মুচির মেয়ে যেমন দেখতে গিয়েছে, অমনি জামীর চাঁদ তাকে খালে ফেলে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি খালে মাটি ভর্তি করে দিল। আয়নাবতী রথে চেপে সব দেখছিল। মুচির মেয়ে যেমনি মাটি চাপা পড়ল, অমনি আয়নাবতী নেমে এলো। এই না দেখে জামীর চাঁদ দাদা বৌদিকে বললে ঃ

শোন শোন ও হারে বড় দা বৌদি
ও বড়দা বৌদি বলি যে তোমারে
স্বপ্নে দেখা আয়নাবতী এনেছি এবারে—
ও বড়দা বৌদি এসে দেখ রে।
ও দারুণ দুঃখ শেষ হলো রে ॥

তারপর তারা সুখে বসবাস করতে লাগল।

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার দক্ষিণখণ্ড গ্রামের পটুয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মোহন পটুয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত। ভাষাটি মোহন পটুয়ার।]

। শ্বেত ও বসন্ত ।

[এক]

রাজার নাম ব্রহ্মানন্দ। সাত মুলুকের রাজা সে। ছয় পুত্র বড় হয়ে বাণিজ্যে গেল পর পর। তিন মাস যেতে না যেতে ছয় পুত্র মরে গেল। অবশেষে রাজার আর একটি পুত্র হলো। এর নাম পৃথ্বীরাজ। অন্য পুত্রদের রাজা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজকে রাজা লেখাপড়া শিখাল না, কি জানি যদি মরে যায়! রাজপুত্র গুল্তি নিয়ে খেলা করে বেড়ায়। গুল্তি দিয়ে পাখী মারতে সে খুব ওস্তাদ। একদিন সে তাদের সরোবরের পাড়ে পাখী মারতে গেল। এই সরোবরের নাম চিনিচম্পা সরোবর। এই সরোবরের চারিদিকে ছিল, চারিটি বড় বড় ঘাট। যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সকলে কলসীতে করে জল নিতে এসেছে। একটা ঘুঘু পাখী জানের ডাহায় সরোবরের ঘাটের পৈঠাতে এসে বসেছে। লোকজন থাকার জন্য গুল্তি ছুড়তে পারছে না রাজকুমার। শেষে যা থাকে কপালে বলে গুল্তি ছুড়ে দিল। একটা কলসী ফুটো হয়ে গেল গুল্তির ঘায়ে। জল ঐ ফুটো দিয়ে উপরের দিকে ফিক্ ধরে উঠতে লাগল। দেখতে বেশ ভাল লাগছে দেখে, রাজকুমার সকলের কলসী গুলতি দিয়ে কলসী ফুটো করে, আর মজা দেখে। দু' এক দিন প্রজারা কিছু বলল না। পর পর সাতদিন যখন একই অবস্থা হলো, তখন প্রজারা মোড়লদের সঙ্গে করে রাজ দরবারে গেল। রাজা দেখল দলে দলে প্রজারা তার দরবারে আসছে। আসছে মোড়লরা। মোড়লরা রাজপুত্রের কার্য্যকলাপ রাজাকে বলল এবং রাজকুমারের বিয়ে দিতে বলল। রাজা বলল, তোমাদের যে ক'টা কলসী নষ্ট হয়েছে, তার দ্বিগুণ দাম দিচ্ছি; বিয়ে দিতে বলো না,

তাহলে আমার ছেলে মারা যাবে। প্রজারা বলল, মহারাজ আমরা তবে অন্য রাজ্যে চলে যাই। কলসী নিয়ে প্রজা হয়ে আমরা আপনার জরিমানা করতে চাই না। মোড়লরা বলল, তোমরা কে কে আমাদের সঙ্গে অন্য রাজ্যে যেতে চাও উঠে দাঁড়াও। সব প্রজা উঠে দাঁড়াল। রাজা বলল, বসুন আপনারা। রাজার সুখে প্রজার সুখ, আর প্রজার সুখে রাজার সুখ। থাক্ রাজপুত্রের বিয়ে দিয়ে দিব।

ওগো শুন দারুণ বিধি
ছয়পুত্র বিনাশ হয়ে
এক পৃথ্বুমরাজার নামখানি
শুন ওগো দারুণ বিধি।

প্রজারা মোড়লদের সঙ্গে চলে গেল। রাজা মন্ত্রীকে বলল, ভাল একটা পাত্রীর সন্ধান কর। মন্ত্রী রাজপুত্রের এক ছবি এঁকে চলেছে পাত্রীর খোঁজে। আর এক দেশের এক সুন্দরী কন্যা, নাম তার পুষ্পবতী। তার একটা ছবি এঁকে নিয়ে পাত্রের খোঁজে চলেছে সে-দেশের মন্ত্রী। পথিমধ্যে দু' জনের সঙ্গে দু' জনের দেখা, কথা বিনিময়। সব কথা শুনে পাত্রীর ছবি ও পাত্রের ছবি বদল করে নিয়ে গেল। তারপর শুভদিনে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে পুষ্পবতীর বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন পর রাজপুত্র তার পিতাকে বলল, বিয়ে করেছি, ছেলেপিলে হবে। বসে বসে কত খাবো। আমি যাব বাণিজ্য করতে। সাত জাহাজ মাল নিয়ে মন্ত্রীর পুত্রকে মন্ত্রী করে রাজ পুত্র বাণিজ্যে গেল। ১৫ দিন একটানা জাহাজ চালানোর পর জাহাজ এসে লাগল এক বড় বন্দরে। সেখানে মাল বেচা-কেনা চলতে লাগল। রাজপুত্র মন্ত্রীকে বলল, মন্ত্রী! একটা ভাল দোকান দেখ, সেখানে আমরা উঠনা খাবো। যাবার দিনে সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাব। এই বলে তারা দুই জনে দোকানের খোঁজে শহরে চলল। বন্দরের কাছে এক বেনে বাস করতো। সেই বেনের একটা চৌদ্দ কুঠরী দোকান ছিল। সেই দোকানে সব কিছু পাওয়া

যেতো। রাজপুত্র ও মন্ত্রী আসছে দেখে বেনে তার দোকানের বারান্দায় একটা ভাল বিছানা পেতে গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাতে দাঁড়াল। তার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে, নাম তার রূপবতী। আর রূপবতীকে বেনে বলল কিছু খাবার তৈরী করে রাখতে। রাজপুত্র আর মন্ত্রী বেনের দোকানের নিকট এসে শুধাল কি এটা? বেনে বলল, হুজুর একটু বসুন। এটা আমার দোকান। সূঁচ হতে মৃত্তিকা সব কিছু পাবেন। রাজপুত্র বলল, আমি একটা দোকান খুঁজছি। তুমি একটা খাতা করে হিসাব রাখ। আমার নাম পৃথ্বীরাজ। আমার নামে যে যা নিয়ে যাবে তাকে দেবে। যাবার দিনে সব টাকা আমি মিটিয়ে দেব। রূপবতীকে ডাকল বেনে। রূপবতী দুটো রূপোর পাত্রে ভাল ভাল খাবার আর জল এনে অতিথিদের দিল। কিন্তু রাজপুত্রের মুখ দেখতে পেল না। দেখল মন্ত্রীর মুখ। রূপবতী জলের কলসী, তেলের বাটি, আর গামছা নিয়ে স্নান করতে যায় কিন্তু পৃথ্বীরাজের দেখা পায় না। তার মা বলে, আগে স্নানে যেতে আসতে তাড়াতাড়ি, এখন এত দেরী হচ্ছে কেন? মেয়ে বলে, কারণ আছে। তবে ভয় নাই। কোন খারাপ কাজ করছি না। রাজা ব্রহ্মানন্দ ছেলেকে আসার সময় বলে দিয়েছিল, যেখানেই থাক, তিন মাস পর আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কারণ তিন মাসের মধ্যে তার ছয় পুত্র ইতিপূর্বে মারা গিয়েছিল। দু' মাস ব্যবসা বেশ ভালই চলল। পনের দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। নচেৎ পিতা কষ্ট পাবে। সেদিন রাজপুত্র ও মন্ত্রী এসে বেনেকে বলল, বেনে হিসাবের খাতা দেখ, কত টাকা বাকী আছে বল; আজ সব মিটিয়ে আমরা চলে যাব। হিসাব করে বেনে দেখল দু' লাখ এককড়া হয়েছে। এককড়ার কথা আর লজ্জায় বেনে বলল না। বলল দু' লাখ হয়েছে। রাজা মন্ত্রীকে বলল, দু' লাখ টাকা দিয়ে দাও। টাকা দিয়ে তারা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এলো বেনের মেয়ে রূপবতী। সে শুনল, এককড়া কড়ি বাকী আছে রাজপুত্রের কাছে। বেনের মেয়ে বলল এই কড়ি আমার

দরকার। তাই ছুটে চলে গেল নদীর ধারে। জাহাজে তখন নঙ্গর তুলছে। রাজপুত্র বলল, নঙ্গর নামাও। কেন ঐ বেনের মেয়ে ছুটে আসছে শুধাও। বেনের মেয়ে গেল রাজার ছেলের কাছে। দেখল তার মুখ। তারপর বলল, আমাদের খাতায় হিসাবে ভুল হয়েছে। এককড়া কড়ি পাওনা আছে। রাজপুত্র বলল, এককড়া কড়ির জন্য তুমি ছুটে আস্‌ছ! বেনের মেয়ে বলল, রাজপুত্র, এই এককড়া কড়িতে আমি করতে পারি :

সোনার আঁচির
সোনার পাঁচির
সোনার সিংহাসন
নিরলে কাননের ঘাট—
আর মুন মুন কাঠে নৌকা
তার পবন কাঠের বৈঠা।
সে নৌকা চল বললে চলে,
রও বললে রয় ॥

এই কথা শুনে মন্ত্রীকে একটা পয়সা দিয়ে রাজকুমার বলল, বাজারে এককড়া কড়ি বেনের মেয়েকে দেবে আর বাকী কড়ি তার গায়ে ছিটিয়ে দেবে। তাই হলো। মন্ত্রী কড়ি কিনে একটি কড়ি বেনের মেয়েকে দিল। আর বাকী কড়ি তার গায়ে ফেলে দিল। মন্ত্রীর কাজ দেখে বেনের মেয়ে তার বাবাকে বলল : বাবা, রাজপুত্র আবার ফিরে আসবে ও আমাকে বিয়ে করবে।

[দুই]

বাণিজ্য শেষ করে রাজার ছেলে দেশে ফিরল। মন্ত্রীকে মালপত্র নামাতে বলে বাড়ী গেল। রাজার ছেলে সোজা গোঁসা ঘরে গিয়ে খিল দিল। রাজা বলল, ছেলে কৈ? সভাসদগণ বলল পুষ্পবতীর ঘরে আছে। রাজা ছুটে সেখানে গিয়ে দেখে নাই। পুষ্পবতী বলল, বোধ হয়, মায়ের কাছে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে

দেখে সেখানে নাই। তখন ডাক পড়ল মন্ত্রী পুত্রের যে মন্ত্রী হয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে গিয়েছিল। মন্ত্রীপুত্র বলল, মহারাজ আপনার ছেলে বাড়ী এসেছে। মাল ফেলে দিয়ে মন্ত্রীপুত্র বলল, এই কথা। গোঁসাঘরে গিয়ে পাওয়া গেল। রাজপুত্র বলল, বন্দরের সেই বেনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। রাজা বলল, তাই হবে। রাজা বেনের বাড়ী লোক পাঠাল। শুভ দিন দেখে বেনের মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হলো। রাজপুত্র বলল, আমি ঐ বন্দরে কিছু দিন থাকব। শ্বশুর বাড়ীতে একমাস থাকল রাজকুমার। এদিকে রাজকুমার তার সেই মন্ত্রীকে বলল, বন্দরের পশ্চিমে যে বিরাট বন আছে, সেই বনের শেষে তুমি জাহাজ নিয়ে একমাস পর অপেক্ষা করবে। আমি সেখানে গিয়ে জাহাজে চাপব। একমাস পর মেয়ে জামাই বাড়ী যাবে। বেনে বহু টাকার দান কিনে আনল। রাজপুত্র বলল, আমাদের দেশে দান দিতে নাই। পেটারির ভিতরে এককড়া কড়ি দিতে হয়। বেনে পিঁপড়ের পোদ টিপে গুড় খায়। সে দেখল ভালই হলো, কিছু খরচ হলো না। একমাস পর একটা পালকী করে রাজপুত্র আর রূপবতী বনের মধ্য দিয়ে বনের শেষে হাজির হলো। বেনের মেয়ের রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। মনে এসেছে আনন্দের হিল্লোল; সে বলল, রাজপুত্র আমার ঘুম আসছে। রাজপুত্র বলল, বেশতো আমার জাঙ্গে মাথা দিয়ে ঘুমাও। জাঙ্গে মাথা দিয়ে রূপবতী বেভুল ঘুমিয়ে পড়ল। রাজপুত্র একে একে তার সব গহনা খুলে নিল, তারপর দামী কাপড় জামা খুলে একটা ছেঁড়া কাপড় পরাল। তারপর তার বুকের উপর এককড়া কড়ি চাপিয়ে রেখে চলে গেল, এবং জাহাজে চেপে চলে গেল। পালকীর বেয়ারাগণ তাদের নামিয়ে দিয়ে সকলেই চলে গেছে। রূপবতী ঘুম হতে উঠে দেখে স্বামী নাই। ভাবল, বাঘে খেল নাকি! তারপর দেখল তার গায়ে জামা নাই। পরণে ছেঁড়া কাপড়। পেটারী নাই। নীচে পড়ে আছে এককড়া কড়ি! তখন রূপবতী ভাবল ঠিক রাজপুত্র

তাকে বনবাসে দিয়ে গিয়েছে। এককড়া কড়ি আদায়ের শোধ নিয়েছে রাজপুত্র। রাতে একটা গাছে উঠে রাত কাটাল। কারণ বনে বাঘ, ভালুক আছে। পরদিন রূপবতী সেই কড়িটা কুড়িয়ে নিল। সেই দিকে পায়ে চলা একটা পথ ছিল। এক গরীব মোদক, একডালা মুড়ি মুড়্কি, গুড়ের পাটালি প্রভৃতি নিয়ে নদী পারে বিক্রী করতে যেতো। সে চলছে মাথায় ডালা নিয়ে। রূপবতী কড়িটা নিয়ে তার কাছে এসে বলল ঃ এই ময়রা! ডালা নামাও। ময়রা ডালা নামাল। রূপবতী বলল, আচ্ছা! মোদক দশ টাকার খাদ্যও খাদ্য, এক টাকার খাদ্যও খাদ্য। এক পয়সার খাদ্যও খাদ্য। আবার এক কড়িব খাদ্যও খাদ্য। ময়রা বলল, হ্যাঁ, খাদ্য। রূপবতী বলল, দশ টাকা বউনিও বউনি, একটাকা বউনিও বউনি, আবার এক কড়ির বউনিও বউনি। ময়রা বলল, হ্যাঁ বউনি। রূপবতী বলল, তবে আমাকে এক কড়ির মুড়ি মুড়্কি দাও। যা পাব, তাই দাও, বেশী নয়, কমও নয়। ময়রা বলল, দূর বাপু, এই বউনির সময় কড়ি কি হবে? রূপবতী বলল, আমিতো কথা বলে নিয়েছি। ময়রা রাগে এক মুঠো মুড়ি, আর এক মুঠো মুড়্কি তাব আঁচলে ফেলে দিয়ে নদী পার হয়ে বাজারে গেল। সেদিন তার কিছু বিক্রী হলো না। রূপবতী আঁচলে মুড়ি মুড়্কি কটা নিয়ে ভাবতে লাগল। আমি বড় লোকের মেয়ে। এই মুড়ি মুড়্কি আমাদের চাকরেও খায় নি। তাই মনের দুঃখে সে মুড়ি মুড়্কি গুলো বনের মধ্যে ফেলে দিল। আর রাত হলে সেই গাছে উঠে বসল।

সেই বনের এক যোজন দূরে ছিল আব একটা বড় বন। সেই বনে থাকতো সোনা লাদা ও রূপো লাদা পাখী। দুটো এই রকম পাখী এই বনে চরাট করতে আসতো। তারা সেদিন এসে পেট ভরে ঐ মুড়ি মুড়্কি খেল ও দু'জনে দু' ডেলা সোনা ও রূপো লেদে দিল। রূপবতী পরদিন নামল। তখন তার খুব খিদে পেয়েছে। বলল ঐ মুড়ি মুড়্কি কুড়িয়ে খেয়ে এক ঢোক জল খাবো। মুড়ি

মুড়্কি কুড়ুতে গিয়ে দেখল এক ডেলা সোনা এক ডেলা রূপো! সে তুটো সে কুড়িয়ে নিয়ে টেপে বাঁধল। এদিকে সেই ময়রার সেদিন কিছু বিক্রী হয় নি। তাই সে ঠিক করল আজ আগে দেখব মেয়েটি আছে কি না? তারপর তার অজান্তে চলে যাব। সোনা আর রূপো পেয়ে পথের উপর বসে থাকল রূপবতী। ময়রাও বসে থাকে এক গাছের আড়ালে। রূপবতী একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরল। আর তাকে বলল, ময়রা সোনা রূপো চেন? ময়রা বলল, চিনি। তখন কন্যা বলল এটা কি? ময়রা বলল, এটা সোনা। রূপবতী বলল যাও এই সোনা নিয়ে বাজারে। আর আমার জন্য কিনে আন চাল ডাল থালা বাসন ইত্যাদি। আর দড়ি বাঁশ কিনে এনে আমার একটা ঘর করে দাও। আর তুমি রোজ আমাকে দেবে দশ ডালা মুড়ি মুড়্কি। এক ঝুড়ি মুড়ি মুড়্কির দাম কত? ময়রা বলল, ছ' টাকা। রূপবতী বলল, তুমি বার টাকা পাবে। মুড়ির ডালা নামিয়ে ময়রা বাজারে গেল। তার ঘরে ছিল চার হাজার টাকা। ময়রা বাজারে গিয়ে সোনা পটিতে ঘুরে বেড়ায়, আব এদিক ওদিক চায়। এক বৃদ্ধ সোনার বেনে তাকে ডাকল ও বলল কী আছে? ময়রা বলে কিছু নাই, সোনার তাল আছে। ময়রা তখন সেই সোনাটাকে দেখাল। বলল. এ সোনা খুব দামী সোনা এর দাম তু'লাখ টাকা। ময়রা বলল, না ভাই, আমার মনিব বনের রাণী, সে এ টাকায় বিক্রী করতে বারণ করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। সোনার বেনে বলল, বেশ যাও। তার পর ময়রা রোদে একটু বসল। গরমে সে ঘেমে উঠল। বনে গিয়ে রূপবতীকে বলল, মা, এর দাম বলল চার হাজার টাকা। রূপবতী বলল, তাই নিয়ে এসো। ময়রা তার বাড়ী থেকে চার হাজার টাকা এনে দিল, আর বুড়ো সোনার বেনেকে তু' লাখ টাকায় সোনার তালটা বেচে দিল। এদিকে পাখী তুটো বনে ফিরে গিয়ে বলল, আজ নদীর ধারে বনে আমরা শাহদানা খেয়ে এসেছি। এ দানা কোনদিন খাইনি। বনের সব পাখী বলে,

তৈরী হলো। পাখীরা বলল, একথা যেন প্রকাশ করা না হয়। প্রকাশ করলেই পাথর হয়ে যাবি। এ দিকে ছয় ভাই জেগে উঠে দেখল, ছোট ভাইয়ের কুষ্ঠ ভাল হয়ে গেছে। সে একটা নৌকা করেছে। ভাইকে শুধাই কি করে ভাল হলো। সে বলল, নদীতে চাঁন করে ভাল হলো। নৌকা নিয়ে রাণীকে দিল। রাণী ছয় ভাইকে ছয় হাজার ও যে নৌকা করেছে তাকে সাত হাজার টাকা ইনাম দিল।

মন্ত্রীকে ডেকে বলল এই নৌকায় লিখে দাও নিরোল কাননের ঘাটে ডঙ্কা আছে। সেই ডঙ্কায় যে যত ঘা মারবে তত টাকা পাবে। নৌকায় লিখে নৌকা ছেড়ে দিয়ে রাণী বলল, নৌকা তুমি থামবে রাজা পৃথ্বীরাজের ঘাটে ঃ

মুনমুন কাঠের নৌকাখানি
পবন কাঠের দাঁড় খানি
শিঘ্রি করে যাবে নৌকা
পৃথুম রাজার নাম ধরে
পৃথুম রাজাকে লয়ে নৌকা
আবার আসবে ফিরে।

নৌকা গিয়ে সেই ঘাটে থামল। পৃথ্বীরাজ নৌকা দেখে অবাক। এ দিকে পৃথ্বীরাজের বাবা মারা গিয়েছে। পৃথ্বীরাজ এখন সাত মুলুকের রাজা। পৃথ্বীরাজ নৌকায় গিয়ে চাপল। রাণী পুষ্পবতী কাক চরিত্র জানতো। সে বেনের মেয়ের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারল। নৌকা পৃথুম রাজাকে নিয়ে ভেসে চলল। তারপর এসে নামল কাননের ঘাটে। রাজা দেখে সোনার আঁচির সোনার পাঁচির। রাণী বলল, মন্ত্রী একে সসম্মানে নিয়ে এসো, ভাল খাওয়ানো দাওয়ানো কর। তারপর রাণী বলল ঃ

ঃ গান ঃ

ও রাজা কি নাম তোমার মাতা পিতার
ও রাজা কি নাম বল তোমার।

কয় সাদি করেছ রাজা
এই পৃথিবীর মাঝারে
কয় জনাকে রেখেছ ঘরে
আর কয় জনাকে দাও বনে।

রাজা পুষ্পবতীর কথা শুনল না। সে বলল, ঘরে ধন ঢুকতে চলেছে আর রাণী দরজায় চাটি দিচ্ছে। পুষ্পবতী তখন বলছে :

: গান :

ওগো রাজা যেওনা বিদেশে
ওগো রাজা চেপো না কাষ্ঠের লায়ে
দেশে থেকে বিরাজ কর
বেড়াও মনের আহ্লাদে
বিদেশে যাবে কষ্ট পাবে—
মরবে মনের দুখেতে।

রাজা নৌকায় চেপে ভেসে চলেছে। নদীর জল রাজাকে বলছে :

: গান :

ওগো রাজা যেওনা বিদেশে
চেপো না কাষ্ঠের লায়েতে
লায়ে যাবে কষ্ট পাবে,
রাজা মরবে মনের দুঃখেতে
লায়ে চেপোনা রাজা
বাইশ মণের পাথর রাজা
চাপাবে তোমার বুকেতে।

রাজা :

ও কন্যা আমার নাম পৃথুম রাজা
পিতার নাম বিভাস্ত রাজা
দুই সাদি করেছি কন্যা এই পৃথিবীর মাঝারে
পুষ্পবতীকে রেখেছি ঘরে, আর
রূপবতীকে দিই বনে।

এই কথা শুনে রূপবতী পৃথুম রাজাকে কৌশলে বন্দী ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করল। আর তার বুকের উপর বাইশ মণের পাথর চাপিয়ে দিল। রাজা মনের দুঃখে বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

বাড়ী হতে আসবার কালে
পুষ্পবতী বারণ করে
কোথায় আছ পুষ্পবতী
বাইশ মণের পাথর এখন
আমার বুকে চেপেছে
কোথায় আছ পুষ্পবতী উদ্ধার করে
লাও মোরে।

রাজা বিন্তান্ত মরে গিয়েছে। পৃথুমরাজা এখন সাত মুলুকের রাজা।

[তিন]

স্বামীকে বন্দী করে, সতীন পুষ্পবতীকে বন্দী করার জন্য রূপবতী স্নুনারের (স্বর্ণকারের) মেয়ে সেজে সোনার উপর হীরা বসান বহু হার ও গহনা নিয়ে সেই নৌকায় চেপে আবার তার স্বামীর রাজ্যে এসে হাজির হলো। রাজবাড়ীর দাসীরা নদীর ঘাটে জল নিতে এসেছে। দেখল সাজান একটা নৌকা! নৌকায় বসে আছে এক রূপসী স্নুনারের মেয়ে। সে রাণীর কাছে গহনা বেচতে চায়। দাসীরা এসে রাণীকে বলল, রাণীমা নদীর ঘাটে পূর্বের সেই নৌকাটা এসেছে, তবে নৌকায় বসে আছে এক স্নুনারের মেয়ে, সে তোমার কাছে হার ইত্যাদি বেচতে চায়। রাণী পুষ্পবতী কাকচরিত্র জানতো। সে দোতলায় গিয়ে কাকচরিত্র বই খুলে দেখল, এই স্নুনারের মেয়ে সেজে যে এসেছে সে তার সতীন রূপবতী। সে তাকে বন্দী করতে চায়। দাসীদের বলল, যা ডেকে নিয়ে আয় সেই স্নুনারের মেয়েকে। স্নুনারের মেয়ে এলো। সাত দেউড়ী রাজার বাড়ী। তিন দেউড়ীতে ঢুকে দাসীরা তাকে বসতে বলল। দাসীরা হীরার হার নিয়ে গেল রাণীর কাছে। রাণী নেমে এসে

সেই তিন দেউড়ীর ঘরে বেনের মেয়ে রূপবতীকে বন্দী করে বলল, থাক বন্দী হয়ে। তোর স্বামীর উপর একটু মায়া হলো না; তার সঙ্গে তো কিছুদিন ঘর সংসার করেছিস। রাজাকে বন্দী করে বাইশমণের পাথর বুকে চাপিয়ে রেখেছিস, যদি সে মরে যায়! তাই থাক এখানে বন্দী হয়ে। রাজাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে তোর ব্যবস্থা করবো। হারটি হাতে নিয়ে পুষ্পবতী কাঁদছে ঃ

ঃ গান ঃ

হার মতিহার, চন্দ্রহার
কার বা গলে দিব হার
থাকতো পতি, এই হার মতি
সামনে পড়তাম উজলা
পতি আছে বন্দী হয়ে
কেমনে পরি চন্দ্রহার
পতি বিনে যেমনে তাকাই
সকলি দেখি অন্ধকার।

রাণী পুষ্পবতীর ছিল ছোট ছোট দুই পুত্র। বড়টির নাম বসন্ত, ছোটটির নাম শ্বেত। রাণী পতিকে উদ্ধার করতে যাবে, শ্বেত আর বসন্তকে কাকে দিয়ে যাবে? দাইমা সতীকন্যা। সে শ্বেত বসন্তকে ভালবাসে। তাকে ডেকে পাঠিয়ে নিয়ে এলো। বললে দাইমা, এই শ্বেত আর বসন্ত থাকল। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমার কাছে থাকবে। তুমি এদের যত্নে রাখবে।

ঃ গান ঃ

শোন বলি ওগো দাইমা সতী
খোঁজে চললাম আমি নিজ পতি
জ্বলছে যেন দুইটি মানিক
রেখ যেন যত্নেতে
আবার যদি আসি ঘুরে
এই হার দিব তুর গলেতে।

এই কথা বলে পুষ্পবতী সেই মুন মুন কাঠের নৌকায় গিয়ে চাপল। নৌকা তখন উজানে চলে যাচ্ছে। নদীর জলকে পুষ্পবতী শুধাল আমার স্বামীকে দেখেছ? নদীর জল বলছেঃ

ঃ গান ঃ

ওগো কন্যা দেখে এলাম নিরলে
ওগো কন্যা শুনে এলাম কাননে
একজন পতি কাঁদছে ওগো পুষ্পবতীর নাম ধরে
বলছে, কোথা আছো পুষ্পবতী, উদ্ধার করে নাও মোরে।

নদীর জলের নিকট এই কথা শুনে পুষ্পবতী চলে যায়। নৌকা গিয়ে থামল নিরলের কাননের ঘাটে। সেখানের ঘাটে যারা ছিল, তারা দেখলে এক সুন্দরী রূপসী নৌকা হতে নামছে। তারা ভাবল তাদের সেই রাণী রূপবতী। কন্যা ঘাট হতে চলে গেল মহলে। খুঁজে খুঁজে দেখছে কোথায় রাজা বন্দী হয়ে আছে। বন্দী ঘরের কাছে গিয়ে দেখছে বন্দী ঘরের দরজা বন্ধ। সতী তখন বন্ধ ঘরের দরজায় মারল এক লাথি। দরজা খুলে গেল। দেখল রাজার বুকে বাইশমণের পাথর। পাথর সরিয়ে রাজাকে উদ্ধার করে নৌকায় চাপাল। ঘাটের পাশে ছিল শ্যামলতা তরুলতার গাছ। তার পাশ দিয়ে কন্যা তখন স্বামী নিয়ে আসছে। সেই নৌকায় চেপে অর্ধেক পথে এসে পুষ্পবতী, রাজাকে বলছে, হে স্বামী, আমি তোমাকে তিনবার শুধাব। যদি জবাব না দাও তাহলে এই যমুনা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরবো। রাজা তুমি আমাকে চাও, না রূপবতীকে চাও? রূপবতীকে বন্দী করে রেখে এসেছি আমাদের বাড়ীতে, তারপর তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছি। রাজা অনেক দিন বন্দী হয়ে ছিল। বুকে ছিল বাইশমণের পাথর। মুখে সে কোন কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু সব বুঝতে বা শুনতে পাচ্ছিল। রাজা মনে মনে বললে রূপবতীকে গিয়ে হত্যা করবে। কিন্তু পুষ্পবতী তার মনের কথা বুঝতে পারল না বা রাজার কোন মতামত পেল না। পুষ্পবতী ভাবল সোনার আঁচির সোনার পাঁচির

আর সোনার সিংহাসন দেখে ভুলে গেছে। কথা শুনতে না পেয়ে রাণী পুষ্পবতী যমুনায় ঝাঁপ দিল। সাথে সাথে সে এক পদ্মফুল হয়ে নদীতে ভাসতে লাগল। নৌকা গিয়ে প্রথম রাজার ঘাটে লাগল। রাজা নিজের বাড়ীতে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। পরে রাজার মুখে কথা ফুটল। রাজা বন্দী রূপবতীকে কাটতে গেল। রূপবতী রাজার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল রক্ষা কর। আর কোনদিন এমন কাজ করবো না। রাজা দেখলো, পুষ্পবতী জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। রাজা তখন রূপবতীকে ক্ষমা করে তার সঙ্গে ঘর সংসার করতে লাগল। রূপবতী মোদককে মন্ত্রী করে রেখে দিল আর ধনরত্ন সব নিয়ে এলো স্বামীর রাজ্যে।

দুইজনে এক সঙ্গে থাকে। রাজা একদিন বাড়ীর দাসীদের বললে আমার শ্বেত, বসন্ত নামে দুই পুত্র ছিল, তারা কোথায়? দাসীরা বলল, তারা আছে দাই মায়ের কাছে। রূপবতী শুনল। তারপর রাজাকে বলল আমার তো কোন ছেলে নাই, পুত্রদের নিয়ে এসো, তাদের মানুষ করবো। শ্বেত, বসন্ত এরপর দাই মায়ের কাছ থেকে রাজবাড়ীতে এলো। দুই ছেলে নিয়ে রূপবতী ও রাজা বেশ সুখে আছে। রাজবাড়ীর পাশে ছিল এক চাষীর বাড়ী। চাষীর সাত ছেলে। শেষেরটি খব ছোট। এমনি সময় চাষীর বিবি মরে গেল। চাষী বড় ছেলেকে বললে তুই বিয়ে কর, রাঁধাবাড়া করতে হবে। বড় ছেলে বললে, না তোমার আর একটা বিয়ে দিয়ে দিই। সে রান্নাবাড়া করবে, আর আমাদের ছোট ভাইকে দেখবে। তাই হলো। চাষীর নতুন বিবি এলো। সে কিন্তু ছোট ছেলেকে যত্ন করে না। এই দেখে একদিন তার সতীনের ছয় ছেলে তাকে খুব মারল। সে উঠানে বসে বসে কাঁদে। রূপবতী দেখলে সে কাঁদছে। পর পর কয় দিন এই ভাবে সে মার খেল। আর রূপবতী দেখল। একদিন রূপবতী ডেকে তাকে শুধাল, কি হয়েছে, কেন তোমাকে রোজ রোজ ওরা মারছে? মেয়েটি বললে সতীনের ছেলে এত যত্ন করি, তবুও বিনা দোষে

মারছে। তারপর চাষীর বিবি রূপবতীকে শুধাল, যাক তুমি ভাল আছ, তবে তোমাকে দুই ছেলের মা বলে তো মনে হয় না।

ঃ গান ঃ

ওগো শ্যামলতা গো, তরুলতা
ওগো কন্যা তোমার হলুদ বরণ গা
ও গো তোমায় দেখে লাগে না কন্যা
দুই ছেলের মা
ও গো কন্যা ধন্য দেখি গো তোমার মা।

রূপবতী বললে, এই ছেলে দুটি আমার নয়; আমার সতীনের। চাষীর বিবি বললে ওরা একটু বড় হলে, তোমার দশা আমার মতনই হবে। এখন থেকে তুমি তার ব্যবস্থা কর।

কয় দিন পর শ্বেত আর বসন্ত পাঠশালায় পড়াতে গিয়েছে। আর রূপবতী চুল, কাপড় ছিঁড়ে বসে বসে কাঁদছে। রাজা বাড়ী এসে রূপবতীর অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল ঃ

গান ঃ

ওগো উঠ উঠ সখী গো
তোমায় আজ কেন দেখি এমন।
ও গো চক্ষু খোল বদন তোল
জুড়াক রে আমার জীবন।
কে মেরেছে, কে ধরেছে নেবো গো
তাহার গর্দন।

রাণী বললে, তোমার দুই পুত্র শ্বেত ও বসন্ত পাঠশালা হতে টিফিন খেতে বাড়ী এসেছিল। খাবার দিতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই তারা আমাকে মারধোর করে গেল। রাজা বললে, ছেলে দুটো এলেই জল্লাদ ডেকে তাদের খুন করব। এ কথা দাসীরা শুনে, দাই মাকে বললে। দাই মা, পাঠশালার মাস্টারকে সবকথা বললে। তখন মাস্টার আর মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, মহারাজ এ ক্ষেত্রে ছেলে দুটোকে মাফ দিন। বহু সাধ্য সাধনা করে তবে ছেলে পাওয়া

যার। মারা গেল ছেলেরাই মুখে আগুন দেবে। রাজা বললে, এ কথা ঠিক। মাস্টার আর মন্ত্রীর কথায় রাজা বললে, হ্যাঁ একথা ঠিকই বটে। ছেলে দুটো সে যাত্রা বেঁচে গেল। কয়েক মাস পর আবার রূপবতী মিথ্যা করে বসে আছে চুল ছিঁড়ে কাপড় ছিঁড়ে। রাজা সব শুনে বললে আজ আর কারও কথা শুনছি না। আজ এলেই তাদের খুন করবো। দাসী আবার একথা দাই মাকে জানাল। দাইমা তখন এই কথা লিখে শ্বেত আর বসন্তকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলে, লিখনটি সদর দরজায় টাঙিয়ে দিল। আর নিজে খিড়কি দুয়ারে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পাঠশালা থেকে ফিরতি পথে বাড়ীর সামনে বসন্ত লিখন দেখে পড়ল। শ্বেত বাড়ী যেতে চায়। বসন্ত লিখন পড়ে বলে, না আর বাড়ী যাওয়া হবে না। শ্বেত বললে একবার বাবাকে দেখবো। বসন্ত বললে, না আর বাড়ী যাওয়া হবে না, বাবাকেও দেখা হবে না।

ঃ গান ঃ

ওরে শ্বেত কাঁদে, বসন্ত কাঁদে
ঘরে মোদের মা যে নাই,
পাঠশাল হতে ফিরে আমরা বারদুয়ারে লিখন পাই
ওগো যত্ন করলে সতের মায়ে
ওগো দেশ ছেড়ে বিদেশে যায়
ওগো পিতা আছে খঞ্জর ধরে
কখন কেটে ফেলবে ভাই।

এই কথা বলে শ্বেত আর বসন্ত দুই জনে, তাদের ঘোড়া শালে গেল। দুটো ভাল সাদা ঘোড়া ছিল, তার পিঠে সওয়ার হয়ে দুই ভাই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

[চার]

দুই ভাই ঘোড়ায় চেপে সাত দিন সাত রাত চলল। আর ভোর রাতে এক রাজার রাজধানীর কাছে এসে থামল। পথের ধারে বাগান ঘেরা বড় পুষ্করিণী। গাছে ঘোড়া বেঁধে, তারা

গাছতলায় বসল। বসন্ত তার ছোট ভাইকে বললে, তুই চুলো কাট, জ্বালট কুড়িয়ে রাখ, আমি চাল ডাল, হাঁড়ি নিয়ে আসি। চাল ডাল আনা হলে বসন্ত ঘাটে হাঁড়ি ধুতে গেল। সেই পুকুরে দুটো মাছ সোল আর গজারী। গজারী সোলকে বলছে আমরা অনেকদিন আছি, আমাদের সাথে যেসব মাছ ছিল সব মরে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের মরণ হলো না কেন? সোল মাছ বললে আমাদের এখন মরণ হবে না। শ্বেত-বসন্ত এলে আমাদের মরণ হবে। শ্বেত-বসন্তের মধ্যে যে আমাকে খাবে, সে সাঁজো রাজা হবে, আর যে তুকে খাবে সে বার বৎসর কষ্ট পাবে, তারপর রাজা হবে। বসন্ত সব শুনল, সে ঠিক করল গজারী মাছটা সে খাবে আর সোল মাছটা ছোট ভাই শ্বেতকে খাওয়াবে। এই বলে যেই সে হাঁড়ীটা জলে ডুবিয়েছে অমনি মাছ দুটো হাঁড়ীতে উঠে এসেছে। মাছ দুটো শ্বেতের কাছে রেখে আবার পুকুরে জল আনতে গেল বসন্ত। আর শ্বেত মাছ দুটোকে পুড়িয়ে আঁস তুলে রেখে দিল। দুটো মাছ একই রকম হয়ে গেল। কোনটা সোল, কোনটা গজারী চেনা গেল না। বসন্ত জল নিয়ে এসে দেখছে, শ্বেত মাছ দুটো পুড়িয়ে ফেলেছে। ভাত রান্না হলো। মাছ দুটো আলাদা করে নুন, লঙ্কা মাখান হলো। বসন্ত শ্বেতকে বলল তারপর — যেটা খুশী তুই খা। কপালে যা আছে তাই হবে। শ্বেত গজারী মাছটা নিল আর বসন্ত সোলটা নিল। কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না কোনটা সোল, কোনটা গজারী। দিন গেল, সন্ধ্যা হলো। দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে সেই রাজ্যের রাজা মারা গিয়েছে। রাজার কোন পুত্র নাই, কন্যা নাই। কেহ নাই। তাই মন্ত্রী এবং সভাসদ্ মন্ত্রনা ক'রে রাজার শ্বেত হাতীর পিঠে একটা সিংহাসন বেঁধে ছেড়ে দিল। শ্বেতহাতী যাকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আসবে, সেই রাজা হবে। শ্বেতহাতী চলে গেল, যেখানে শ্বেত আর বসন্ত শুয়ে ছিল। তারপর বসন্তকে পিঠে তুলে নিয়ে চলে এলো রাজপুরী।

বসন্ত রাজা হলো। রাজা হয়ে বিধির বিধানে সে তার ছোট ভাই শ্বেতকে ভুলে গেল। সকাল হলো, শ্বেত দেখছে দাদা নাই। ভাবল কোথাও মুখ হাত ধুতে গিয়েছে কিন্তু বসন্ত ফিরল না। শ্বেত তখন দুটো ঘোড়া নিয়ে কাঁদতে লাগল ঃ

ঃ গান ঃ

ওরে শ্বেত কাঁদে বসন্ত রে ভাই
আমারা বার দুয়ারে লিখন পাই
ও গো একলা ফেলে চলে গেলে
কোথায় আছ ও দাদা গো
আমায় তুমি দেখা দাও।
ও গো দুটি ঘোড়া হাতে লয়ে
কাঁদি হেথা গাছ তলায়।

বসন্ত যেখানে রাজা হয়েছে, সেখানে পূর্বেকার রাজার আমলে দুটো সাদা ঘোড়া চুরি হয়ে গিয়েছিল। নূতন রাজা হাতীশাল, ঘোড়াশাল দেখতে গেল, ঘেসেড়া দুটো ঘোড়া চুরির কথা জানাল। রাজা বসন্ত বললে, সাত দিনের ভিতরে চুরি-যাওয়া ঘোড়া উদ্ধার করতে হবে, নইলে গর্দ্দান যাবে। ঘেসেড়ারা বিপদে পড়ল। তারা ঘোড়া খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। এ দিকে ঘোড়া নিয়ে শ্বেত কাঁদছে ঃ

ঃ গান ঃ

ও গো বাড়ী হতে আসবার কালে
দাদা ভায়ে একসঙ্গে রে
আজ একলা ফেলে চলে গেলে।
আমি কাঁদি ওগো দ্বারে দ্বারে
দুটি ঘোড়া হাতে করে—
ও দাদা দেখা দাওনা আমারে।

ঘেসেড়াদের সঙ্গে কোটাল ছিল। দুটি ঘোড়া হাতে শ্বেতকে দেখে ঘোড়া চোর বলে ধরে ফেলল। শ্বেত বললে, আমি চোর নই, একটি আমার ঘোড়া ও একটি আমার দাদার ঘোড়া। কোটাল শুনল না।

তাকে চোর বলে ধরে বাঁধল ও মারতে লাগল। শ্বেত তখন বলছে:ঃ

ঃ গান ঃ

ও গো মেরো না, মেরোনা কোটাল
ওগো বেঁধোনা গো মোরে
আমি নিজের ঘোড়া হাতে লয়ে
কাঁদি গো দ্বারে দ্বারে।
কোথায় আছ ও গো দাদা
উদ্ধার করে লাও মোরে।

কোটাল কোন কথা শুনল না, ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা বসন্ত তখন খুব ব্যস্ত ছিল। সে শুনল ঘোড়া চোর ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল জেলে দাও। শ্বেতের সঙ্গে বসন্তের আর দেখা হলো না। শ্বেত জেলে গেল। জেলে গিয়ে কাঁদতে লাগলো ঃ

ঃ গান ঃ

ও গো শোন রাজা শাহজী
তুমি আমার বিচার গো করলে কি
আমার নিজের ঘোড়া কেড়ে লয়ে
ও রাজা উল্টিয়ে কয়েদ দিলি।
ও রাজা আমাব বিচার করলে কি ?

জেলে সে এই বলে খুব কাঁদে।

জেলখানার পাশে ছিল এক গয়লা ঘোষের বাড়ী। দুধের ব্যবসা ছিল তার। এই জন্য তার কয়টা কপিলা গাই ছিল। সারা রাত শ্বেতের কান্না শুনে সে রাজার কাছে গেল। রাজাকে জোড় হাতে বললে, হুজুর ঐ ঘোড়া চোর, চোর নয়, চোরের ভাইও নয়। ওকে হুজুর ছেড়ে দিন। ঘোষের কথা শুনে রাজা ঘোড়া চোরকে ছেড়ে দিল। শ্বেত জেল হতে ছাড়া পেয়ে ঘোষের বাড়ীতে গেল। ঘোষ গিন্নি শ্বেতকে দেখতে পারে না। ঘোষ শ্বেতকে মাঠে নিয়ে যায়; কপিলাকে চরায়, বাড়ী আনে। এইভাবে মাস খানেক

কাট্‌ল। ঘোষের একটি বোন ছিল। তার বিয়ে হয়েছিল এক গাঁয়ে। বোন আর তার ভগ্নীপতি। ছেলেরা ছোট। ভগ্নীপতির মা মারা গিয়েছে, শ্রাদ্ধ কর্ম। তাই ঘোষকে খবর পাঠিয়েছে বোন। সেখানে যেতে হবে, নইলে কাজের অসুবিধা হবে। ঘোষ চলে গেল। ঘোষাণী শ্বেতকে বললে গরু নিয়ে যা আর এই ঝুড়ি নিয়ে যা। এক ঝুড়ি গোবর আনবি। কি করে! ঝুড়ি নিয়ে সে মাঠে গরু চরাতে গেল। গরু চরান শেষ হলো। গোবর হলো এক ঝুড়ি। কিন্তু তার মাথায় কেউ ঝুড়ি তুলে দেয় না। বলে, গোবর নিয়ে গেলে, কাল হতে আমার মণিবরা গরুর সাথে ঝুড়ি দেবে। কি আব করে! ঝুড়ি ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এলো। ঝুড়ির বনন ভেঙ্গে গেল। বাড়ী গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বললে খেতে দাও। ঘোষাণী বললে গা ধুবি না? শ্বেত বললে, মাঠে গা ধুয়েছি। শ্বেত নাকে মুখে গুঁজে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হয়েছে। অমনি ঘোষাণী গোবরের ঝুড়ি দেখল ভাঙ্গা। মুড়ো ঝাঁটা হাতে শ্বেতের কাছে এসে ঝাঁটার বাড়ি মারল পিঠে। তারপর শ্বেতকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিল। যাবার কালে শ্বেত ঘোষাণীকে বললে ঃ

ঃ গান ঃ

ও তু গয়লার ঘরে জন্ম নিলি
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি
অবশেষে বিনা দোষে ঘোষাণী ঝাঁটা মেলি।
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি।

এই বলে মনের দুঃখে শ্বেত যেদিকে দু'চোখ চায় চলতে লাগল। কয়েকদিন পর পেল এক ধূ ধূ প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে সে দেখতে পেল, চারিদিক ইটে-বাঁধানো একটা ইন্দারা। ইন্দারার পাশে একটা বড় বালতি আর বড় রসা পড়ে আছে। পিপাসা লেগেছে খুব। রসাটা হাতে ধরে ইন্দারায় বালতি ফেলে দিল। তারপর বালতি তুলতে লাগল। চার ভাগের তিনভাগ যখন উঠেছে, তখন দেখল বালতির উপর বসে আছে এক বাঘ। ভয়ে বালতি

নামাতে লাগল। বাঘ বললে, দোঁহাই গুরু, আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার ক্ষতি করবো না, আমি, আমার বংশধর তোমার সেবা করবো। শ্বেত বাঘকে নামিয়ে দিল। বাঘ বললে খুব পিপাসা লেগেছিল, তাই কুয়োতে নেমে ছিলাম, আর উঠতে পারি নি। কুয়োতে এখন একটা কুমীর ও বানর আছে। একে একে শ্বেত ঐ কুমীর ও বানরকে উদ্ধার করল। কুমীর বললে জলের মধ্যে যদি বিপদ হয় তাহলে আমি, আমার বংশধর তোমাকে রক্ষা করবে। বানর শ্বেতকে একটি হীরার আংটি দিল। এই আংটি ঘষলে যা চাইবে তাই পাবে। তবে এখন তোমার বিপদ চলছে। আংটি তুমি আঙ্গুলে না পরে নেংটিতে বেঁধে রাখ। শ্বেত তাই করল। প্রান্তর পার হয়ে সে এক শহরে পৌঁছাল। শহরে গিয়ে সে খুঁজতে লাগল কেউ চাকব রাখবে কি-া !

এই শহরে এক রূপসী বেশ্যা বাস করতো। তার মাও বেশ্যা ছিল। সে বললে চাকর রাখব। এই বলে শ্বেতকে বাড়ী নিয়ে গেল। কয়দিন পব বেশ্যার মায়েব শ্রাদ্ধ কাজ। লুচি ভাজার জন্য তেল চাই। কুলুকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, আমার চাকরকে নিয়ে যাও। তোমার কানা এঁড়েকে প্রথমে ঘানিতে জুড়বে, সে এক পাক টানার পর শুয়ে পড়লে আমার এই চাকরকে জুড়বে ঘানিতে। এর গায়ে খুব শক্তি। বলবে ঘানিটা খারাপ হবে একটু টান বাবা, আমি মামাদের গরুটা নিয়ে আসি। সর্ষে পীড়ানো হলে ঘানিঘরে যাবে। এই কথা হলো কুলুর সাথে বেশ্যার। বেশ্যা শ্বেতকে সর্ষে দিয়ে কুলুর নিকট ঘানি পিড়াতে পাঠাল। কুলু ঘানিতে সর্ষে দিয়ে তার কানা এঁড়ে জুড়ে দিল। এক পাক দিয়ে কানা এঁড়ে শুয়ে পড়ল, কুলু ও শ্বেত অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু এঁড়ে পড়ে পড়ে মার খায়, আর উঠে না। কুলু বললে বাবা তুই ঘানিটা একটু টান, নইলে ঘানি খারাপ হবে, আমি ওপাড়ায় মামার কাছ হতে ভাল গরুটা নিয়ে আসি, তারপর তুকে ছেড়ে দিব। এই বলে শ্বেতের দু চোখে ঠুলি দিয়ে ঘানিতে জুড়ে দিল। শ্বেত

ঘানি টানে। কুলু নারকেলের হুকোটা হাতে তার তাঁতী বন্ধুর কাছে গিয়ে গল্প করে আর হুকো খায়। তাঁতী বলে আজ তোমার কানা এঁড়ে বেশ ভাল ঘানি টানছে হে। কুলু বললে এঁড়েটার তলপেটে পাঁচানের গুঁতো দিতেই কাজ হয়েছে। খুব টানছে আজ। কুলু বুঝল এইবার ঘানি শেষ হবে, তখন সে এসে হাজির হলো। তারপর শ্বেতের মুখে জল দিয়ে মুছিয়ে দিল। খৈইলটা কুলু নিল, আর তেলটা বেশ্যাকে দিল। বেশ্যার সঙ্গে এই কথা ছিল। শ্বেত বললে এই নাও তেল, এই বলে সে মনের দুঃখে বেশ্যাকে বললে :

ঃ গান ঃ

ও তু বেশ্যার ঘরে জন্ম নিলি
ও তু রাজার ছেলে চাকর থলি
অবশেষে কপাল দোষে
কুলুর ঘানি টানালি
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি।

শ্বেত বললে আর আমি তোমার কাছে থাকবো না। বেশ্যা বললে আমি বেশ্যা, আমার মায়ের শ্রাদ্ধ হবে। এঁটো পাতা ফেলা হবে, সেখানে চিল, কাক উড়বে। সেই চিল কাক তাড়ানো শেষ হলে তোমার ছুটি। কি আর করে, শ্রাদ্ধের দিনে এঁটো পাতার কাকচিল তাড়িয়ে দিয়ে বেশ্যাকে বলল :

ঃ গান ঃ

ও তু বেশ্যার ঘরে জন্ম নিলি
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি
অবশেষে কপাল দোষে ও তু এঁটো পাতার
কাক তাড়িয়ে শোধ নিলি
ও তু রাজার ছেলে চাকর থুলি।

এদিকে এক সদাগরের সাতটা জাহাজ বালীর চড়ায় আটকে গিয়েছে। দেবতা স্বপ্ন দিয়েছে একটি মানুষ বলি দিতে হবে, তবে জাহাজ চলবে। কিন্তু ছেলে আর কেউ বেচে না। বেশ্যা একদিন

নদীতে জল আনতে গিয়েছে, সদাগরের সঙ্গে দেখা। বেশ্যা সব শুনে বললে, আমার ঘরে একটা ছেলে আছে, দেব। তবে টাকা আগাম লাগবে, আর জাহাজে চাকর রাখবো বলে নিয়ে আসতে হবে। সদাগর বললে, বেশ তাই হবে। বেশ্যা এক লাখ টাকা নিয়ে নিল। তারপর শ্বেতাকে বললে, যাও আমার কাছে আর থাকতে হবে না। এই সদাগর জাহাজের কাজের জন্য লোক খুঁজতে এসেছে এর সঙ্গে যাও। শ্বেত সদাগরের সঙ্গে চলে গেল। লাভের মধ্যে বেশ্যা এক লাখ টাকা পেল। সদাগর শ্বেতকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে বললে জাহাজ চরে আটকে গিয়েছে, তোমাকে বলি দিব। শ্বেত বলে সেরকম তো কথা নাই। সদাগর বললে আমি টাকা দিয়ে তোমাকে কিনেছি। শ্বেত বললে বলি ছাড়া যদি জাহাজ চালিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমাকে ছেড়ে দেবে? সদাগর বললে জাহাজ চললে ছেড়ে দেব। শ্বেত তখন বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

ও সাধু কিনে আনলি আমারে
ও বলি দিবার জন্যেতে
ও সাধু আমার রক্ত খাবে লেকিন
কালীদহের মাঝারে
কোথা আছগো মা জননী
উদ্ধার করে লাও মোরে।

সেই নদীতে শ্বেত, বসন্তের মা পদ্ম ফুল হয়ে ভাসছিল। সতীকন্যা পুত্রকে বাঁচানোর জন্য নদীকে বললে, নদীর বালি সরে গেল। বালি কেটে জাহাজ চলতে লাগল। সদাগরকে শ্বেত বললে এই-বার আমাকে ছেড়ে দাও। সদাগর বললে তা হবে না, আবার যদি চড়ায় জাহাজ লাগে। সদাগরের সাত জাহাজ ছাগল ছিল। সব অল্প দামে ছোট দেখে কেনা। এই গুলো দরিয়ার ধারে বনে চড়িয়ে বড় করে বিক্রী করতো। এই ভাবে যে দামে কিনতো, তার দ্বিগুণ দামে ছাগল বিক্রী হতো। কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর

ধারে বন, বনে প্রচুর ঘাস। সেই বনে সাত জাহাজ ছাগল চরাতে পাঠালো শ্বেতকে। শ্বেত ছাগল নিয়ে গেল বনে। সেই বনে বাস করতো এক বাঘ, তার ছেলে ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। এই বাঘ ছিল সেই কুয়োর বাঘ। বাঘ দেখলো গুরুকে। গাছের ফল এনে খাওয়ালো। তারপর সাঙ্গপাঙ্গদের বললে এর একটা ছাগল যেন নষ্ট না হয়। চারিদিক বাঘ দিয়ে ঘেরা। ছাগলরা ভয়ে চরাট করে না, মোটাও হয় না। কিছুদিন পর সদাগর জাহাজ ছেড়ে দিল। দেখল ছাগল বেশ বাড়ে নাই। সদাগর শ্বেতকে বললে ছাগলের এমন অবস্থা কেন? শ্বেত বললে, আমি কি করবো, ছাগল যদি না মোটা হয়। যাক কি আর হবে। অন্য একটা জাহাজে সদাগর থাকে, আর একটা নৌকায় থাকে চাকররা, শ্বেত সেই নৌকায় থাকে। কিছুদিন পর নৌকা ও জাহাজ অন্য এক রাজ্যে এসে লাগল।

সেই দেশের রাজার সাত মেয়ে। ছয়টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট মেয়েটি প্রতিদিন একবার শিবপূজা করে। এখনও তার বিয়ে হয় নি। এখন মেয়ের বয়স হয়েছে ১৫ বছর। রূপসী সুন্দরী এই রাজকন্যার ইচ্ছা বরমাল্য দেবে। এর জন্য রাজার লোক ঢেডি দিচ্ছে। জাহাজ ঘাটাতেও ঢেড়ি পড়ল। সদাগর সেজেগুজে — যাচ্ছে, যদি কন্যা তার গলায় মালা দেয়। শ্বেত বললে, সদাগর আমাকেও নিয়ে চল। সদাগর বললে, তুই কি জন্যে যাবি? শ্বেত বললে, তুমি রাজ সভায় যাবে, তোমার জুতো ধরার একটা লোক তো চাই? সদাগর বললে, ঠিক বলেছিস্। সভায় অনেক দেশের রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে, বণিকের ছেলে সব এসেছে। ছাগল বেচা সদাগর ও তার চাকর সেজে শ্বেতও এসেছে। কন্যা শিবের পূজা করে বর চাইল, কার গলায় মালা দেবে? শিব বললে, দরজার কাছে বসে যে জুতো আগ্‌লাচ্ছে বা যার বগলে জুতো আছে তার গলায় মালা দেবে। কন্যা মালা নিয়ে শ্বেতের গলায় দিল, আর অমনি হৈ হৈ। কন্যা কার গলায় মালা দিল! রাজা একটা

বড় খাতা বের ক'রে অভ্যাগতদের নাম লিখে নিলো, সদাগর ও শ্বেতের নামও লিখল। রাজা হুকুম দিল যাদের নাম লিখলাম, আগামী কাল তাদের সকলকে আসতে হবে। নিজ নিজ চাকরকেও আনতে হবে। যার চাকর আসবে না, তার মুণিবের গর্দান যাবে। ঐ দিন কন্যা যার গলায় মালা দেবে তার সঙ্গে রাজ কন্যার বিয়ে হবে। পরদিন সদাগর সেজেগুজে তৈরী হলো। এদিকে শ্বেত তার আংটি ঘষে বললে, আমাকে কুষ্ঠ ব্যাধি দাও। নৌকায় পড়ে কাতরাতে লাগল। সদাগর ডাকে, সে কাঁদে, বলে আমি হেঁটে যেতে পারবো না। না নিয়ে গেলে গর্দান যাবে। শ্বেতকে অগত্যা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হলো। কন্যা সেদিন আবার শিব পূজা করে বর চাইল। শিব বললে, আজ তোর বর কুষ্ঠব্যাধি রোগী সেজে এসেছে, সে রাজার ছেলে, পৃথুম রাজার ছেলে, আর বিস্তান্ত রাজার নাতি। তার গলায় মালা দিবি। সেদিনও রাজকন্যা মালা হাতে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কুষ্ঠব্যাধিরূপী শ্বেতের গলায় মালা দিল। তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। রাজকন্যার ছয় দিদি বলছে ঃ

গান ঃ

ও বুন তুই শিবপূজা করে ছিলি
ও তু বেছে বেছে বর নিলি
ও গো এত দিন পরে তু পিতার নামটি ডুবালি
ও তু বেছে বেছে বর নিলি

ছোট কন্যা বলছে ঃ

ও দিদি শিব পূজা করে ছিলাম
আমি বেছে বেছে বর নিলাম
এত দিন পরে ওগো দিদি
পিতার নামটি তুল্‌লাম।
ওগো বেছে বেছে বর নিলাম।

বিবাহের রাতে শ্বেত আংটির সাহায্যে রাজপুত্র সাজ্‌ল, আর বললে, বার বৎসর পোহাতে দেরী নাই। রাজকন্যা বললে দিদি

কাল ছিল ভাল লোক, আজ কি ভাবে কুষ্ঠ হলো। বললে, আজ রাতে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে, বরকে দেখাব। সেদিন রাতে রাজা রাণী ও ছয় কন্যা জানালায় মুখ দিয়ে দেখছে। রাজ কন্যা বললে তোমায় আসল রূপ দেখাব। সেদিন আংটির সাহায্যে শ্বেত পূর্বের চেয়ে রূপবান হলো। সোনার রাজপোশাক, সোনার রাজ মুকুট দেখে রাজা, রাণী ও ছয় কন্যা মূর্ছা গেল। সকলে বুঝল ছদ্ম-বেশী রাজপুত্র তাদের ছোট জামাই। রাজ কন্যা বললে আমাকে এমন একটা সিন্দুক বানিয়ে দাও যার মধ্যে একটা মানুষ শুয়ে ও বসে থাকতে পারে। এটা চাকররা যে নৌকায় থাকে, সেই নৌকায় তুল্‌ল। মাঝির সঙ্গে রাজ কন্যা 'দাদা' পাতাল। সদাগর ভাবল ভালই হলো, সুযোগ বুঝে চাকরকে জলে ফেলে দিয়ে রাজকন্যা বিয়ে করবে। রাজকন্যার পিতার রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে নৌকা। সদাগর কৌশল করে ডাকল শ্বেতকে আর ফেলে দিল নদীর জলে। শ্বেত সেই কুমীরকে স্মরণ করল, কুমীর এসে শ্বেতকে তুলে দিল চাকরদের নৌকায়। তখন রাত। কন্যা সেই সর্দ্দার মাঝির সাহায্যে শ্বেতকে ভরে রাখল সেই সিন্দুকে। সদাগর কন্যাকে বিবাহ করতে চাইল। কন্যা বললে বার বৎসর বাপ বিটি পাতান থাকবে, তারপর বিয়ে হবে। আর জোর করে বিয়ে করলে নদীতে ঝাঁপ্‌ দিয়ে ডুবে মরবো। নৌকার মধ্যে সিন্দুকের ভিতরে শ্বেত লুকিয়ে থাকল্‌। সদাগর জানতে পারল না। কতদিন পর নৌকা এসে বসন্তের রাজ্যে এসে পৌঁছাল। এদিকে বার বৎসর শেষ হতে আর সাতদিন বাকী।

রাজা বসন্তের এক বৃদ্ধা চাকরাণী ছিল। সেদিন খুব কাজ। পূর্বেকার রাজার মৃত্যুর দিন। ধুমধাম করে তা পালন করা হবে। রাজা সকল কর্মচারীকে ভোরে আসতে বলেছে। কিন্তু বৃদ্ধা মেয়েটির আসতে দেরী হয়েছে। রাজা শুধাল দেরী কেন? বৃদ্ধার মুখ দিয়ে "শীত" শব্দটি বিকৃত হয়ে "শ্বেত" হয়ে গেছে। সে বললে মহারাজ বড় শ্বেত তাই আসতে পারি নি। রাজার তখন তার ভাই

শ্বেতকে মনে পড়ে গেল। বৃদ্ধাকে বললে সাত দিনের মধ্যে শ্বেতের সন্ধান দিতে হবে নচেৎ গর্দান যাবে। বৃদ্ধা মন্ত্রীদের উপদেশ মত রাজার কাছে কয়েক হাজার টাকার কাপড়-চোপড় নিল, নিয়ে শ্বেতকে খুঁজতে গেল। নদীর ধারে বৃদ্ধার নাতি নাত্‌নি শ্বেতের কথা বলছে। শ্বেতের স্ত্রী শুনে শুনে রাজাকে খবর দিল শ্বেত এই নৌকায় আছে। রাজা সপারিষদ এসে কাঠের সিন্দুক হতে শ্বেতকে উদ্ধার করল। দু' ভায়ে মিলন হলো। সদাগরের কথা শুনে সদাগরকে কোমর পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা লাগিয়ে দেওয়া হলো। সাত জাহাজ মাল মাঝি সর্দ্দারকে দিল। আর মাঝিকে সোনার তাড়ু বালা বানিয়ে দিল।

[পাঁচ]

বসন্তের রাজ্যে দুই ভাই তাদের বৌদের নিয়ে বসবাস করতে লাগল। একদিন দুই জায়ে যমুনা নদীতে জল নিতে আর চাঁন করতে এসেছে। দেখছে একটা ভাল পদ্ম ফুল নদীর কিনারায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ফুল থেকে ভারী সুন্দর গন্ধ আসছে! শ্বেতের বৌ ফুলটি ধরতে গেলে, ও-ফুল ভেসে চলে গেল মাঝ দরিয়া দিয়ে। ফুল ভেসে যাচ্ছে আর বলছে ঃ

ও নারী ধরোনা ধরোনা ফুল
এ ফুল ধরো নাকো তুমি
ফুল আমি নইকো নারী
শ্বেত বসন্তের মা আমি।

বৌ দুটি বাড়ী গিয়ে শ্বেত আর বসন্তকে বললে, নদীতে একটা সুগন্ধী পদ্ম ফুল ভেসে বেড়াচ্ছে, ধরতে গেলে মাঝ দরিয়া দিয়ে চলে গেল, আর বলে গেল, আমি শ্বেত, বসন্তের মা। শ্বেত আর বসন্ত বৌদের নিয়ে ছুটে নদীর ঘাটে এলো। শ্বেত ঝাঁপ দিয়ে জলে নেমে ফুলটি ধরল। অমনি ফুল তার নারীরূপ ফিরে পেল। পুষ্পবতী তার দুই পুত্র শ্বেত আর বসন্ত ও তাদের বৌদের পেয়ে

খুব খুশী হলো। শ্বেত,' বসন্তের মা পুষ্পবতী বললে যতক্ষণ বেনের মেয়ে আমার সতীন রূপবতীর কাটা মাথা না দেখবো, ততক্ষণ জল খাবো না।

শ্বেত, বসন্ত তখন ঘোড়া ছুটিয়ে পিতার রাজ্যে এলো। পিতা তার পুত্রদের পেয়ে জড়িয়ে ধরল, বললে বেনের মেয়ের জন্যেই আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা। তারপর বুকে বাইশ মণের পাথর, পুষ্পবতীর যমুনায় ঝাঁপ, সব বলে রাজা কাঁদতে লাগল। শ্বেত, বসন্ত রূপবতীর চুলের মুঠি ধরে এক কোপে মাথা কেটে ফেলল। পুষ্পবতীর সঙ্গে রাজার আবার মিলন হলো। দাইমাকে ঘর বাড়ী বানিয়ে দিল। রাজা শ্বেতকে রাজ্য দিল। শ্বেত পিতৃরাজ্যে, আর বসন্ত তার নিজের রাজ্যে রাজা হলো। পুষ্পবতী ও প্রথম রাজা কোনদিন নিজ রাজ্যে থাকে, কোনদিন বসন্তের রাজ্যে থাকে। এইভাবে সুখে বসবাস করতে লাগল তারা।

—৭—

[রাজুয়া (থানা কাটোয়া, জেলা বর্ধমান) গ্রাম নিবাসী ৮০ বৎসর বয়স্ক শেখ মুহম্মদ ইসরাইলের নিকট হ'তে সংগৃহীত। তিনি এই গল্প শুনেছিলেন এই গ্রামের দিলজান শেখের নিকটে। দিলজান শেখ গল্পকথক, গায়ক ছিলেন। দুইজনই নিরক্ষর। —সংগ্রাহক]

॥ জীরেবতী ॥

এক গাঁয়ের ধারে ছিল এক নদী। সেই গাঁয়ে বাস করতো অনেক কুমোর। এই কুমোররা মাটির হাঁড়ি, কলসী, সরা ইত্যাদি তৈরী করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রী করতো। এই কুমোরদের মধ্যে এক ঘর ছিল, তারা স্বামী-স্ত্রী। তাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সব মেয়ে। এক এক করে তাদের ছয় কন্যা হলো। এই দেখে কুমোর রেগে গেল। কিন্তু এই কুমোরের স্ত্রী ও মেয়েরা কুমোরকে হাঁড়ি তৈরী কাজে সাহায্য করতো। কিছু দিন পর কুমোর গিন্নি আবার গর্ভবতী হলো। কুমোর বল্‌ল এবার যদি মেয়ে হয়, তাহলে তোকে মেরে ফেল্‌ব। সব কুমোরের বেটা ছেলে আছে। তারা সব হাঁড়ি গড়ার কাজ করে। আর আমার সব মেয়ে। মাঠ হ'তে মুনিষ করে হাঁড়ি গড়ার মাটি আনতে হয়। বেটা ছেলে থাকলে কত কাজ হতো। এই কথা শুনে কুমোরনী ভয়ে ভয়ে থাকে। কি জানি, মেয়ে যদি হয়, তাহলে তো মরণ অনিবার্য কুমোরের হাতে। যত প্রসবের সময় কাছে আসে কুমোরনী তত গাঁয়ে গাঁয়ে হাঁড়ি কুড়ি বেচতে যায়। একদিন কুমোরনী বড় বড় হাঁড়ি কড়াই বেচতে গিয়েছে। নদীর ধারে ধারে পায়ে চলা পথ। পথের দু' ধারে জীরের ভুঁই। ভুঁয়ে ভুঁয়ে বন লেগে গেছে জীরে গাছের। জীরে গাছের কাঁচা গন্ধে ভুঁইগুলো মৌ মৌ করছে। সেইখানে কুমোরনীর প্রসব বেদনা উঠল। কুমোরনী ফুলের মত সুন্দর এক কন্যা প্রসব করল। যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি দুধে আলতায় রং। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু এই কন্যা নিয়ে গেলে কুমোর তাকে মেরে ফেলবে। তাই মনের দুঃখে মেয়েকে হাঁড়িতে ভরে জীরের ভুঁয়ের মাঝে রেখে চলে এলো।

কুমোরকে বল্‌লে আমাদের একটা সুন্দর ছেলে হয়েছিল, তবে পেটে মরা। এই বলে কুমোরনী তার মেয়ের জন্য কাঁদতে লাগল। কুমোর বল্‌লে, কি আর হবে, কপাল।

কিছুক্ষণ পর সেই পথ দিয়ে ভিক্ষা করে এক ফকির ফিরে যাচ্ছিল নিজের দূর গাঁয়ে। সেইখানে এসে সে এক শিশুর কান্না শুনতে পেল। খুঁজতে খুঁজতে সে জীরের ভুঁই হতে কন্যাটিকে কোলে তুলে নিল। তার পরে তাকে তার বাড়ী নিয়ে গেল। কন্যা পেয়ে ফকির খুব আনন্দিত। পাড়া প্রতিবেশীর নিকট হতে তেল চেয়ে এনে, দুধ চেয়ে এনে কন্যা মানুষ করতে লাগল। ফকির ভিক্ষায় গেলে তার ঝুলি ভরে যেত। এই ভাবে দিন যায়। জীরের ভুঁয়ে মেয়েটি কুড়িয়ে পেয়েছিল বলে ফকির তার নাম দিয়েছিল "জীরেবতী"। দেখতে দেখতে জীরেবতী ষোল বছরের হলো। তার রূপে জগত আলো। মাথায় এক রাশি চুল। চুল পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত লম্বা। চুল ভিজিয়ে গা ধুলে শীতল পাটি বিছিয়ে আঙিনায় বসে রোদে চুল শুখাতে হয়। এমনি ভাবে দিন যায়।

একদিন দেশের রাজা দেশ দেখার জন্য বেরিয়েছে। পাল্কীতে চেপে রাজা চলেছে। আটজন বেহারা আর লোকজন চলেছে। জীরেবতী যে গাঁয়ে থাকে সেই গাঁয়ের পাশ দিয়ে পথ। পথের ধারে গাঁয়ের শেষে ফকিরের বাড়ী। পথের ধারে পাল্কী থামিয়ে রাজা তার লোকজনদের সেইখানে রান্না করতে বলল। একজন বেহারা আগুন আনতে গেল। পথের পাশে ফকিরের বাড়ী। উঠানে শীতলপাটি বিছিয়ে তার উপর বসে চুল ছড়িয়ে দিয়ে জীরেবতী চুল শুকাচ্ছে। সে বসে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে। কাছেই ফকিরের বাড়ী। রাজার বেহারা ফকিরের বাড়ী ঢুকেছে আগুনের জন্য। আর জীরেবতীর রূপ দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার দেরী দেখে আর একজন গিয়েছে, সেও অজ্ঞান। এমনি করে রাজার সব লোক অজ্ঞান হয়ে ফকিরের বাড়ীতে পড়ে আছে।

সব শেষে রাজা তার লোকেদের সন্ধান নিতে ফকিরের বাড়ী এলো। জীরেবতীর রূপ দেখে সেও অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পর ফকির বাড়ী এলো। দেখল তার বাড়ীতে বহু লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জীরেবতীকে শুধাল, কি ব্যাপার? জীরেবতী বলল, ওরা এলো আর অজ্ঞান হয়ে গেল! ফকির পানি ছিটিয়ে সকলের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। লোকেরা আগুন নিয়ে রান্না করতে বসল। রাজা ফকিরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

রাজা ফকীরকে বলল, আমি এই দেশের রাজা। এই মেয়ে তোমার কে?

ফকির: রাজামশাই এ আমার মেয়ে।

রাজা: আমি তোমার এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কী বল?

ফকির: মহারাজ! আমি কিছুই চাই না, আমার মত ফকিরের মেয়েকে বিয়ে করবেন, এটা আমার সৌভাগ্য। তবে মহারাজ আমাকে একটা তিনতলা পাকা বাড়ী করে দিন।

রাজা বললে, তাই হবে। পরদিন ফকিরের ভিটেতে দালান বাড়ীর ভিত খুঁড়ে দালান করা শুরু হলো। কিছুদিন পর তিনতলা দালান তৈরী হলো। ধূমধাম করে রাজার সঙ্গে জীরেবতীর বিয়ে হলো। রাজা জীরেবতীকে নিয়ে যাচ্ছে। ফকির প্রথমে একতলার বারান্দায় উঠে চলন্ত জীরেবতীকে দেখতে লাগল। তারপর দোতলায় উঠল। তারপর তিনতলায়। তারপর আর জীরেবতীকে দেখতে পায় না। সে লাফ দিয়ে তার প্রিয় পালিতা কন্যাকে দেখতে লাগল। এই ভাবে লাফ দিতে গিয়ে তিনতলার ছাদ হতে পড়ে ফকির মরে গেল। গাঁয়ের লোক ফকিরকে সেই বাড়ীর উঠানেই কবর দিল।

জীরেবতীকে বিয়ে করার পর রাজা তার জন্য আলাদা একটা মহল বানিয়ে দিল। রাজা জীরেবতীকে চোখের আড়াল করে না। এই রাজার আরও ছয়টা রাণী ছিল। এই ছয় রাণী এক সঙ্গে

পুরোনো মহলে থাকে।' এই রাজার ছিল এক ছোট বোন। সে রাজার বড় আদরের বোন। তার কোলে ছিল এক শিশু। এই ভাগনেটিকে রাজা খুব ভালবাসে। এক দিন ঠিক হলো বোনের ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হবে। রাজবাড়ীতে চলছে খব ধুমধাম। ছোটরাণী জিরেবতী এই উৎসবে পুরোণো মহলে এসেছে। এখানে থাকে তার ছয় সতীন। জীরেবতীর রূপ দেখে ও তার প্রতি রাজার ভালবাসা দেখে সতীনদের খুব হিংসা হলো। ছয় সতীনে ঠিক করল আজ জীরেবতীকে তারা জব্দ করবে। রাজার আদরের বোনের একমাত্র শিশুপুত্র তখন নির্জন ঘরে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। ছয় জন চুপি চুপি গিয়ে ছেলেটির একটি আঙ্গুল কেটে নিল। তারপর সেই আঙ্গুলটি নিয়ে জীরেবতীর কাছে গেল। জীরেবতী তখন একটা ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। ছয় সতীনে যুক্তি করে জীরেবতীর চুলের বানে সেই কাটা আঙ্গুলটা লুকিয়ে রাখল। এদিকে আঙ্গুল কাটার জন্য ছেলেটা মরে পড়ে আছে। যে ছুরিতে আঙ্গুলটি কাটা হয়েছিল, সেই ছুরিতে ইতিপূর্বে বিষ লেগেছিল। যার জন্যে ছেলে মরে গেল। লোকজন, মন্ত্রী ইত্যাদি এসে হাজির, রাজাও এসেছে। রাজার বোন ছেলে আনতে গিয়ে দেখে ছেলে মরে গেছে। বিছানা লোয়ে লাখান হয়ে আছে। রাজার বোন ছেলের জন্য কাঁদতে লাগল। সুখের উৎসব শোকে পরিণত হলো। কে আঙ্গুল কেটেছে বার করতে হবে। ছয় সতীনে বললে, কাপড়-চোপড়, মাথার চুল ঝাড়াকোড়া নেওয়া হোক। তাই নেওয়া হলো। প্রথমে ঝিদের, তারপর অন্যান্য মেয়েদের, তারপর সব রাণীর। সব শেষে ছোটরাণী জীরেবতীকে ঝাড়া করতে গিয়ে তার চুলের মধ্যে ছেলের কাটা আঙ্গুল পাওয়া গেল। জীরেবতীকে সকলে যা-তা বলতে লাগল। কিন্তু রাজার পিয়ারের রাণী। ভাল করে কেউ কিছু বলতে পারল না। রাজার বোন সাতদিন কিছু খেল না। বললে আমার ছেলে যে মেরেছে তার রক্ত না দেখে আমি পানি খাবো না। রাজা ভাবল, জীরেবতী অকারণে আমার ভাগনেকে

মেরে দিল। রাজা চাপে পড়ে আর বোনের কান্না দেখে জীরেবতীকে মৃত্যুদণ্ড দিল। জল্লাদ জীরেবতীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। সেখানে এককোপে জীরেবতীর মাথা কেটে ফেলল। এক বাটী রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজার বোনকে দিল। রাজার বোন রক্ত দেখে খাবার খেল। জীরেবতীকে মারতে পেরে ছয় সতীন খুব খুশী। কিন্তু রাজা তাদের মহলে আসে না। এদিকে যেদিন জীরেবতীকে কাটা হলো, তার পর দিন দেখা গেল বধ্যভূমি আর নাই। সেখানে হয়েছে এক বিরাট দীঘি। তার জল টলটল করছে। চারিপাড়ে সোনালী ঘাস ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। দীঘির পাড়ে ঈশান কোণে একটা বড় কদম গাছ। গাছে ফুটেছে কদমের ফুল। গাছ যেন হাসছে। গাছের ডালে পাশাপাশি বসে আছে একটা সুন্দর তোতা পাখী ও একটা সুন্দর ময়না পাখী। তোতা ময়নাকে কথা বলছে, আর ময়না হ্যাঁ দিচ্ছে।

তোতা : আমার মা, বাবা কুমোর কুমোরিনী ছিল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : তাদের ছয়টা মেয়ে হয়েছিল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : আবার মায়ের গর্ভ হলো লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : বাপ বল্লে, মেয়ে যদি হয় তাহলে তুকে খুন করবো লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : আবার আমার মায়ের মেয়ে হলো লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : হাঁড়িতে রেখে জীরের ভুঁয়ে তাকে রেখে এলো লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : ফকির তাকে কুড়িয়ে পেল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : ফকির তার নাম রাখলে জীরেবতী লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : আমি যুবতী হলাম লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : রাজা আমাকে দেখে অজ্ঞান হলো লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : রাজার সাথে আমার বিয়ে হলো লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : ফকির মরে গেল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : আমার ছয় সতীন ছিল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : তারা আমার উপর খুব হিংসা করত লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : রাজার একটা বোন ছিল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : তার কোলে একটা ছেলেছিল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : সেই ছেলের মুখে ভাত লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : আমার ছয় সতীন ও আমি একঠাঁয় হলাম লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা : আমাকে জব্দ করার জন্যে বিষ মাখান ছুরি দিয়ে ছেলেটার আঙ্গুল ছয় সতীনে কাটল লায় ময়না ?

ময়না : হ্যাঁ।

তোতা ঃ ছয় সতীনে কাটা আঙ্গুল আমার চুলে লুকিয়ে রাখল লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ ঝাড়াকুড়া দিতে গিয়ে আমার চুল হতে আঙ্গুল পাওয়া গেল লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ রাজা চাপে পড়ে আমাকে প্রাণদণ্ড দিল লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ আমার রক্তে দীঘি হলো লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ দেহ আমার কদম গাছ হলো লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ হাতগুলো ডালাপলা হলো লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ দাঁতগুলো আমার ফুল হলো লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ আমার ডান চোখ হলো তোতা লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ আমার বাম চোখ হলো ময়না লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

তোতা ঃ রাজা যদি গাছ তলায় আসে, আবার আমি জীরেবতী হবো লায় ময়না ?

ময়না ঃ হ্যাঁ।

দীঘির পাশ দিয়ে পথ। সেই পথ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে আর ঐ তোতা ময়নার কথা শোনে। কথাটা একদিন রাজার কানে গেল। রাজা শুনল সেই বধ্য ভূমি নাই। সেথা হয়েছে এক দীঘি। টল্ টল্ করছে তার জল। পাড়ে পাড়ে সোনালী ঘাস। সতেজ কদম গাছ। গাছে ফুটে আছে ফুল, গাছ যেন

হাসছে। কদম গাছ, তোতা আর ময়না রাজা আর রাণীদের কথা বলছে। এই কথা শুনে রাজা দীঘি দেখতে এলো। কদমের ডালে তোতা-ময়নার কথা শুনে রাজা সব জানতে পারল। রাজা কদম গাছের নিচে জীরেবতীর জন্য কাঁদতে লাগল। রাজার কান্না শুনে তোতা আর ময়মা উড়ে এসে রাজার হাতে বসল। সঙ্গে সঙ্গে দীঘি গাছ তোতা ময়না সব মিলিয়ে গেল। রাজা দেখল তার সামনে জীরেবতী দাঁড়িয়ে আছে। জীরেবতীকে দেখে আনন্দে রাজার চোখে জল এলো। সসম্মানে তাকে নিয়ে গেল তার মহলে। বোন সব শুনে দুঃখ করতে লাগল, আর ছয় রাণীকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বধ্য ভুমিতে পাঠাল। জহ্লাদ বধ্য ভূমিতে ছয় রাণীকে কাটল। তাদের রক্তে একটা পচা পুকুর হলো। পচা পুকুরের চারিপাশে রাণী দেহগুলি হলো ছয় শুঁয়ে বাবলার গাছ। আর তাদের দুই চোখ হলো দুই দাঁড় কাক। কাঁটা গাছে তারা নিজেদের পাপের কথা বলতে লাগল।

—০—

[জীরেবতী গল্পটি বলতেন পুন্যাশী (থানা ভরতপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ) নিবাসিনী রসিদা খাতুন। তাঁর নিকট শুনেছিল চরখী (থানা কেতুগ্রাম, জেলা বর্ধমান) নিবাসিনী কুমারী মহবুবা খাতুন তাঁর নিকট হতে গল্পটি সংগৃহীত।]

। জলদানী রাজ কন্যা ।

কাঞ্চনগড় নামে ছিল এক রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা খুব সুখী। রাজার সাত রাণী। তার মধ্যে পাটরাণীর গর্ভে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিল। একটি পুত্র রাজা ও সাত রাণীর চোখের মণি। রাজ্যের প্রজাকুল ও রাজ সভাসদ, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র সকলের প্রিয় এই রাজকুমার। সকলের আদর যত্নে রাজপুত্র কিশোর হতে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করল। রাজপুত্র কি পড়াশুনায়, কি অস্ত্র বিদ্যায়, কি শিকার সবকিছুতে পটু। একদিন ভ্রমণ শেষে রোজকার মতন রাজকুমার বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সেদিন রাতে রাজকুমার এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখল। রাজপুত্র যেন এক অজানা গভীর বনে শিকারে গিয়েছে। তার সামনে এক বন্য বরাহ। রাজকুমারের শিকারীরূপ দেখে প্রাণের ভয়ে বন্য বরাহ ছুটে চলেছে। রাজকুমারও তার পিছু পিছু ঘোড়া ছোটাচ্ছে। এই ভাবে সে তার লোকজন ফেলে ছুটে চলেছে। ক্রমে চোখের সম্মুখ হতে বন্য বরাহ বনে কোথায় হারিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাত্রি আসন্ন। রাত কাটানোর জন্য এক বট গাছের নীচে ঘোড়াবেঁধে গাছে উঠে বসে থাকল। সকাল হলে সে ঘোড়া নিয়ে নিজের সঙ্গীদের খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সে পেল এক বন্য পথ। বন্য পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে অনেক দূরে পাহাড় ঘেরা এক পুরী দেখতে পেল। পাহাড় দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত পুরী। এদিকে রাজকুমার ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসিত হয়ে পড়েছে। তাই সে পুরীর দ্বারদেশে গিয়ে হাজির। দেখলো পুরীর দ্বারে অস্ত্রহাতে দুই জন দ্বারী বসে আছে। সে গিয়ে তাদের নিকট পিপাসার জল চাইল। দ্বারী ভিতরে গিয়ে খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে এক

সুন্দরী রূপবতী কন্যা দ্বারে এসে হাজির। তার হাতে জলপাত্র ও খাবার। তার নিকট হতে জল ও মিষ্টান্ন খেয়ে রাজপুত্র সুস্থ হলো। দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌ল, যে এই রাজ্যের নাম পাহাড়পুর। জলদানী এই কন্যা, পাহাড়পুরের রাজকুমারী, এখনও অবিবাহিতা। এই পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখে রাজকুমারের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মা বাবাকে সে জানাল যে পাহাড়পুরের এই জলদানী রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে। রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করল।

মন্ত্রী বল্‌ল : স্বপ্ন, স্বপ্ন। স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? আমরা অন্য কোন রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যার সন্ধান করে রাজপুত্রের বিবাহ দিব।

রাজা বললেন : এই কথা ঠিক।

কারণ অনেক খোঁজ খবর করে পাহাড়পুরের রাজ্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। সব শুনে রাজপুত্র, এ বিবাহে রাজী হলো না। সে পাহাড়পুরের জলদানী রাজকন্যা ছাড়া অন্য কোন রাজার কন্যাকে বিবাহ করবে না।

এই ভাবে দিন যায়। রাজপুত্র থাকে মনের দুঃখে। তার চিন্তা সেই জলদানা রাজকন্যা। একদিন রাজপুত্র বন্ধু, বান্ধব, লোক লস্কর নিয়ে বনে শিকার করতে গেল। রাজপুরী ছেড়ে এক গভীর বনভূমির প্রান্তে তারা হাজির হলো। সেখানে গাড়া হলো আস্তানা। সকালে লোক-লস্কর নিয়ে রাজপুত্র বনে প্রবেশ করল। বন খুঁজে খুঁজে কিছু হরিণ মারা হলো। দুপুরের সময় রাজপুত্র এক বন্য বরাহ দেখতে পেল। ঐ বরাহটি ধরার জন্য লস্করেরা ঘিরে ফেলল। কিন্তু লাফ মেরে বরাহ পালিয়ে গেল। বরাহ ধরার জন্য রাজপুত্র বন্য বরাহের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। কিন্তু ধরি ধরি করে বরাহ ধরতে পারল না। তারপর এক সময়ে বরাহ বনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজপুত্র লোক লস্কর ফেলে অনেক দূরে চলে গেছে। সূর্য্য ডুবু ডুবু। বনে নানা বন্য জন্তুর আবাস।

তখন আর আস্তানায় ফেরা সম্ভব নয়। রাত কাটানোর জন্য ফাঁকা একটি স্থানে সে এক বট গাছ দেখতে পেল। গাছের নীচে ঘোড়া বেঁধে বটগাছে উঠে একটি ডাল ডালে বসে রাত কাটিয়ে দিল। সকাল হলে সে সঙ্গীদের খোঁজে ঘোড়ার পিঠে চেপে খুঁজতে লাগল। কিন্তু বন আর শেষ হয় না। এদিকে বেলা বাড়তে লাগল। অবশেষে দুপুরের সময় রাজপুত্র একটা বনপথের সন্ধান পেল। সেই বনপথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। কিছু দূর গিয়ে সে দেখল পাহাড়-ঘেরা রক্ষিত এক পুরী। এদিকে রাজপুত্র শ্রান্ত, পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত। ঘোড়া ছুটিয়ে সে পাহাড়-পুরীর দ্বারে গিয়ে হাজির হলো। দেখল, দ্বারে দু'জন অস্ত্রধারী দ্বারী। তাদের নিকট সে পিপাসার জল চাইল। এক দ্বারী গিয়ে ভিতরে খবর দিল। একজন পরমা সুন্দরী কন্যা এসে জল ও খাবার দিয়ে রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা করল। রাজপুত্র যেমন যেমন স্বপ্নে দেখেছিল, ঠিক তেমনই ঘটে গেল। এমন কি স্বপ্নে দেখা রাজ কন্যার মুখের সঙ্গে এই কন্যার মুখের সম্পূর্ণ মিল দেখতে পেল। খোঁজ নিয়ে জানল যে এই রাজ কন্যার বিবাহ হয়নি। আবার এই রাজ্যের নামও পাহাড়পুর।

এই রাজকন্যার বিবাহ সম্পর্কে একটা পণ আছে। রাজ বাড়ীর নিকটে একটা কুয়ো আছে। এই কুয়ো যে সোনার গহনা দিয়ে ভরাট করতে পারবে, তাকেই রাজকন্যা বিবাহ করবে। অনেক রাজপুত্র এসেছে কেহই সোনাদানা দিয়ে কুয়ো ভরাট করতে পারে নি। সেদিন রাজপুত্র কুয়োটি ভাল করে দেখল। রাত্রে সে কুয়োর পাশে একটা বট গাছের ডালে ঘোড়া বেঁধে নীচে বসে থাকলো। দুই জন পরী উড়তে উড়তে এসে সেই গাছে বসে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এই কুয়োটা মোটেই গভীর নয়। এর মধ্যে অনেক গুলো ভূত আছে। তাদের জন্য সোনা-দানা দেখা যায় না! এই কুয়োর গায়ে আয়না বসিয়ে দিয়ে কুয়োতে অল্প কিছু সোনা ফেলিয়ে দিলেই কুয়ো ভর্ত্তি হয়ে যাবে।

কারণ পূর্ব হ'তে কুয়ো ভর্তি হয়ে আছে। রাজপুত্র সব শুনে কয়েটা আয়না কিনে এনে কুয়োটার গায়ে লাগিয়ে দিল। তারপর নগর হতে কিছু সোনা কিনে এনে কুয়োয় ফেলে দিল। কুয়ো সোনায় ভর্তি হয়ে গেল। তখন কন্যা তাকে বিবাহ করল।

বিবাহের পর কন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র নিজের রাজ্যে ফিরে চলল। কিছুদূর আসার পর সাতজন ডাকাত তাদের ঘিরে ফেলল। রাজকন্যা তার স্বামীকে বলল, এরা বড় ডাকাত, এদের সঙ্গে পারবে না। কৌশলে এদের জয় করতে হবে। রাজকন্যা ডাকাতদের বলল, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে পেতে চাও, সে চোখ বন্ধ করে আমার দিকে ছুটে এসো। সাত ডাকাত চোখ বন্ধ করে ছুটতেই, নিমিষে রাজকন্যা রাজপুত্রের ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলে গেল। সাত ডাকাতের হাত হ'তে রক্ষা পেয়ে তারা অন্য এক রাজ্যে এলো। রাজপুত্র, রাজকন্যা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। রাজকন্যা তার হাতের একটা দামী আংটি খুলে স্বামীর হাতে দিয়ে সেটি বাজারে বিক্রয় করে কিছু খাবার আনতে বলল। রাজপুত্র আংটি নিয়ে একজন স্যাকরার দোকানে গেল। আংটি দেখে স্যাকরা বুঝল খুব দামী আংটি।

স্যাকরা বলল : কেন এই আংটি বিক্রয় করবে ?

রাজপুত্র তখন নিজের স্ত্রী নিয়ে গৃহ গমন ও পথে ডাকাতদের আক্রমণ এবং বর্তমানে ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা বলল। স্যাকরা ছিল লোভী ও চতুর। কোথায় রাজকন্যা আছে জেনে নিয়ে, সে রাজপুত্রকে একটু অপেক্ষা করতে বলল। তারপর অন্য পথে একদল লোক দিয়ে রাজকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এলো। রাজপুত্রকে তারপর আংটির দাম দিল। খাবার নিয়ে এসে দেখে রাজকন্যা নাই। সে তখন ঘোড়াটা একস্থানে বেঁধে সেখানেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। একদিন রাজকন্যা দেখল যে নিচের রাস্তা দিয়ে বিষন্ন মনে রাজপুত্র যাচ্ছে। তখন বন্দী রাজকন্যা জানালা পথে তাকে ডাক্‌ল, আর বলল, আগামী কাল রাতে স্যাকরার বাড়ীতে যাত্রা

গান হবে। তুমি ঘোড়া নিয়ে একটু রাতে ঠিক জানালার নীচে থাকবে, আমি জানালা হতে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে পড়ব। সন্ধ্যার সময় রাজপুত্র ঘোড়াটি স্যাকরার বাড়ীর জানালার নীচে রাখল। আর ভাবল এখন একটু দেরী আছে, এই অবসরে একটু যাত্রা গান শোনা যাক্। তাই ঘোড়া রেখে যাত্রা গান শুনতে গেল। ক্রমে সে গানে মসগুল হয়ে পড়ল।

এদিকে একজন পাহারাওয়ালা পাহারা দিতে এসে পথের পাশে একটা ঘোড়া দেখে তার লাগাম ধরে পিঠে যেই চেপেছে, অমনি রাজকন্যা ঝাঁপ দিয়ে পাহারাওয়ালাকে স্বামী মনে করে, ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে বলল। পাহারাওয়ালা এক বনে এসে হাজির হলো। এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা দেখে তার মাথা ঘুরে গেল। সে এই কন্যাকে বিবাহ করবে বলে ঠিক করল। বনের মধ্যে রাজকন্যা এসে বুঝল তার ভুল হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে সে এক গাছের নীচে ঘোড়া বাঁধতে বলল পাহারাওয়ালাকে। পাহারাওয়ালা সেখানে ঘোড়া বাঁধল। তারপর গাছতলায় রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করতে লাগল। গাছতলে দু'জনে শুয়ে পড়ল। মনের আনন্দে পাহারাওয়ালা কন্যার পাশে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজকন্যা মনের দুঃখে জেগে রইল। সেই গাছে ডাহুক, ডাহুকী দুই পাখী ছিল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, আমাদের বিষ্ঠার টিপ যদি কেহ কপালে পরে, তাহলে নারী পুরুষ হয়ে যাবে, আর পুরুষ নারী হবে। আবার টিপ খুলে দিলে যা ছিল তাই হবে। পাখী দুটি যেখানে বসে ছিল, তার নীচে ছিল তাদের বিষ্ঠা। রাজকন্যা সেই বিষ্ঠার টিপ কপালে দিয়ে পুরুষ হয়ে গেল। পাহারাওয়ালা উঠে দেখে সুন্দরী নাই, কোথায়গেল! সামনে সে পুরুষ বেশী রাজপুত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, সে একটা সুন্দরী মেয়ে দেখেছে কি না? যুবকবেশী রাজপুত্রী বলল যে, সে কোন মেয়ে দেখে নাই। পাহারাওয়ালা হায় হায় করতে করতে বনে বনে সুন্দরীকে খুঁজতে লাগল।

যুবক বেশী রাজপুত্রী, সেই দেশের দরবারে গিয়ে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে একটা চাকরী নিল। সেদেশ শাসন করতো, সে দেশের রাণী। পিতার মৃত্যুর পর সে রাণী হয়েছে। যুবকের গুণে মুগ্ধ হয়ে রাণী তাকে বিবাহ করল। এই ভাবে কয়েক মাসের মধ্যে সে, সেই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে গেল। তারপর সাত চোর, স্যাকরা, পাহারাওয়ালা ও বিদেশী রাজপুত্রকে ধরে আনল বিচারের জন্য। সাত চোরের, স্যাকরা ও পাহারাওয়ালাকে ফাঁসি দিল। তারপর রাজকুমারকে নিয়ে অন্দরের ভিতরে গেল। তারপর নিজের কপালের টিপ খুলে ফেল্‌ল। রাজকুমার নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারল। তারপর স্বামীর সঙ্গে এই রাণীর বিবাহ দিল। এই ভাবে তিনটি রাজ্য এক হয়ে গেল।

—০—

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার, কাগ্রাম নিবাসী শ্রীঅসীমকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। তিনি তাঁর মা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনেছিলেন।]

॥ রত্নমালা ॥

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার পুরী করে গমগম রমরম। রাজার এক পুত্র। সুন্দর, রূপবান, গুণবান। রাজার মন্ত্রীর এক পুত্র আছে। সেও উপযুক্ত। রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের খুব ভাব। রাজা দু'জনের বন্ধুত্ব দেখে মনে করলেন, হয়তঃ দুজনে একসঙ্গে কোন রাজ্যে চলে যাবে। তাই রাজা রাজপুত্রকে এক বাগান বাড়ীতে কার্য্যতঃ বন্দী করে রাখল। মন্ত্রীপুত্র কি আর করে, মনের দুঃখে একদিন নদীর ধারে গিয়ে বসে আছে। এমন সময় দুটো ভূত এসে হাজির। তাদের একজনের হাতে একটা কুশের জুতো, অন্যজনের হাতে একটা কুশের খড়ম। কুশের জুতোর কাজ হলো বিশ্বের যেখানে যা আছে কুশের জুতো মারফৎ তা জানা যায়, আর খড়মের কাজ হলো, তা পায়ে দিয়ে যেখানে খুশী যাওয়া যায়। দু'জনেই জুতো এবং খড়ম চায়। তারা মন্ত্রীপুত্রের নিকট বিচার চাইতে এসেছে, কে জুতো পাবে।

সব শুনে মন্ত্রীপুত্র তাদের নিকট হতে খড়ম ও জুতোটি নিল এবং বিচারে ঠিক হলো ভূত দু'জনকে নদীতে ডুব দিতে হবে যে শেষে উঠবে সে জুতো ও খড়ম পাবে, যে আগে উঠবে সে কিছুই পাবে না। কথামত ভূত দুইজন জলে ডুব দিল। মন্ত্রীপুত্র তখন খড়মের সাহায্যে রাজপুত্রের নিকট হাজির হলো। রাজপুত্র জুতো ও খড়মের গুণাগুণ শুনে মন্ত্রীপুত্রের নিকট সেদুটি চেয়ে নিল। কারণ সে প্রায় বন্দী হয়ে আছে। দরকার হলে খড়মের সাহায্যে কোথাও যেতে পারবে বা জুতোর সাহায্যে কোথায় কি আছে জানতে পারবে। মন্ত্রীপুত্র জুতো ও খড়ম বন্ধুকে দিয়ে চলে গেল নিজের বাড়ী।

এদিকে এই খড়ম ও জুতো ছিল রত্নাগড়ের রাজকন্যা রত্নমালার। ভূতছুটো রত্নাগড় হতে রত্নমালার একপাটি জুতো ও খড়ম চুরি করে এনেছিল। জুতোর সাহায্যে রাজকন্যা রত্নমালা তার চুরি-যাওয়া একপাটি জুতো ও খড়ম কোথায় আছে জানতে পারল এবং অন্য পাটি খড়মের সাহায্যে রাজপুত্রের বাগান বাড়ীতে এসে হাজির হলো। রাত্রে এই ঘটনা ঘটল। রাজপুত্রের সঙ্গে রত্নমালার পরিচয় ও ভালবাসা হয়ে গেল। রত্নমালা রাজপুত্রকে নিজের পরিচয় দিল। তাকে যেন রত্নাগড়ে গিয়ে বিবাহ করে, একথা অনুরোধ করল। তারপর তার হারানো জুতো ও খড়ম নিয়ে খড়মের সাহায্যে রত্নাগড়ে চলে গেল।

পরদিনে রাজপুত্র তার পিতাকে জানাল যে রত্নাগড়ের গুণবতী রূপবতী রাজকন্যা রত্নমালাকে বিবাহ করবে। রাজা তখন রত্নমালার দেশ রত্নাগড়ে রাজপুত্রের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে একজন দূত পাঠান। রত্নাগড়ের রাজা সব শুনে দূতকে অনেক সমাদর করল। তারপর রাজপুত্রের সঙ্গে রত্নমালার বিবাহের জন্য একটা শুভ দিন স্থির করল। তারপর সেই শুভদিনে রাজপুত্রের সঙ্গে রত্নমালার বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের পর লোক লস্কর নিয়ে রাজপুত্র রত্নমালাকে নিয়ে দেশে ফিরে চলেছে। রাজপুত্রের দেশ আর বেশী দূরে নয়। দুপুরবেলা প্রচণ্ড রোদ। পথিমধ্যে লোক লস্কর থেমে বিশ্রাম করতে লাগল। রাজকন্যা রত্নমালা ক্লান্তির সাথে পথশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর রাজপুত্র তার পাশে বসে আছে। রত্নমালার গলায় ছিল একটা রত্নখচিত গজমোতির হার। হারটা সুন্দর, না রত্নমালা সুন্দর তা দেখার জন্য হারটি খুলে রোদে ধরে দেখতে লাগল। সেই সময় একটা চিল কোথা হতে উড়ে এসে ছোঁ মেরে হারটা নিয়ে চলে গেল। হতবুদ্ধি রাজপুত্র হারের জন্য চিলের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। এইভাবে চিলের পিছু ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যার সময় অন্য এক রাজ্যে এসে পৌঁছিল। চিলও কোথায় হারিয়ে গেল, তার আর সন্ধান

পেল না। কোথায় রত্নমালা নববিবাহিত স্ত্রী ? কোথায় লোকলস্কর ? রাতের আশ্রয়ের জন্য রাজপুত্র নগরে প্রবেশ করল।

রত্নমালা জেগে উঠে দেখে পাশে স্বামী নাই। গলেতে নাই হার। কি হলো ? সেও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যাইহোক লোক-লস্কর নিয়ে সে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে হাজির হলো। তারপর কুশের জুতোর সাহায্যে সে সবকিছু জানতে পারল। তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী কেঁদে অস্থির। মন্ত্রীপুত্র সকলকে স্থির হতে বলল। তারপব রাজকন্যা যুবক বাজপুত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে খড়মের সাহায্যে স্বামী যে রাজ্যে আছে সেই রাজ্যে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে রাজাব নিকট একটা চাকরী নিল। তার কাজ হলো নদীর রাজঘাটে বিদেশী নৌকা পরিদর্শন করা। এই কাজে সে খুব সাফল্য লাভ করল। ছদ্মবেশী রত্নমালাব চেহাবা ইত্যাদি দেখে সে দেশেব রাজকন্যা তাকে ভালবেসে ফেলল। অবশেষে রাজকন্যাব সঙ্গে ছদ্মবেশী রত্নমালার বিবাহ হয়ে গেল। রত্নমালা রাজকন্যাকে বলল যে তাব একটা বিশেষ ব্রত আছে, তাই বিবাহেব পব স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করতে পারবে না। একমাস পব ব্রত শেষ হলে পারবে।

এদিকে রত্নমালার স্বামী ছদ্মবেশে সেই রাজ্যের মালিনীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। মালিনী রোজ বাজবাড়ীতে রাজকন্যাকে ফুলের মালা দিয়ে আসে। বাজপুত্র একদিন ভালভাবে একটি মালা গেঁথে দিল। মালিনী সেই মালা নিয়ে বাজকন্যাকে দিয়ে এলো। ছদ্মবেশী রত্নমালা মালাটি দেখল আর বুঝতে পারল, এ মালা তার স্বামীর গাঁথা। সেদিন মালিনীকে ছদ্মবেশী রত্নমালা জিজ্ঞাসা করল যে, এ মালা কে গেঁথেছে ? মালিনী বলল যে, তার এক প্রবাসী বোনপো এসেছে, সে গেঁথেছে এই মালা। রত্নমালা তাকে বলল যে আগামী কাল যেন তার বোনপোকে এখানে নিয়ে আসে। সেদিন মালিনীকে অনেক টাকা দিল ছদ্মবেশী রত্নমালা।

পরদিন ছদ্মবেশী রত্নমালা আবার বিদেশী নৌকা পরিদর্শনেব জন্য রাজঘাটে গেল। দেখল একটা বড় নৌকা আসছে। নৌকায়

ছইয়ের উপর সে একটা চক্‌চকে দ্রব্য দেখতে পেল। তখন ছইয়ের উপর কোন লোক ছিল না। সেখানেও কেহ ছিল না। রত্নমালা সহসা সেই নৌকার ছইয়ের উপর উঠে গেল। দেখল সেখানে বসে আছে এক চিল। চিলের পায়ে একটা মৃত পাখী, আর মৃত পাখীর হাত খানেক দূরে পড়ে আছে তার গজমোতি হার। হারটি সে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল। চিলটা ভয়ে মৃত পাখীটা নিয়ে উড়ে গেল।

পরদিন মালিনী তার বোনপোকে বাড়ী নিয়ে এলো। বত্নমালা তার স্বামীকে পেয়ে খুব খুশী। তখন সে ছদ্মবেশ ত্যাগ করল। রাজকন্যা সবদেখে অবাক হয়ে গেল। রত্নমালা তখন বাজ কন্যাকে সব বলল, মালিনীর বোনপোবেশী রাজপুত্র ও সব বলল। তখন রত্নমালা রাজকন্যাব সঙ্গে নিজ স্বামীর বিবাহ দিল। আর তার গলায় পরিয়ে দিল গজমতির মালা। রাজপুত্র দুই পত্নী নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

—০—

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম নিবাসী শ্রীঅসীম কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হতে সংগৃহীত।]

। চাষী, তার স্ত্রী ও পুত্র ।

এক গাঁয়ে ছিল এক চাষী। তার ছিল স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র। কৃষক ছিল খুব বড়াণ্ডে। একদিন কৃষক দূর মাঠের জমিতে চাষ দিতে গিয়েছে। খুব গান গাইছে, আর ধূলোর লাঙ্গল বয়ছে। মাটিতে ভাল বাত আছে, চাষ দিতে গরু বা মুনিষের কোন কষ্ট হচ্ছে না। মাঠটা অনেক দূর। কাছাকাছি গাঁ নাই। তিন পাশে দু'তিন কোশ দূরে গাঁ। বেলা একটু বাড়লে চাষীর শিশু ছেলেটা বাপের জন্যে মাঠে খাবার নিয়ে গেল। চাষী ছেলেকে নিয়ে জল খাবার খেল। তারপর আমেজ করে নারকেলের হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে বলল, "বেটা দেখচিস্‌, সাত সমুদ্র তের নদী পারে একপাল মোষ চরছে।" ছেলেটা ছিল বড়াণ্ডে বাপের চেয়ে এক ঘড়া জবর। সে বলল, "হেঁ বাপ, দেখতে পাচ্ছি, একটা মোষের ডান চোখে ওয়ানি পোক ঘুর ঘুব করছে।" এত বড় মিথ্যে কথা শুনে বাপ ছেলেটার গালে মেরে দিল এক চড়। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে খাবারের থালা বাটি নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল ও তার মাকে সব কথা বলল।

তার মা সব কথা শুনে রান্না করা ভাত তরকারীর কিছু নিজে খেল ও পুত্রকে খাওয়াল। তারপর ভাত, তরকারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখল। দুপুর বেলায় লাঙ্গল, গরু নিয়ে চাষী বাড়ী এলো। লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে মাঠের পুকুরে সে গরু দুটোর গা ধুইয়ে দিয়ে, নিজেও চাঁন করে নিল। তাই সে বৌকে বলল, "বৌ, ভাত দে।" তারপর ঘরে গিয়ে দেখল ভাত তরকারীর হাঁড়ি ভাঙা, আর ভাত তরকারী মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। চাষী খুব রেগে বৌকে শুধাল এসব কি? বৌ তখন তার স্বামীকে বলছে ঃ

সাত সমুদ্দুর তের নদী
পারে চরে মোষ।
আমার ছেলেকে তুই
এমন কথা ক'স্।
সাত সমুদ্দুর পার হতে
মোষে মেরেছে লাথ।
এখানের ভাত তরকারীর হাঁড়ি
হয়েছে কুপোকাত।

বৌ-এর কথা শুনে চাষী বুঝল যে তার বৌ আরও এক ঘড়া সরেস আরও একঘড়া জবর। চাষী ভয়ে আর রা কাড়ল না।

—০—

বড়াও : তিলকে তাল ক'রে নিজের বা নিজের দ্রব্যের কথা বাড়িয়ে বলা।

ধুলোর লাঙ্গল : শুখনো জমিতে লাঙ্গল দেওয়া।

বাত : বৃষ্টির পর মাটি একটু শুখুলে জমি নাঙ্গল দেওয়ার উপযোগী হওয়া কে বাত-হওয়া বলে। বাত হলে মাটি ভিজে থাকে কিন্তু কাদা থাকে না।

একঘড়া : এক ধাপ

ওয়ানি পোক : এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকা, যা গরু মহিষের চোখের কাছে উড়ে বেড়ায়।

[লোককথাটি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার কৃষ্ণবাটী গ্রামের এক চাষীর নিকট হতে সংগৃহীত।]

॥ চতুরঙ্গ ফুল ॥

এক দেশে ছিল এক রাজা। এই রাজার ছিল এক রূপসী কন্যা। কন্যা দিন রাত নানারকম ফুল নিয়ে খেলা করে। এই রাজার বাড়ীতে ছিল এক রাখাল। সুন্দর তার চেহারা। সে মাঠে মাঠে রাজার গরু চরায়। রাখালের আছে এক বিধবা বুড়ী মা, আর মাটির একটা ঘর। রাজার নগরের কিছু দূরে মাঠের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এক মাঝারী নদী। এই নদীর ধারে বট গাছের তলায় রাখাল তাল পাতার বাঁশি বাজায়, আর গরু চরায়। একদিন রাখাল দেখল নদীর স্রোতের উপর দিয়ে সাতরঙা সুন্দর একটা ফুল ভেসে যাচ্ছে। রাখাল যেই নদীতে নেমে ফুলটা ধরতে গেল, আর অমনি ফুলটা মাঝ নদী দিয়ে ভেসে চলে গেল! রাখাল প্রত্যেক দিন ঐ সাতরঙা ফুল ভেসে যেতে দেখে, কিন্তু ফুল ধরতে পারে না।

রাখাল রাজার বাড়ী আসে গরু গুলোকে বেঁধে দিয়ে বাড়ীতে নানা কাজ করে, আর দেখে রাজকন্যা বিস্তর ফুল নিয়ে খেলা করছে। একদিন রাখাল রাজকন্যাকে বলল, "রাজকন্যা"! তুমি তো বহু ফুল নিয়ে ফুল খেলা কর কিন্তু আমি এমন একটা ফুল দেখেছি যে ফুল তুমি দেখ নাই, তোমার বাবা, রাজা দেখে নাই। এই কথা শুনে রাজকন্যার খুব দুঃখ হলো। সে গিয়ে গোঁসা ঘরে খিল দিল। এই কথা শুনে রাজা আঁকিবাঁকি করে গোঁসাঘরের দরজায় গিয়ে খিল খুলতে বলল। রাজকন্যা বলল, তোমার বাড়ীর রাখাল আমাকে বললে যে, সে এমন একটাফুল দেখেছে যেফুল আমি দেখি নাই বা আমার বাপ দেখে নাই। এই ফুল আমার চাই। রাজা বলল, এ আবার বেশী কথা কি? রাখাল তো আমার অধীনে কাজ করে, তাকে আজই ফুল আনতে পাঠাবো।

এই কথা শুনে রাজকন্যা গোঁসা ঘরের খিল খুলে বাইরে এলো। রাজা তারপর রাখালকে তলব করল। তারপর বলল, যে ফুল আমার মেয়ে বা আমি দেখি নাই সেইফুল এনে দিতে হবে। রাখাল বলল, মহারাজ! আমাকে কিছু টাকা দিন কারণ বাড়ীতে আমার বিধবা মা আছে তাকে কিছু দিতে হবে, আর আমি কিছু নিয়ে যাব। রাজা রাখালকে দু' হাজার টাকা দিল। এক হাজার টাকা সে মাকে দিল, আর এক হাজার টাকা সে নিয়ে নদীর ধারে ধারে উজানি পথে চলতে লাগল।

রাখাল হেঁটেই চলেছে। প্রতিদিনই দেখে নদী দিয়ে ফুল ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সে ফুল সে ধরতে পারে না। কতদিন পর সেই নদীর ধারে দেখতে পেল এক বন। বনের মধ্যে নদীর ধারে পাঁচটি গাছ গোল করে লাগান। তার মাঝখানে এক মুনি বসে তপ করছে। রাখাল তার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে জোড় হাতে দাঁড়াল। মুনি বলে, বেটা কে রে? আমার তপ ভঙ্গ করলি! তাড়াতাড়ি পিছনে বস নইলে ভস্ম করে দেব। রাখাল তখন তাড়াতাড়ি পিছনে বসে বলছে মামা গো আমি। মুনি তখন বলছে, আরে ভাগ্নে না নারদ, তা না হলে মামার কাছে কে আসবে! তা বাবা, বার বৎসর তপস্যা করছি। অনেক দিন ভাত খাইনি, তা বাবা, চেলেডেলে দুটো রান্না কর, মামা ভাগ্নেয় খাই। তারপর তোর কথা শুনব। এই বলে মুনি রাখালের হাতে একটি চাল আর একটি ডাল দিল। রাখাল চাল আর ডালটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর বলছে — একটা চালে আর একটা ডালে কী হবে! মুনি বলল, বাবা দুটো হাঁড়িতে জল দিয়ে রান্না করেই দেখ না! রাখাল রান্না করে দেখল এক হাঁড়ি ভাত ও এক হাঁড়ি ডাল রান্না হয়েছে। ডাল ভাত দুই মামা ভাগ্নেয় পেট পুরে খেয়ে মুনি শুধাল, বল বেটা কি চাস? রাখাল বলল, মামা সাতরঙা ফুল নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই ফুল কোথা গেলে পাব বলে দাও। মুনি বলল, এই ফুল দেখে আমি বার বৎসর তপস্যা করছি কিন্তু ফুল

পাইনি। তবে আর কিছুপথ এগিয়ে গিয়ে দেখবি তোর আর এক মামা আছে। তার কাছে যা সে তোকে ফুলের খবর বলে দেবে। তবে বাবা, ফুল যদি পাস, আমাকে একবার দেখিয়ে যাস, আমি তোকে একটা বস্তু দেব।

রাখাল নদীর ধার ধরে যায়, আর, যায়। এরপর রাখাল দেখল নদীতে দুটো ফুল ভেসে আসছে। অনেক দিন পর রাখাল দেখল নদীর ধারে আর একটা বন। বনের পাশে নদীর ধারে পঞ্চ বৃক্ষের মাঝে এক মুনি বসে তপ করছে। রাখাল তার সামনে জোড় হাতে দাঁড়াল। মুনি বলে, কে রে বেটা! আমার তপস্যা ভঙ্গ করলি! শিগ্গী পিছনে গিয়ে বস, নইলে ভস্ম করে দেব। রাখাল তাড়াতাড়ি পিছনে গিয়ে বসে বলল মামা গো, আমি তোমার ভাগ্নে। বড় মামা তোমার কাছে আমাকে পাঠালে। মুনি বলল বস বেটা বস ভাগ্নে, না নারদ। ভাগ্নে না হলে কে আসবে! এই বলে মামা, ভাগ্নের হাতে আধখানা চাল, আধখানা ডাল দিয়ে বলল, বাবা! বার বৎসর তপস্যা করছি, ভাত খাই নি; আজ চেলেডেলে দুটো রান্না কর, মামা ভাগ্নেয় দুটো খাই, তারপর কথা শুনবো। ভাগ্নে চাল-ডালের ব্যাপার আগেই জেনে ছিল। তাই এক হাঁড়ি ভাত আর এক হাঁড়ি ডাল রান্না ক'রে দুই মামা ভাগ্নেয় খেল। তারপর রাখাল শুধাল, মামা সাতরঙা ফুল এই যে নদীতে ভেসে যাচ্ছে, এ ফুল কোথা পাব? মুনি বললে, আমি বার বৎসর তপস্যা করছি। কিন্তু এই ফুল ভেসে যেতেই দেখছি। ফুলের গোড়া কোথায় তার সন্ধান পাই নি। তবে বাবা, তুই আরও এগিয়ে যা, দেখবি নদীর ধারে বনের পাশে তোর ছোট মামা তপস্যা করছে। পারে তো, সে সন্ধান দিতে পারবে। তবে বাবা, ফুল যদি পাশ আমাকে দেখিয়ে যাস; আমি তোকে এক বস্তু দিব।

তারপর রাখাল নদীর ধার ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দিন পর সে আবার আর একটা গহীন বন দেখতে

পেল। নদীর ধারে বন। নদীর ধারে বনের পাশে পঞ্চবটি গাছে ঘেরা এক ছায়ায় এক মুনি বসে বসে তপ করছে। রাখাল তার সামনে জোড় হাত করে দাঁড়াল। মুনি বললে, কে রে! বেটা আমার তপ ভঙ্গ করলি, শিগ্গী এসে পিছনে বস, নইলে ভস্ম করে দেব। রাখাল তাড়াতাড়ি পিছন গিয়ে বসতে বসতে বলল, "মামা গো! আমি তোমার ভাগ্নে।" মুনি তখন বললে, তাই বল ভাগ্নে না নারদ। ভাগ্নে না হ'লে কে আর আসবে! তা বাবা ভাগ্নে, অনেক দিন ভাত খাই নি। চেলেডেলে দুটো রান্না কর বাবা। মামা ভাগ্নেয় আগে খাই, তারপর তোর কথা শুনবো। এই বলে মুনি রাখালের হাতে এক কুন চাল ও এক কুন ডাল দিল। রাখালের এ সব আগে হতে জানা ছিল। তাই সে নদীতে জল আনতে গেল। হাঁড়িতে জল ভরতে গিয়ে সে দেখল নদীতে সেই রকম ফুল অনেক ভেসে যাচ্ছে। তারপর ডাল ভাত রান্না হলো। তারা দুই জনে পেট ভরে খেল। তখন মুনি বলল, বল বাবা, কী তোর কথা।

রাখাল বলল, মামা, এই নদী দিয়ে তুতুরাং ফুল ভেসে যায় সে ফুল ধরা যায় না। এই ফুল কোথায় পাব? মুনি বলল, বাবা, এখানে সাত কন্যা বাস করে। তাদের ছোটটির নাম ফুলবতী। এই ফুলবতী নদীতে গিয়ে স্নানের পর চুল ঝাড়ে, তখন চুল থেকে গাদা গাদা ফুল বেরিয়ে এসে নদীতে পড়ে। এ ফুল কাউকে ধরা দেয় না, চলে যায় সাগরে। তা বাবা সেই মেয়েকে যে বিয়ে করবে, সেই পাবে তুতুরাং ফুল। রাখাল বললে, মামা কি ভাবে এই ফুলবতীকে পাব? মুনি বললে প্রতিদিন রাতে ফুলবতীরা সাত বোন বনের মধ্যে এক সরোবরে স্নান করতে আসে। সরোবরের পাড়ে কাপড় রেখে তারা জলে খেলা করে। সেই সময় সব কাপড় নিয়ে আসতে হবে। তবে ফুলতীকে পাওয়া যাবে। তারপর রাত হলে মুনি রাখালকে সরোবরের ধারে পাঠাল আর বলে দিল — সরোবরের দক্ষিণ দিকে একটা বাঁধান ঘাট

আছে। ঘাটের দক্ষিণে আছে একটা বটের ঝুরি মামা-গাছ। সেই ঝুরির আড়ালে বসে থাকতে হবে ও সুযোগ বুঝে কাপড় গুলো নিয়ে আসতে হবে। মুনির কথামত রাখাল গিয়ে বট গাছের ঝুরির আড়ালে বসে থাকল। ফুলবতীকে নিয়ে ছয় বোন এলো ও নাচ গান করল, তারপর ঘাটের উপর কাপড় রেখে জলে নাইতে গেল। রাখাল সুযোগ বুঝে কাপড় গুলো গুটিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে। সাত বোন বলল, যা চাও তাই দিব, কাপড় গুলো দাও। রাখাল যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে, অমনি সাতবোনে তাকে ভস্ম করে ঘুঁটে ছাই করে মুনির কাছে ফেলে দিল। মুনি তাকে আবার মানুষ করে দিল। তারপর বলল, যা বেটা ফিরে যা, তু পারবি না। রাখাল মুনির পা দুটো চেপে ধরে বলল, মামা! আমি আর একবার, আমি আর একবার দেখবো!

দিন দুই পর রাখাল আবার গিয়ে বটের ঝুরির আড়ালে লুকিয়ে রইল। নাচ-গানের পর যেই মেয়ে গুলো কাপড় খুলে রেখে জলে নাইতে নেমেছে, অমনি সুযোগ বুঝে রাখাল কাপড় নিয়ে চম্পট দিল। মেয়েরা যত তাকে ডাকে তত সে ছুটে পালায়। তখন মেয়েরা কলার পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে মুনির কাছে এসে বলল, এখানে একজন যুবক এসে ঢুকেছে, আর সে আমাদের কাপড় নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমাদের কাপড় দিতে বল। মুনি বলল, এক সর্তে কাপড় দিতে পারি, তা হলো ওর সঙ্গে তোমাদের ছোট বোনের বিয়ে দিতে হবে। মেয়েরা বলল, বেশ তাই হবে; তবে তাকে চিনে নিতে হবে। মুনি বলল, বেশ তাই হবে। মুনি রাখালকে মেয়েদের কাপড় দিতে বলল। কাপড় নিয়ে মেয়েরা চলে গেল। পরদিন রাতে রাখালকে মেয়ে চিনে গলায় মালা দিতে হবে। মুনি ভাল ভাল ফুল এনে একটা মালা গেঁথে রাখালের হাতে দিয়ে বলল, দেখবি যে মেয়েটা দেখতে কুৎসিত, কুঁজো, গায়ে খসানি ধরেছে তার গলায় মালা দিবি। কোন সুন্দরী রূপসীর গলায় মালা দিবি না। তাই হলো। রাখাল দেখল ছয়টা মেয়ে

রূপবতী ও সুন্দরী একজন কুৎসিত, কুঁজো, গায়ে রসানি ঝরছে। ঐ মেয়ে ছয় জন বলে আমার গলায় মালা দাও। রাখাল গিয়ে সেই কুৎসিত মেয়েটার গলায় মালা দিল। এই ভাবে ফুলবতীর সঙ্গে রাখালের বিয়ে হলো। ফুলবতীর রূপ যেন ধরে না। সে একবার ঝাড়া দিল অমনি রাশি রাশি তুতুরাং ফুল চুল হতে ঝরে পড়ল। ফুলবতী রাখালকে একটা বাঁশের বাঁশী দিয়ে বলল, এই বাঁশীতে যখনি তুমি ফু দিয়ে বাজাবে তখনি আমি তোমার কাছে হাজির হবো। তারপর রাখাল মুনির কাছে ফিরে এলো। মুনির কাছ হতে বিদায় নিয়ে নদীর স্রোতের ধারে ধারে যে পথে সে এসেছিল সেই পথ দিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

অনেক দিন হাঁটার পর দ্বিতীয় মুনির সঙ্গে দেখা। সে বলল কি পেয়েচিস্ আমাকে দেখা। রাখাল তাকে বাঁশীটা দেখাল। এই মুনি আসলে ঐ ফুলবতীর জন্য বসে ছিল। তাই সে বলল, বাবা আমার নিকট একটা ছাদন দঁড়ি আর মারণ লড়ি আছে। এটার কাজ হলো দড়িটা ছুড়ে দিয়ে যাকে খুশী বাঁধতে বললেই ছাদন দঁড়ি তা বেঁধে ফেলবে, আর লড়িকে মারতে বললেই সে মার লাগাবে। এই বলে সে, দঁড়ি-লড়ি পরীক্ষা করে দেখাল। মুনি বলল, বাবা বাঁশীটা দিয়ে তুই এই দুটো নিয়ে যা। রাখাল বাঁশীটা দিয়ে ছাদন দড়ি, আর বাঁধন লড়িটা মুনির কাছ থেকে নিল। তারপর নদীর ধারে এসে দড়ি আর লড়িকে বলল, দড়ি-লড়ি এখন তোমরা কার? দড়ি-লড়ি বলল, আগে ছিলাম মুনির এখন তোমার, তুমি যা বলবে তাই করবো। রাখাল বলল, যাও মুনিকে বেশ ঘা কতক দিয়ে আমার বাঁশীটা নিয়ে এসো। দড়ি গিয়ে মুনিকে বাঁধল, আর লড়ি মারতে লাগল। মুনি বলল তোরা আমার দড়ি আমার লড়ি আর আমাকে মারছিস্? দড়ি-লড়ি বলল, আগে ছিলাম তোমার, এখন রাখালের। রাখাল বাঁশী ফেরৎ নিয়ে নদীর ধার ধরে আবার চলতে লাগল।

কতদিন পর হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই প্রথম মুনির সঙ্গে

দেখা হলো। মুনি বলল, ভাগ্নে ফুল পেয়েছিস্? রাখাল বলল, এই বাঁশীটা পেয়েছি মামা। এই মুনিও ঐ ফুল ও ফুলবতীর জন্য তপস্যা করছিল। বাঁশীটা দেখে সে সব বুঝতে পারল। মুনি বলল, বাবা বাঁশীটা আমাকে দাও, আমি তোমাকে একটা বস্তু দিব। রাখাল বলল, বস্তুটা কি? মুনি বলল, একটা বাঁশের চোঙ্গা। এই চোঙ্গার ভিতরে ডাকিনী, যোগীনী, ভূত, প্রেত, বাঘ, ভালুক ভরা আছে। বিপদ বুঝলেই এদের চোঙ্গা থেকে ছেড়ে বলতে হবে, যুদ্ধ কর — এরা যুদ্ধ করবে। আবার যখন বলবে চোঙ্গায় ঢোক, অমনি ঢুকবে। রাখাল বলল, মামা পরীক্ষা করে দেখাও। মামা পরীক্ষা করে চোঙ্গের মহিমা দেখাল। রাখাল বাঁশীটা হাতে দিয়ে চোঙ্গাটা নিল। তারপর দড়ি ও লড়ির সাহায্যে বাঁশী উদ্ধার করল।

দড়ি, লড়ি, চোঙা আর বাঁশী নিয়ে রাখাল নিজের বাড়ীতে এলো। এই হাঁটাহাঁটিতে রাখাল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এমনি করে দু'দিন সে বিশ্রাম করতে লাগল। এদিকে রাজা খবর পেয়েছে যে রাখাল এসেছে। তার মেয়ে ফুল চাইছে। রাজা দু'জন পাইক পাঠাল। রাখাল বলল, এখন যাব না। পাইকরা খবর পাঠাল রাজাকে। রাজা তখন চারজন বলবান পাইক পাঠাল ধরে আনার জন্য। তারা রাখালকে যেই ধরতে গেল, রাখাল দড়ি লড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে আচ্ছা করে মার দিল। তারা রাজাকে গিয়ে দুঃখের কথা জানাল। রাজা তখন একদল সিপাই পাঠিয়ে দিল রাখালকে ধরে আনার জন্য। তখন রাখাল তার চোঙ্গার মধ্যে যত ডাকিনী যোগিনী ছিল সকলকে ছেড়ে দিল। তাদের আক্রমণে রাজার সৈন্যরা ভয়ে পালাতে লাগল। চোঙ্গার ডাকিনী যোগিনী, বাঘ, ভালুক, রাজধানী ঘিরে ফেলল, রাজা গলায় কাপড় দিয়ে বলল, বাবা রক্ষা কর। আমার এই রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব, আর অর্ধরাজ্য দান করবো। রাখল তখন ডাকিনী-যোগিনী ভূত, প্রেতদের বলল, ঢোক চোঙ্গার ভিতরে।

অমনি সকলে চোঙ্গার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

রাখালকে সসম্মানে রাজ বাড়ী নিয়ে গেল রাজা। রাখাল বাঁশীতে ফুঁক দিল আর অমনি ফুলবতী নেমে এলো। রাখাল তাকে একবার চুল ঝাড়া দিতে বলল। যেমনি ফুলবতী চুল ঝাড়া দিল অমনি রাশি রাশি ফুল জড় হলো। আর ফুল দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি তার গন্ধ। রাজা বলল, সত্যিই আমি এ ফুল দেখি নাই।

রাজকন্যার সঙ্গে রাখালের বিয়ে হলো। রাখাল অর্ধরাজ্য ফুলবতী ও রাজ কন্যাকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

—০—

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার, দক্ষিণখণ্ড গ্রামের শ্রীমোহন পটুয়ার নিকট হ'তে সংগৃহীত।]

। রাজপুত্র ও তার চার বন্ধু ।

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার সাত রাণী। তার মধ্যে বড় রাণীর একটি পুত্র হয়েছে। ছেলেটি খুব দুষ্ট। রাজার ছেলে হয়ে পথে পথে ধুলো খেলা করে। রাজা এই সব ধুলো খেলা পছন্দ করেন না। রাজার ছোট রাণীও গর্ভবতী। একদিন রাজা পথিমধ্যে তার ছেলেকে দেখলো যে ছেলে ধুলো খেলছে। রাজা বলল, বাড়ীতে সাত রাণী আছে, তারা একটা ছেলেকে ঠিক রাখতে পারে না! বাড়ী ফিরে এই ছেলে আর সাত রাণীকে কোতল করব। রাণীরা এই কথা শুনলো, আর ছেলেকে নিয়ে সাত রাণী বনের দিকে চলল। রাজধানীর কিছু দূরে আছে একটা ছোট বন। এই বনের কিছুদূরে আছে একটা বড় বন। ছয় রাণী ছেলেটি নিয়ে বড় বনে ঢুকল। আর ছোট রাণী হাঁটতে পারে না। সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোট বনে থাকল। ক্লান্ত হয়ে তার আর হাঁটার শক্তি রইল না।

বড় বনে ছিল এক বড় মিষ্টির দোকান। গামলায় গামলায় রসগোল্লা, পানতুয়া, দানাদার, মণ্ডা সাজানো আছে। কিন্তু লোক নাই। আলমারীর গায়ে লেখা আছে মিষ্টি ওজন করে নিয়ে এই এই দাম বাক্সে রাখুন। পাশে ইন্দারা আছে, জল খান। দূর পথ হেঁটে ছেলে ও ছয় রাণীর খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তারা লিখন পড়ে মিষ্টি নিল। টাকাটা বাক্সে রেখে, মিষ্টি খেয়ে ইন্দারায় জল খেতে গেল। ইন্দারায় থাকে এক রাক্ষসী। মিষ্টির দোকান তারই। এটা তার টোপ। মিষ্টি খেয়ে যেই জল তুলতে ইন্দারায় বালতি ফেলেছে, অমনি রাক্ষসী এসে ছয় রাণী ও ছেলেকে মুখে করে নিয়ে খেয়ে ফেলল। হাড়গুলো ইন্দারার ভিতর পড়ে রইল। এদিকে ছোট রাণী কিছুদিন পর এক পুত্র প্রসব করল। ছেলের

ছেলের চেহারা ভাল।' ছেলে মায়ের দুধ খায় আর বনের ফল খায়। এইভাবে সে একটু বড় হলো। লেখাপড়া শেখে নাই। একদিন খাবার খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে বনের মধ্যে মিষ্টির দোকান দেখল। নিজে খুব খেল, আর মায়ের জন্য নিয়ে এলো। লেখাপড়া জানে না, তাই সে ইন্দারার সন্ধান পেল না। রাক্ষসী রোজ মিষ্টি তৈরী করে রাখে, আর ছেলেটি খায়। এই ভাবে বনের ফল আর মিষ্টি খেয়ে সে হলো এক বলবান যুবক। বনের মধ্যে বাঘ, সিংহ, বুনো মোষ সবার সঙ্গে লড়াই করে। তাকে দেখলে বনের পশুরা ভয়ে পালায়। বুনো মোষ আর গাইকে ধরে তাদের দুধ খায়। বনে এমনি করে তার দিন কাটে। একদিন পশুরাজ সিংহ তার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হেরে গেল।

কিছুদিন পর ছোট বনে জলাভাব দেখা দিল। রাজপুত্রের মায়ের খুব পিপাসা লেগেছে। মিষ্টির দোকানে এসে সে জলের খোঁজ করল। খুঁজতে খুঁজতে সে ইন্দারার সন্ধান পেল। রসা বালতি ইন্দারার উপর কপিকল দিয়ে টাঙান ছিল। জল তোলার জন্য বালতি ইন্দারায় নামাল। আর রাক্ষসী সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো। লড়াই বাঁধল বীরের সঙ্গে রাক্ষসীর। বীর রাক্ষসীকে মেরে টাঙিয়ে রাখল মিষ্টির দোকানের সামনে। তারপর দুই বনের মাঝে একটা পুকুরের সন্ধান পেল। সেখান হতে জল নিয়ে গিয়ে মাকে খাওয়াল। আর বলল, সব দিকে বেড়াতে যাবে, যাবে না শুধু ঐ দক্ষিণ দিকের বড় বনে। দক্ষিণ দিকে মাকে যেতে বারণ করল, আর তার মা দক্ষিণ দিকে একদিন বেড়াতে গেল। গিয়ে দেখল দোকানের সামনে ঝুলছে এক রাক্ষসী। মেয়েটিকে দেখে রাক্ষসী বলল, ঐ ইন্দারা হতে জল তুলে আমায় বাঁচান। আমার দেহটায় ঠিক করে ঐ ইন্দারার জল ছিটিয়ে দিলেই আমি বেঁচে যাব। আমি তিন সত্যি করছি, তোমাকে বা তোমার ছেলেকে খাব না। মেয়ের মন, রাক্ষসীর কথায় নরম হলো। আর বীরের মা তাকে বাঁচিয়ে দিল। বীর কিন্তু এসব কিছু জানে না। বীর বনে বনে বেড়ায় ফলমূল,

পশুপক্ষীর মাংস এনে খায় দায়, থাকে। ছেলেও বনে বনে শিকারে যায়, মাও রাক্ষসীর কাছে যায়। এমনি করে রাক্ষসীর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। একদিন তার মা রাক্ষসীকে বলল, তুমি আমার ছেলেকে খেয়ে নাও, আমরা দু'জন সুখে থাকি। ঐ ছেলে যখন সব জানতে পারবে তখন আমাদের শাস্তি দেবে। রাক্ষসী বলল, আমি তিনসত্য করেছি, এ সত্য আমরা ভাঙ্গি না। মা বলে, তাহলে উপায় ? রাক্ষসীবলল, তুমি এক কাজ কর, তুমি আজ গিয়ে বিছানায় অসুখের ভান করে পড়ে থাক। ছেলে এসে শুধাবে, মা তোমার কি হয়েছে ? তুমি বলবে, আমার কঠিন অসুখ করেছে, বাঘের দুধ খেলে এই অসুখ সারবে। ছেলে বাঘের দুধ আনতে গেলে তাকে বাঘে খেয়ে নেবে। তাই হলো। বীরের মা অসুখের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকল। মাতৃভক্ত ছেলে শুধাল, মা তোমার কি হয়েছে ? মা বলল, আমার কঠিন অসুখ করেছে, বাঘের দুধ খেলে বাঁচবো নচেৎ মরে যাব।

ছেলে তখন একটা পাত্র নিয়ে বনে গেল। বনের মাঝখানে একটা বাঘ কিছু দিন হলো বিয়েছে। তার তিন চারটি ছা। বীর গিয়ে তাকে ধরল। বাঘ বলল, অর্ধেকটা দুধ নাও, আর অর্ধেকটা রেখে দাও। আমার ছা'রা দুধ না পেলে কষ্ট পাবে। আর, তোমার মায়ের কোন অসুখ হয় নি। সে তোমাকে মারার জন্য পাঠিয়েছে। বীর বলল, খবরদার ! আমার মা সম্বন্ধে যা তা বলবি না ; এরপর বললেই মেরে ফেলব। বাঘ আর কি করে ! চুপ করে গেল। ছেলে বাঘের দুধ এনে মাকে দিল। পরদিন মা রাক্ষসীর নিকটে গিয়ে বলল, "ছেলে তো বাঘের দুধ এনে দিল। এরপর কি করা যায় ?

রাক্ষসী বলল, এই বনের আরও দক্ষিণে আর একটা গহীন বন আছে ! সেখানে এক বড় দালানে আমার বড় ভাই রাক্ষস বাস করে। সে বড় বীর, তারকাছে ওষুধ আনতে পাঠাও, সে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবে। রাক্ষসীর কথা শুনে তার মা আবার

অসুখের ভান করে পড়ে রইল। ছেলে এসে শুধাল, মা কি হয়েছে? মা বলল,কঠিন অসুখ, বাবা! এই বনের অনেক দক্ষিণে আর একটা বড় বন আছে, সেই বনে থাকে এক বৃদ্ধ কবিরাজ, তার কাছ হতে ওষুধ আনলে আমি বাঁচব। বীর তার পরদিন সেখানে যাত্রা করল। বনের মধ্যে বাড়ীর সিংহদ্বারে রাক্ষস বসে থাকে, শিকার পেলেই ধরে। বহু বৎসর পর বনের দিকে মানুষ আসতে দেখে সে খুব খুশী হলো। ভাবল, যাক্ আজ মানুষের মাংস খেতে পাব। বীর গিয়ে তার নিকট ওষুধ চাইল। সে বলল, ওষুধ কিসের? তোকে ধরে খাব। বীর তার চুল চেপে ধরে মারতে লাগল। মার খেয়ে রাক্ষস বুঝল, এ শিকার ঘায়েল করা যাবে না। বীরও ওষুধ ছাড়া যাবে না। কে আর মার খায়, সে বাড়ী গিয়ে এক শিশি পচান এনে দিল। বীর মনে করল এটাই ওষুধ। এনে মাকে দিল। কিছুতেই কিছু হলো না। আবার রাক্ষসীর সঙ্গে যুক্তি করতে বসল। রাক্ষসী বলল, এইবার এমন জায়গায় পাঠাব, সেখান হতে তোমার ছেলে আর ফিরবে না। তের নদী পারে আছে এক দীঘি, সেই দীঘির চারিদিকের জলে আগুন জ্বলছে, আর দীঘির মাঝখানের জল ঠাণ্ডা। এই জ্বালাপোড়া জল আনতে পাঠাও। এই পুকুরের জলে নামলেই তোমার ছেলে গরম জলে সিদ্ধ হয়ে মরে যাবে। পরদিন মা অসুখের ভান করে পড়ে রইল। ছেলে শুধাল কি হয়েছে? মা বলল, কঠিন অসুখ হয়েছে। তের নদী পারে দীঘি হ'তে জ্বালাপোড়া জল আনতে হবে। সেই জল খেলে অসুখ ভাল হবে।

বীর তার পরদিন তের নদী পার হ'য়ে জ্বালাপোড়া জল আনতে গেল। দীঘির ধারে গিয়ে দেখে চারিদিকে জলের উপর আগুন জ্বলছে। সেখানে ছিল এক কুমারী যুবতী কন্যা। সে জ্যোতিষ গণনা জানতো। সে গণনা করে সব বুঝতে পারল। তারপর বীরকে তার বাড়ী নিয়ে গেল। বীরকে বলল, এ জল আনতে গেলেই তুমি মরে যাবে। বীর বলল, যে করেই হোক জল

নিতেই হবে। কন্যা বলল, তীর হতে লাফ মেরে পুকুরের মধ্যস্থলে পড়তে হবে। তারপর ঘটিতে জল নিয়ে লাফ দিয়ে পাড়ে আসতে হবে। আগুনের উপরে পড়লেই তুমি মরে যাবে। আর পাড় হতে দড়ি বেঁধে ঘটি ডুবিয়ে জ্বালাজল তুলে নিতে হবে। বীর সেই ভাবে জল সংগ্রহ করল। মেয়েটি খুব সুন্দরী। সে বলল, তুমি দু'দিন এখানে থাক, বিশ্রাম কর। তোমার শত্রু তোমার মা, সে রাক্ষসীকে বাঁচিয়ে তার সঙ্গে সই পাতিয়ে তোমাকে মারতে চাইছে। প্রথমে বাঘের দুধ, তারপর গহীন বনে রাক্ষসের নিকট পাঠিয়ে ছিল। এই দুই স্থানে তোমার মৃত্যু হয় নি, তাই তোমাকে এই জ্বালাপোড়া জল আনতে পাঠিয়েছে। আচ্ছা, বাঘের দুধ যখন আনতে যাও, তখন বাঘ তোমাকে কোন কথা বলেনি! বীর বলল, হ্যাঁ বাঘ বলেছিল যে, তার মা তার শত্রু। বীর বলল, তবে আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না। কন্যা বলল, তুমি দেখতে চাও, না শুনতে চাও? বীর বলল, দেখতে চাই। কন্যার কাছে একটা উড়ন খাট ছিল। তার উপরে দু'জনে চাপল, আর নিমিষে এসে সেই খাট ইন্দারার কাছে এলো। দেখল মা ও রাক্ষসী ইন্দারায় বসে আছে। বীরকে দেখে তার মা ও রাক্ষসী ভয় পেয়ে গেল। কন্যা বলল, ইন্দারা হতে সব হাড় তুলে আন, আমি সকলকে মন্ত্র বলে মানুষ করে দিব। এই ভাবে সব লোক বেঁচে গেল। আর তখন তার সাত মা ও বড় ভাইকে বাপের রাজ্যে পাঠিয়ে দিল। আর নিজে সেই কন্যাকে বিয়ে করে কন্যার দেশে চলে গেল। সঙ্গে গেল রাক্ষসী। বীর তার নাম দিল খাঁদি বাঁদী। এই কন্যার রাজ্যের নাম আকরম শহর। আর বীরের নাম দিল মকরম বাদশা।

[দুই]

আকরম শহরে মকরম বাদশা তার বিবিকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল। সঙ্গে আছে খাঁদী বাঁদী। সে এই বাদশার খুব অনুগত। কারণ তিনটি কঠিন কাজ সে করেছে। বাঘের দুধ,

রাক্ষসীর বড় ভাইকে পরাস্ত, আর জ্বালাপোড়া জল এনেছে। এখানে তারা বেশ সুখে আছে। কিছুদিন পর বাদশার কাছে খবর এলো আকরম শহরের দক্ষিণে এক শহর আছে। সেখানের রাজ-কন্যা খুব সুন্দরী। রাজার এক হাতী আছে, সেই হাতীকে যুদ্ধ করে যে হারাতে পারবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে আর অর্ধরাজ্য পাবে। আর হাতীকে হারাতে না পারলে হাতী তাকে মেরে ফেলবে। এই কথা শুনে মকরম বাদশা খাঁদি বাঁদীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। এক বিরাট ময়দান। রাজা পাত্র মিত্র সহ বসে আছে। একপাশে রাজকন্যা অপরূপ সাজে বসে আছে। হাতে তার বরণ মালা। এমন সময় রাজার লোকেরা একটি হাতীকে সাজিয়ে ময়দানে নিয়ে এলো। মকরম বাদশা ময়দানে নেমে পড়ল। প্রথমে হাতী মকরম বাদশাকে শুঁড় দিয়ে ধরে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু হেলাতে পারল না, হাতী সরে গেল। এরপর মকরম বাদশার পালা। বনে বনে পশুর সঙ্গে যুদ্ধকরা, তার কাজ ছিল একসময়; হাতীর শুঁড় চেপে ধরে আলাদা ছক্কা তুলে দক্ষিণ দিকে ছুড়ে দিল। হাতী গিয়ে কোথায় পড়ল কে জানে! রাজকন্যা ছুটে এসে তার গলায় বরমাল্য দিল। বাদশা বলল, হাতী কোথায় পড়েছে দেখতে হবে। এই বলে কন্যাকে সেখানে রেখে, খাঁদী বাঁদীকে সাথে নিয়ে কোথায় হাতী পড়েছে দেখতে গেল। খাঁদী বাঁদীকে নিয়ে বাদশা চলেছে। পথিমধ্যে এক দীঘিতে একটা লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। লম্বা তালগাছের ছিপ, শণের রসার সূতো আর বেলগাছের ডালের ফতা কাঠি। লোকটা অনা-য়াসে ছিপ তুলছে আর ফেলছে। বাদশা তাকে ডেকে বলল, তুমিতো ভাই বড় পালোয়ান। ছিপওয়ালা বলল, আমি আর কি পালোয়ান আকরম শহরে মকরম বাদশার নাম শুনেছ? সে এক হাতি এমন ভাবে ছুড়েছে যে আমার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। পালোয়ান হতে হয়তো সেই আকরম শহরের মকরম বাদশা। বাদশা বলল, আমি মকরম বাদশা। ছিপ রেখে সে তখন বলল আমি

আপনার সঙ্গে হাতী কোথায় পড়েছে দেখতে যাব। তারা তিনজনে যায়। আর কিছুদূর গিয়ে তারা দেখল এক চাষী বার বিঘে জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ধুলোয় বীজ ফেলছে। একটা আস্ত গোলা হাতে নিয়ে সে বীজ ছড়াচ্ছে। তিন জনে বলল, বাবা পালোয়ান বটে। আস্ত এক গোলা ধান নিয়ে বীজ ছড়াচ্ছে! চাষী বলল, আরে আমি আর কি পালোয়ান। পালোয়ান আকরম শহরের মকরম বাদশা। সে একটা হাতী এমন ভাবে ছুড়ে দিয়েছে যে আমার মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। বাদশা বলল, আমিই মকরম বাদশা। চাষী বীজ ছড়ান রেখে বলল, চল আমি তোমার সাথে যাব। চার-জনে যায়। যেতে যেতে পথে পড়ল ছোট এক নদী। নদীতে দু' কিনারী বান। এক গয়লার পো ছোট নদীর এদিকে এক পা ওদিকে এক পা রেখে হাতে করে এক একটা গরু ধরছে আর পার করছে। চারজনে এই গরু পার করা দেখে বলল, পালোয়ান বটে! ছিপওয়ালা বলল, মেলা গাই, রোজ রোজ দুধ খায়। গায়ে বল তো হবেই। সব শুনে গয়লার পো বলল, আরে আমি আর কি পালোয়ান। আমার চেয়ে বড় পালোয়ান আকরম শহরের মকরম বাদশা। বিয়ে করতে গিয়ে সে এত জোরে একটা হাতী ছুড়ে দিয়েছে যে হাতীটা আমার গরুর পালের উপর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। তার কাছে আমরা ছেলেমানুষ। বাদশা বলল, আমিই আকরম শহরের মকরম বাদশা। গয়লার পো বলল, চল তোমার সঙ্গে যাব, হাতী কোথায় পড়েছে দেখব। পাঁচজনে যায়। যেতে যেতে তারা এক সমুদ্রের ধারে হাজির হলো। পার হবার নৌকা নাই। বসে বসে পাঁচজনে ভাবছে কিভাবে পার হবে। এমন সময় এক তিমি মাছ ভেসে উঠে বলল, আমি তোমাদের পাঁচজনকে পার করে দিতে পারি, তবে একজনকে খাব। এই সর্তে রাজী হলে তবে পার করে দেব। তারা রাজী হলো। বাদশা বলল, আমাকে খাবে। যাও, আমার চার বন্ধুকে পার করে দিয়ে এসো। তাদের পার করে দিয়ে এলো। এপারে এসে বাদশাকে খেতে চাইল।

বাদশা বলল, আমাকে ঐ পারে নিয়ে চল, বন্ধুদের একবার দেখবার দেখব তারপর খাবে। তিমি বলল, বেশ। ওপারে গিয়ে বাদশা তিমিটার লেজ ধরে পাড়ে ছুড়ে ফেলল, তারপর মারল দুই আছাড়। তিমি মরে গেল। তাকে পুড়িয়ে পাঁচজনে খেল। সমুদ্রের এক দিকে ছোট একটা উঁচু টিপি, তার ওপাশে একটা বন। সেখানেই তারা থাকল। দেখল সমুদ্রের ধারে জলের মধ্যে হাতীটা মরে পড়ে আছে। কিভাবে তারা পার হবে! সেখানেই তারা থাকে। একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে। তারা সমুদ্র ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে গেল। সেখানেই আপাততঃ তারা বাস করতে লাগল।

প্রথম দিন ছিপওয়ালা আর খাঁদী বাঁদী রান্না করতে লাগল। বাদশা দুই জনাকে নিয়ে শিকার করতে গেল। রান্না যেই হয়েছে দেখল, একটা বেঁটে বামন এসে হাজির। সে দেড়হাত লম্বা পাঁচ হাত তার দাড়ী। সে ছিপওয়ালাকে বলল, বন্ধু ভাল আছ? ছিপওয়ালা বলল, হ্যাঁ ভাল আছি, তুমি কে? সে বলল, আমি ছোট্ট এক বামন। আমাকে দুটি ভাত দাও। ছিপওয়ালা বলল, তিন বন্ধু আসুক, তখন খেতে দেব। এই কথা শুনে বামন দাড়িটা দু'ফাঁক করে বেশ করে ছিপওরালাকে বাঁধল। তারপর পিঠে ফেলে যা কিছু ছিল খেয়ে নিল। কি করে! আবার সে রান্না করল। দেরী দেখে ঘোষ বলল, এখনও রান্না হয় নি? কি করছিলে তোমরা? ছিপওয়ালা কিছু বলল না। পরদিন চাষী রাঁধবার জন্য থাকল। একই ঘটনা ঘটল। তার পরদিন ঘোষ থাকল, একই ঘটনা ঘটল। তার পরদিন, বাদশার পালা। বাদশার কাছে যেই বামন অন্যান্য দিনের-মত এলো, বাদশা তার ধড় হতে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। মুণ্ডুটা গড়াতে গড়াতে যায়। বাদশাও মুণ্ডুর পিছে পিছে যায়। মুণ্ডুটা একটা ফাটাল দিয়ে মাটির নিচে ঢুকল। বাদশা হাতের চাড় দিয়ে ফাটালের মাটি তুলে ফেলল, নিচে দেখল একটা সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথ দিয়ে গিয়ে দেখে নিচে সুন্দর এক পুরী। এক ঘরে এক রূপসী কন্যা বসে আছে। কন্যা

বলল, তুমি কে? পালাও। এখানে বামন রাজা আছে, তোমাকে মেরে ফেলবে। বাদশা বলল, বামনকে আমি মেরে ফেলেছি। তার মুণ্ডুটা এই ঘাটের নিচে আছে। কন্যা বলল, আমি রাজস্থানের রাজার মেয়ে, এই বামন আমাকে ধরে এনেছে। এই কন্যার মাথার কেশ বার হাত। বাদশার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলো। পাঁচ বন্ধুতে সেখানেই থাকে। কন্যা প্রতিদিন নদীতে স্নান করতে যায়। একদিন তার একটা চুল খসে গেল। কন্যা সেই বড় চুলটা একটা পাট কাঠিতে জড়িয়ে নদীতে ফেলে দিল। অনেক নিচে সেই চুল পেল এক রাজার ছেলে। চুলটা মেপে দেখল বার হাত। রাজার ছেলে গিয়ে গোঁসা ঘরে খিল দিল। রাজা-রাণী শুধায় কি হয়েছে? রাজপুত্র বলে, এই বার হাত চুল যার তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে। রাজা বলল, বেশ এই রাজকন্যার সাথেই তোমার বিয়ে দেব। রাজা মন্ত্রীর সাথে যুক্তি করল, কি ভাবে এই কন্যাকে আনা যায়। মন্ত্রী বলল, চুল যখন উপর থেকে ভেসে এসেছে, তখন এই কন্যা উপরে কোন শহরে আছে। সে শহর নদীর ধারের উপরে। তারপর মন্ত্রী একটা সোনার কুমড়ো তৈরী করাল। সোনার কুমড়োটি রাখল নৌকার উপরে, তারপর নৌকায় খাটিয়ে দিল বড় পাল। আর নৌকার খোলের মধ্যে ৫/৬ জন বলবান মাঝিকে লুকিয়ে রাখল। কেশবতী কন্যা রোজ নদীতে গা ধুতে আসে। সেদিন দেখল সোনার একটা কুমড়ো নৌকার উপর বসানো আছে, আর রোদেতে চক্‌চক্‌ করছে, নৌকায় কেউ নাই। বাতাসের ভরে নৌকা চলছে। কন্যা ভাল সাঁতার জানতো। সে সাঁতরিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠল, আর সোনার কুমড়োটি নিতে গেল। সাথে সাথে তাকে ধরে বেঁধে ফেলল মন্ত্রীর লোকজন। পাল খাটিয়ে তর তর করে নৌকা ভাটিয়ে গিয়ে রাজার ঘাটে থামল। রাজপুত্রের সাথে কন্যার বিয়ে দিতে চাইল রাজা। কন্যা বলল, বার বৎসর বাপ-বিটি পাতান থাকবে, তারপর বিয়ে হবে। আর জোর করে বিয়ে করলে বিষ খেয়ে আমি মরব। আমাকে পাবে না। তাই হলো।

এদিকে মকরম বাদশা দেখল কন্যা ফিরে আসছে না। কয়েক ঘণ্টা পর নদীর ঘাটে গিয়ে পাঁচজনে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কন্যার সন্ধান পেল না। তখন ঠিক হলো যে খাঁদীবাঁদী ও ঘোষ একদিকে যাবে, আর বাদশা, ছিপওয়ালা ও চাষী অন্য দিকে যাবে কন্যার খোঁজে। তাই হলো। দুই দিকে পাঁচজন কন্যার খোঁজে বেরুল। তিনজন চলেছে ঘোড়ায় চেপে। ঘুরতে ঘুরতে তারা এক বনে এসে হাজির হলো। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ঘোড়া তিনটি গাছের শিকড়ে বেঁধে তিনজনে গাছের ডালে উঠল। বাদশা বলল, একজন জেগে থাক আর দু'জন ঘুমাও। ছিপওয়ালা জেগে রইল। রাতের প্রথম প্রহর শেষ হলো, এলো এক রাক্ষসী। সে প্রথমে ছিপওয়ালার ঘোড়াটি খেয়ে নিল, তারপর একটা মন্ত্র উচ্চারণ করল। সেই মন্ত্র ছিপওয়ালা শিখে নিল। নীচে অনেকগুলি হাড় ছিল, মন্ত্রের ফলে হাড়গুলি গায় গায় লেগে গেল। তারপর চাষী উঠল। দ্বিতীয় প্রহর শেষে রাক্ষসী আবার এলো, তারপর চাষীর ঘোড়াটি খেয়ে নিল, তারপর একটা মন্ত্র উচ্চারণ করল। চাষী তা শিখে নিল। গাছতলার জন্তুটার হাড়ের উপর চামড়া লাগল। তারপর শেষে বাদশা উঠল, আবার রাক্ষসী এলো, বাদশার ঘোড়া খেল, তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করল। বাদশা তা শিখল। জন্তুটা একটা হনুমান, সে লাফ মেরে গাছে উঠে পালিয়ে গেল। সকাল হলে তিনজনে রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল। দু' দিনের পথ গিয়ে তারা এক পাহাড়ের নিচে অনেক হাড় দেখতে পেল। ছিপওয়ালা মন্ত্র বলে সেই হাড় জোড়া লাগাল, চাষী মাংস ও চামড়া লাগাল। দেখল বিরাট এক বাঘ। বাদশা বলল, তোমরা দূরে সরে যাও। এর মধ্যে প্রাণ দিব আমি। যেমনি প্রাণ দিল অমনি বাঘ লাফিয়ে উঠল। ছিপওয়ালা ও চাষী একদিকে ছুটে পালাল। বাদশা অন্য দিকে ছুটে পালাল। বন্ধুহারা বাদশা এখন একা চলেছে। চলতে চলতে এক বনে এসে তার সন্ধ্যা হলো। বাদশা এক গাছে উঠল রাত

কাটানোর জন্য। প্রথম প্রহর পর দেখলো এক কন্যা নিকটবর্তী নদী হতে উঠে আসছে। যেমন তার দেহের গঠন, তেমনি তার রূপ। তার হাতে একটা মণি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কন্যার পিছনে পিছনে আসছে এক সর্পরাজ। কন্যা যে গাছের উপর বাদশা আছে তার নিচে মণিটা রেখে চলে গেল। সর্পরাজ শিকার করতে লাগল। বাদশা গাছের উপরে বসে সব দেখতে লাগল। শিকার শেষ হলে সেই রূপবতী আবার ফিরে এলো এবং মণিটা নিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। সর্পটিও তার পিছু পিছু গেল। পরদিন বাদশা নিকটবর্তী গ্রামে এক কামারের নিকট গেল ও একটা লোহার পলুই তৈরী করল। পলুইয়ের লোহার কাঁটিগুলো হলো এক একটা ধারাল ছোরা। একটা লোহার শিকলে বেঁধে পলুই নিয়ে বাদশা গাছে উঠল। সেদিন রাতে আবার যথারীতি মণিহাতে কন্যা এলো, পিছু পিছু সর্পরাজ এলো। কন্যা মণি গাছ-তলায় রাখল ও চলে গেল। সর্পরাজ চরাট করতে করতে একটু দূরে চলে গেলে বাদশা ধীরে ধীরে লোহার শিকল দিয়ে পলুইটা নিচে নামিয়ে দিল। মণিটা পলুই-এর মধ্যে রইল। মণির আলো কমে গেল। সর্পরাজ ছুটে এলো, আর ধারাল পলুই-এর উপর ছোবল মারতে লাগল। এই ভাবে ধারাল ছুরিতে ছোবল মেরে সর্পরাজ মারা গেল। বাদশা গাছ হতে নেমে মণিটা নিয়ে নদীতে ধুতে গেল। যেই মণিটি জলে ঠেকিয়েছে অমনি দেখল একটি পথ। বাঁধান সিঁড়ি। বাদশা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখল এক রাজ প্রাসাদ। তার মধ্যে খাটের উপর বসে আছে সেই কন্যা। কন্যা বলল, পালাও। ভীষণ এক সর্পরাজ এখানে বাস করে। সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে। বাদশা বলল, সর্পরাজকে মেরে ফেলেছি। এই কথা শুনে কন্যা খুব খুশী হলো এবং বাদশার সঙ্গে তার বিয়ে হলো। বাদশা তাকে তার চার বন্ধুর কথা বলল এবং কিভাবে মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে হয় শিখিয়ে দিল। কেশবতীকে বাদশা তার চার বন্ধুর বর্ণনা দিয়েছিল। কেশবতী অবশ্য দু'জনকে

দেখেছিল।

কন্যা মণিটা নিয়ে রোজ উপরে পা ধুতে আসে। একদিন এক রাজার ছেলে দেখতে পেয়ে কন্যাকে ধরতে গেল। কন্যা জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। একথা ভয়ে বাদশাকে বলল না। কয়েক দিন পর আবার স্নান করতে গেল। রাজপুত্র আজও ধরতে এলো। কন্যা তাড়াতাড়ি জলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে একপাটি জুতো পাড়ে ফেলে গেল। রাজপুত্র জুতোটা নিয়ে গেল ও গোঁসাঘরে খিল দিল। রাজাকে বলল, এই জুতো যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। রাজা বলল, তাই হবে। যেখানে কন্যার জুতো পাওয়া গিয়েছিল, মন্ত্রী সেখানে এক বুড়ী মেয়েকে দিয়ে একটা মনোহারীর দোকান করে দিল। আর এই দোকানের কিছু দূরে একটি ঘরে রইল সাত জন পালোয়ান। দোকান ঘরে একটা পায়রার খাঁচায় চারটে পায়রা রইল। এই পায়রা চারটি হলো সংকেত। এগুলি আকাশে উড়লেই বুঝতে হবে বুড়ী কন্যাকে ধরেছে। পালোয়ানরা ছুটে এসে কন্যাকে বন্দী করবে। কয়েকদিন পর কন্যা আবার এলো। দেখল একটা দোকান। কন্যা দোকানে গিয়ে তেল, সাবান, পাউডার দেখতে লাগল। বুড়ীর সঙ্গে ভাব হলো। ৫।৬ দিন এইভাবে কাটল। বুড়ী বলল, মা তোমার চুলে বহুদিন কাঁকুই পড়ে নি। এসো আজ চুল আঁচড়ে দিই। এই বলে চুলে কাঁকুই দিতে লাগল আর শেষের চুল ফাঁস দিয়ে ধরল। আর কৌশলে খুলে দিল পায়রার খাঁচার দ্বার। চুল আঁচড়ানো শেষ হতে না হতে পালোয়ানরা চলে এলো, আর কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে গেল। রাজপুত্র বিয়ে করতে চাইল। কন্যা বলল, বার বৎসর বাপখিটি পাতান থাকবে, তারপর বিয়ে হবে। রাজপুত্র বলল, বেশ তাই হবে।

খাঁদীবাঁদী আর ঘোষ খুঁজতে খুঁজতে সেই রাজ্যে গিয়ে হাজির হলো যে রাজ্যে কেশবতী বন্দী হয়ে আছে। সেখানে গিয়ে তারা কন্যার খোঁজ পেল। বললে, চল বাকি তিনজনের খোঁজে যাই। এদিকে চাষী ও ছিপওয়ালা নাগবতী যেখানে বন্দী হয়ে

আছে সেখানে এসে হাজির। নাগবতীকে দালানের চিলেকোঠায় বন্দী করে রেখে দিল। সে চিলেকোঠা হতে চাষী ও ছিপওয়ালাকে দেখে বুঝল, এরা তুইজন তার স্বামীর বন্ধু। সে তখন গোপনে একটা চিঠিতে সব কিছু লিখে একটা দাসীর হাত দিয়ে চাষী ও ছিপওয়ালার নিকট পাঠিয়ে দিল। চাষী ও ছিপওয়ালা গাঁয়ের শেষে মাঠে থাকতো। চিঠি পড়ে সব বুঝল। তারপর তারা বাকি তুই বন্ধুর খোঁজে বেরুল। এরাও যাচ্ছে, তারাও আসছে। পথিমধ্যে চারজনের সঙ্গে দেখা হলো। তারা নাগবতী যেখানে বন্দী হয়ে আছে সেখানে এলো। নাগবতী দূর হতে সব দেখল ও চিঠি লিখে জানাল মণিটা আগে উদ্ধার করতে হবে। সেটা আছে বুড়ীর কাছে। এরা চারজন মাঠে থাকে। তাদের দেখতে বহু লোক জড় হয়। বুড়ীর একটা ক্ষেপা ছেলে ছিল। সে ছেঁড়াচটের বোরাতে ভাঙাচুরা কুড়ায়। ঘোষকে দেখতে তার মতন। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এই কথা বলল। একদিন রাতে ঘোষ বুড়ীর ক্ষেপাপুত্র সাজল। ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় পরে কাঁধে চটের থলে নিয়ে সে বুড়ীর বাড়ী গেল। বুড়ীর ছেলে এসেছে। বুড়ী খুব খুশী। ক্ষেপাকে নিয়ে সে রাজবাড়ী গেল। ক্ষেপা চিলের ছাদে গিয়ে উঠল। বুড়ীর ছেলেকে কেহ কিছু বলে না, রাজার হুকুম। ঘোষ কন্যাকে বলল, একটা বড় রসা যদি ছুঁড়ে দিই সেটা চিলের জানালায় বেঁধে নেমে আসতে পারবে কি না? নাগবতী বলল, হ্যাঁ পারবো। এই কথা হলো। রাতে বুড়ীর ক্ষেপা বেটার পেটে বেদনা হলো। বিছানায় ছটফট করে। মা বলে কিসে ভাল হবে? ক্ষেপা বলে, ফকির এই বেদনার সময় তার পেটে একটা পাথর বুলিয়ে দিয়েছিল, আর অমনি ভাল হয়ে গিয়েছিল। বুড়ী তখন কন্যাকে বন্দী করার সময় যে পাথরটি খুলে নিয়েছিল, সেটি ক্ষেপার পেটে বুলিয়ে দিল। ক্ষেপার পেট ভাল হয়ে গেল। ক্ষেপা তখন পাথরটা নিল। কখন পেটে বাজে কে জানে। তারপর ভোর রাতে বুড়ী যখন ঘুমিয়ে তখন ক্ষেপা ছেঁড়া চটের

থলে নিয়ে পালিয়ে গেল। মণি উদ্ধার হলো। রাতে নাগবতীকে দড়ির সাহায্যে উদ্ধার করল। তারপর পাঁচজনে নদীর ধারে এলো। জলের ভিতরে মকরম বাদশা তখন মরে গিয়েছে। শুধু হাড় ক'খানা আছে। তারা জলের ভিতরে প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলো। একজন হাড় জোড়া লাগাল। একজন মাংস, চামড়া লাগাল। নাগবতী জীবনীমন্ত্র শিখেছিল। সে জীবন দিল। তারপর সেখানের ধনরত্ন খাঁদীবাঁদীর মাথায় দিয়ে কেশবতী যেখানে আছে সেখানে চলল। পথে যে রাজপুত্র নাগবতীকে বন্দী করেছিল, সে কন্যাকে দেখে লোক লস্কর নিয়ে ছিনিয়ে নিতে এলো। কন্যা বলল, মকরম বাদশা আমার স্বামী। খাঁদীবাঁদী টপ করে ধরে আর খায়। এই দেখে ভয়ে লোকলস্কর পালিয়ে গেল। বাদশা সে রাজ্য জয় করল। কেশবতী যেখানে বন্দী হয়ে ছিল, সেখানে বার বৎসর পূর্ণ হতে আর একদিন বাকি। সেখান হতে তাকে উদ্ধার করে সোনার কুমড়ো নিয়ে তারা আকরম শহরে পৌঁছিল। এই রাজ্যও তারা জয় করল। চার রাণীকে নিয়ে রাজা এলো আকরম শহরে, আর তিন রাজ্য দিল তিন বন্ধুকে — ছিপওয়ালা, চাষী ও ঘোষকে। খাঁদীবাঁদী ফিরে গেল তার বনে। সে ছোট বন ও বড় বনের অধিপতি হয়ে থাকল।

—৹—

[লোক কথাটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার, রাজুয়া গ্রাম নিবাসী আবুল কাশেম মির্জ্জার নিকট হতে সংগৃহীত।]

॥ কণ্ঠকমল পাখী ॥

বাদশার পর পর সাতটি শাদী। কিন্তু কোন রাণীরই সন্তানাদি হয় নি। বাদশা অনেক ওষুধ-পানি, অনেক ফকির, দাতা, আর সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নিয়েছিল। কিন্তু সন্তান হয়নি। তাই বাদশা মনের খেদে, অনুরাগে, সিংহাসন ছেড়ে বনে হাজির হলো। সেই বনে এক সাধু দরবেশ বসে বসে জপ করছে। সাধু দরবেশ রাজাকে বললে, "আয় বেটা আয়।"

রাজা ঃ "সেলাম, সাধু বাবা।"

সাধু ঃ আরে বেটা তোর সেলাম লিবার মত তো আমি লোক লই, তু এক রাজন, তোকে সেলাম সকলেই করে, আমিও করতাম। কিন্‌তুক আমি সাধু দরবেশ হয়েছি। তু অনুরাগে যার জন্যে এয়েচিস্, আবার তুকে ফিরে যেতে হবে সেই সংসারে।

বাদশা ঃ না, না আমি সংসারে ফিরে যাব না। ফিরে গিয়ে সে সংসারে আমার কোনো শান্তি নাই।

সাধু ঃ শান্তির জিনিস তুকে তুবো। সেই শান্তির জিনিস লিয়ে তুকে সংসারে ফিরে যেতে হবে। আমার এই হাতের "আশা"-টি লিয়ে যা। ঐ ফুল বাগানের ঈশেন কোণ, সিখানে দেখবি একটা মরা আমের গাছ আছে। বার বছর ঐ গাছ মৃত। পাতা নাই, ফুল নাই, ফল নাই। ঐ গাছের গোঁড়ায় যেয়ে দেখবি একটা থোকাতে তিনটি আম আছে। আমার এই "আশা" দিয়ে এক ফাব্‌ড়ে য'টা আম পড়বে, তা আমার কাছে লিয়ে আয়। তবে তু' ফাব্‌ড় মারবি না।

রাজা সাধু দরবেশের 'আশা' হাতে নিয়ে বাগানের ঈশেন কোণে মরা আমগাছ তলায় গিয়ে হাজির হলো। রাজা মনে মনে

বলল একটি ফাবড়ে যা'পড়বে সেইটে নিয়ে যাব সাধু বাবার কাছে।

একটি ফাবড় মেরে রাজা একটি আম পেল। আমটি লিয়ে সাধুর কাছে গেল।

সাধু ঃ আমটি লিয়ে রাজার হাতে দিয়ে বললে, বাড়ী ফিরে চলে যাও। তোমার সাতটি রাণীকে নদীতে চাঁন করিয়ে সুচুলে, সুকাপড়ে পরিবেশন করে খাওয়াবে।

রাজা ঃ সাধু বাবা আমার একটি রাণী যে ঝগড়া ক'রে আলাদা বাড়ীতে আছে।

সাধু ঃ সগ্গের দেবতা তুমি স্বামী। তুমি ডাকলে সে নিশ্চয়ই আসবে। অভিমান করবে না। সাধুর কথা শুনে ফল হাতে রাজা নিজের দেশে ফিরে গেল। বাড়ী গিয়ে রাজা বড় রাণীর হাতে ফলটি তুলে দিয়ে বলল, বড় রাণী, এটি সাধুর দেওয়া অমৃত ফল, তোমরা সাত বুনেই ভাগ বণ্টন করে খাবে। ফল পেয়ে ছয় রাণীর খুব আনন্দ হলো।

ছয় রাণী গোসল করতে গোসলখানায় গেলেন। আনন্দের সাথে বড় রাণী দাসীকে বলছে, ছোট রাণীকে গিয়ে ডেকে আন। কিন্তু ডাকবার আগেই সেই ফল বাট্‌ন হয়ে গেছে। ছয় রাণী কিছু কিছু মুখে খেতে লেগেছে। শেষের দিকে দাসীর মুখে শুনে ছোট রাণী ছুটে এলো। এসে দেখল সে ফল শিলে নেই। তাই ভগবানকে ধরে সেই শিলটি ধুয়ে জল খেল। ঐ ফল খাওয়ার পর এক এক বছর এক এক রাণী গর্ভবতী হলো। যে রাণী ভগবানের নাম করে শিল ধোয়া জল খেয়েছিল, সাধুবাবা সেটা জানতে পেরে তার গর্ভে এক সাধক পুরুষকে দিল। দশমাস দশদিন পর এক এক করে সাত রাণীর প্রসব হলো। সবই পুত্র। কিছুদিন বাদ সেই ছেলেদেরকে পাঠশালে পাঠাল। মন দিয়ে লেখাপড়া ছয় ছেলে করে, কিন্তু ছোট রাণীর ছেলে খেলাধুলা করে, পাঠশালায় যায় না।

[দুই]

রাজা ঃ দেখ মন্ত্রী, আমার যে এক এক করে সাধুর আশীর্ব্বাদে সাতটা পুত্র হয়েছে। সাতটা পুত্রবধূ আসবে আমার ঘরে। আর আমার বসে চলবে না এ সংসারে। আমি ইন্তাম করেছি আগামী কাল বিদেশে বাণিজ্যে যাব। রাজা মন্ত্রীকে বলল, আমার যে দাসদাসী আছে, তাদের মনের যার যা আশা, তা লিখে নিতে হবে। রাজা বড় রাণীর নিকটে গেল। বড় রাণী বললে একটি শাড়ী ও চুরি। মধ্য রাণী বললে, সায়া, ব্লাউজ, স্যাণ্ডেল। ছয় রাণী এই সব বললে। টাকা পয়সা নিয়ে রাজা জাহাজ ছেড়ে দিলে। জাহাজ ছেড়ে দিলে, জাহাজ কিন্তু চলে না।

রাজা ঃ দেখ দাঁড়ী মাঝি, জাহাজ চলছে না কেন ?

দাঁড়ী মাঝি ঃ দেখুন আপনার খাতায় ভুল আছে।

রাজা ঃ দাঁড়ী মাঝিকে তৎপর খাতাটি পড়ে শোনালেন।

দাঁড়ী মাঝি ঃ বাদশা নামদার ; আপনার ছোটরাণী বা ছোট ছেলের কথা শুনলাম না খাতায়।

রাজা ঃ ঠিকই বলেছ দাঁড়ী মাঝি, যাকে যত ভালবাসি সে ততই অন্তরালেই থাকে। যাই, ছোট রাণীর কাছ থেকে ফিরে আসি।

রাজা ঃ ছোট রাণীর কাছে চলে গিয়ে বলল ঃ আমি বিদেশে বাণিজ্য করতে যাব। তুমি কি চাও বল।

ছোট রাণী ঃ আমি কিছুই চাই না। তবে আল্লার নাম করতে একটি জায়নামাজের পাটি আর তসবীকাঁটি আরব থেকে আনবেন।

রাজা ঃ বেশ তাই আনবো, কিন্তু তোমার ছোট ছেলে কই ?

ছোটরাণী ঃ দেখুন গা, রাস্তায় কোথায় খেলা করতে গিয়েছে, ক্ষ্যাপার মন তো !

রাজা ঃ ছেলের খোঁজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। রাজা রাস্তায় এসে দেখছে, ছেলে ধূলো নিয়ে খেলা করছে।

ছেলে ঃ তাড়াতাড়ি বাবাকে দেখে ধূলো ঝেড়ে পায়ে সালাম দিল।

বাবা ঃ বাবা ক্ষ্যাপা, আমি যে বিদেশে যাব, তোমার জন্যে

'কি' আনবো বল তো ?

ছেলে : আমার জন্যে কিছুই আনতে হবে না। কিছুই চাই না।

রাজা : তাহলে, আমাকে সকলে নিন্দা করবে। তোমার ছয় ভাইয়ের আনা হচ্ছে, তুমি কি চাও, বল বাবা।

ছেলে : বাবা, আমি যা বলব তা সত্যিই আনবে আমার জন্যে ?

রাজা : নিশ্চয়ই আনবো। আনবো বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি :

: গান :

কি বলবো গো, বলবো বাপজান
কি বলবো গো আমি।
আমার লেগে আনবেন বাপজান
কণ্ঠকমল পাখী।

রাজা : বেশ বাবা, তাই-ই আনবো তোমার জন্যে।

রাজা : তারপর জাহাজে গিয়ে চাপল, আর দাঁড়ী মাঝিকে হুকুম দিল, ছাড় জাহাজ, ছাড়।

জাহাজ ছেড়ে দিল। দাঁড়ী মাঝি আর জাহাজ নিয়ে রাজা বহু দূর দেশে চলে গেল।

বাদশার ব্যবসার লগ্ন খুব ভাল। তারপর এক এক দাস দাসী, সাত রাণীর অর্ডার করা মাল রাজা কিন্‌তে লাগলো। বাদশা মনে মনে ইন্‌তাম্ করলে এখন দেশে ফিরে যাব। আর ফিরে এসে আবার ব্যবসা করবো।

দাঁড়ী মাঝিকে হুকুম দিল : জাহাজ ছাড়।

কিন্তু জাহাজ চলে না।

দাঁড়ী মাঝি : সেলাম বাদশা নামদার, আজ আপনার জাহাজ চলছে না কেন ? আমার মনে হয়, কোন মাল কিন্‌তে আপনার ভুল হয়েছে। মাল কেনা খাতাটা আমাকে একবার পড়ে শোনান। কিন্তু রাজা পড়ে তাই শোনালে। শুনে সর্দ্দার বললে, বাদশা নামদার ! দেখছেন ? কই-আপনার ছোট ছেলের কেনা শুনলাম না।

রাজা : তাইতো। চল ফের বাজারে যাই। বাজারে গিয়ে

পাখীর সন্ধান করি। কিন্তু বাজারে পাখীর সন্ধান করতে পারলো না।

ঃ গান ঃ

রাজা কাঁদ্ছে ঃ আর কি করিব, কোথায় যাব
ও আজ কি করি আমি,
কোথায় গেলে পাখী পাব,
কি দিয়ে ক্ষ্যাপাকে বোঝাব,
ও হায়! কি করিব আমি?

এদিকে এক বৃদ্ধা দুখিনী গোবর কুড়ুতে দরিয়ার ধার ধরে চলে আসছে।

দুখিনী ঃ সেলাম বাদশা নামদার! আজ আপনি দরিয়ার ধারে বসে কিসের জন্য কাঁদ্ছেন?

রাজা ঃ মা, আমি কেন কাঁদছি, তোমাকে বললে কি আমার দুঃখ নিবারণ হবে?

দুখিনী ঃ তা হলেও হতে পারে, শাহজাদা।

রাজা ঃ মা, আমার একটি ছেলে আছে, খুব আনন্দের দুলাল। তার জন্যে একটা কণ্ঠকমল পাক্ চাই। সে পাখী কোথায় মিলবে বলতে পারো?

দুখিনী ঃ দেখুন শাহজাদা সাতদিন বসে যদি এখানে কান্না কর, পাখী কি মিলবে?

রাজা ঃ কোথায় মিলবে মা?

দুখিনী ঃ তিনধার জলাকার। এই সে-পাশে বিয়াবন এর নাম। এই বনে এক কাঠুরিয়া বাস করে। তার কাছে গেলে পাখীর খবর দিতে পারবে।

রাজা ঃ সে পথ কোনদিকে মা?

দুখিনী ঃ আসুন শাহজাদা আমার সামনে, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। সোজা পথ ধরে তারা চলে গেল সেই বিয়াবনের মাঝখানে। সেখানে একটি কাঠুরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

বাদশাকে দেখে কাঠুরিয়া সেলাম দিল।

কাঠুরিয়া ঃ বাদশা নামদার, কি দরকারে এখানে গরীবের কুটীরে হাজির হলেন ?

রাজা বললো, বাবা! তোমার এই বাগানে শুনেছি কণ্ঠকমল পাক্ পাওয়া যায়।

কাঠুরিয়া ঃ পাক্ তো পাওয়া যায় কিন্তু — !

রাজা ঃ বাবা একবার গাছে ওঠো তো। দেখলে হতো বাচ্চা আছে কি না ?

কাঠুরে ঃ শাহজাদা আজ অবেলা। আগামী কাল দেখতে পাবি। আমার কৈফৎ মত হলে দেখতে পাবি।

রাজা ঃ কি কৈফৎ বাবা কাঠুরি ?

কাঠুরি ঃ রাজন্! আমার এই বাগানে ৮০ মণ তুলো গাদিয়ে দিতে হবে। তারপর আমি আছে কিনা দেখাবো।

রাজা ঃ সঙ্গী, সাথী, লোক নিয়ে রাজা জাহাজে ফিরে এলো। তারপর উজিরের সঙ্গে যুক্তি করছে রাজা।

রাজা ঃ দেখ উজির, এক পাক্ কিনতে মালমসলা সবই তো বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রি হয়ে গেলেও পাক্ আমার চাই। না হলে আমি বাড়ী যাব না, জাহাজ চলবে না, জাহাজের মাল বিক্রি করে ৮০ মণ তূলো কিনতে হবে। ৮০ মণ তূলো কিনে লোকদ্বারা তার পরদিন বাগানে হাজির হলো সকাল বেলায়। সেই তূলো দিয়ে কাঠুরি বাগান সাজাল। রাজার লোক লস্কর সব জাহাজে চলে গেল। থাকল রাজন ও মন্ত্রী কাঠুরির ঘরে।

কাঠুরি ঃ কাপড় ছেড়ে গাছে উঠল। এ-গাছ ও-গাছ সবগাছ খুঁজল। কোন বাসাতেই বাচ্চা নেই।

গাছ থেকে তখন কাঠুরি রাজাকে বলছে ঃ বাদশা নামদার, বাসায় বাচ্চা তো নেই! তবে আপনার সৌভাগ্য কপাল যদি হয়, তাহলো "তা"-দেওয়া ডিম এক জোড়া রয়েছে। এই বলে কাঠুরি ডিম দুটি 'আলগোছে গড়িয়ে তূলো ভরা কাপড়ে ভরে নিল। এধারে সাত

সমুদ্দুর তের নদী পারে, যে পাখী ছুটোর ডিম তারা চরাটে গিয়েছে। পাখীর ফিরে আসার ডানার শব্দ কাঠুরে পেল। পাওয়া মাত্র সেখান থেকে হাত, পা ছেড়ে ডিম ছুটো নিয়ে তুলোর উপর পড়ল। তারপর তুলোর ভিতরে ভিতরে রাজা ও মন্ত্রীকে সাথে নিয়ে, নিজের ঘর নিদর্শন করে সেখানে ঢুকলো। কিন্তু ঘরটি বাগান ছাড়া অনেক তফাতে ছিল। পাক্ ছুটো এসে দেখছে, বাসায় ডিম নাই। তখন রাগে ডানার ঝাপটে বাগানের গাছপালা ভেঙে চুরমার করে দিল। বাগানে যে ৮০ মণ তুলো সাজান ছিল। তার কোন চিহ্নতো নাই। সব কম্নে উড়ে গিয়েছে। পাক্ ছুটো ক্লান্ত হয়ে ফারাকে যেয়ে বসল।

কাঠুরিয়া তখন ঘর খুলে রাজাকে দেখালো, দেখুন শাহজাদা গাছের উপরে থাকলে আমার কি অবস্থা হতো।

মন্ত্রীঃ তাইতো শাহজাদা ঐ যে ৮০ মণ আপনার কেনা তুলো তার কোন চেন্নত-ই নাই। ঐ কাঠুরি কে কিছু উপহার দেওয়া উচিত।

রাজাঃ আমার উপহার দেবার কিছুই নাই। পরে যদি আসি আবার উপহার দেওয়া যাবে। এই বলে কাঠুরিব কাছে ডিম ছুটো নিয়ে রাজা রওনা হলো। আসার পথে সেই ডিমছুটোর মধ্যে একটি বাচ্চা হলো তার একটি "ব" পড়ে গেল। তারপর নিজের দেশের ঘাটে গিয়ে জাহাজ লাগলো। অর্ডার দেওয়া মাল সব যে যার নিয়ে নিল। ক্ষেপা পাখী পেয়ে খুব খুশী।

॥ তিন ॥

কণ্ঠকমল পাক্ পেয়ে ক্ষেপা, তাকে খাওয়ায়, আর তাকে নিয়ে খেলা করে। একদিন তার মাকে বলছেঃ মা আমাকে ছুটো কাপড়ের পোরো করে দাও, ধুলো ভরবো। তার মা তাকে ছুটো পোরো করে দিলো। সেই পোরো নিয়ে ক্ষেপা ধূলো ভরে ছালার মতন পেকের ছু'পিঠে চাপায়। পাক্ ধূলোর পোরো নিয়ে ছুটে বেড়ায়। এমনি করে ৫ সের, ১০ সের, ১৫ সের, তারপর ৩০

সের ধুলো নিয়ে পাক্ মাটি ছাড়া হয়ে উড়তে লাগলো। কিন্তু ক্ষেপা দেখলো তাইতো, পাক্ হয়তো পালিয়ে যাবে। তাই একদিন ঝোলা গুলো ফেলে দিল। তারপর বনের সাধুবাবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে ক্ষেপা পাকের উপরে চাপল্। মাটি ছাড়া হয়ে পাক্ বহু দূর দেশে উড়ে বেড়াতে লাগলো। ফের সাধু বাবার আশীর্ব্বাদে পাকের মুখে কথা হলো।

পাখী ঃ ক্ষেপা, তুমি এক কাজ কর। আমাকে এক তোলা করে ঘি প্রত্যেক দিন খাওয়াতে হবে।

ক্ষেপা ঃ অত ঘি আমি কোথায় পাব ?

পাক তখন বলছে ঃ আমি যত তোলা ঘি খাবো, তত তোলা সোনা লাদবো।

ক্ষেপা ঃ আনন্দিত হয়ে ছুটে বাড়ী এলো। সব কথা মাকে বললে। তারপর ক্ষেপা, তার মার কাছে বলছে ঃ মা, বড় মা'দের বাড়ী যাও। আমার একটু ঘিয়ের দরকার।

মা বলছে ঃ বাবা, তুমি যাও।

ক্ষেপা বলছে ঃ তুমি যাও তো, ঝগড়া করে তো আমি দেখে নিবো। ছেলের কথার অবাধ্য না হয়ে মা রাজবাড়ীর দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। মধ্যম রাণী, ছোট রাণীকে দেখতে পেল। মধ্যম রাণী তখন বড় রাণীকে বলছে, ছোটরাণী বার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেন ?

বড় রাণী ঃ কি নিবে জিজ্ঞাসা কর।

ছোট রাণী ঃ দিদি, তোমাদের ছোট ছেলে একটু ঘি চাইছে। পুরাতন একটা ঘিয়ের জালা ছিল। তাতে পাঁচ সের ঘি ছিল। সেটা তারা ছোট রাণীকে দিল। ছোট রাণী ঘি নিয়ে বাড়ী এলো। এই ঘি পাক্ রোজ এক তোলা করে খায়। আর রোজ এক তোলা করে সোনা লাদে। এমনি করে পাক্ পাঁচ সের সোনা লেদে দিল।

পাখী ঃ ক্ষেপা তু তো মাটির ঘরে আছিস। তু একটা ভাল দালান বাড়ী কর। পাখীর কথা শুনে ক্ষেপা তিনতলা দালান বাড়ী করল।

পাখী ঃ ক্ষেপাকে বলছে আর তিনটে কাজ বাকী থাকল।

ক্ষেপা ঃ কি তিনটে কাজ বাকী থাকল ?

পাখী ঃ এই সোনা গালিয়ে আমার গলা-বেড়া ঘুঙুর, আর পদ নূপুর। আর তোমার মাতার সোনার কামকরা জরীর পোশাক।

ক্ষেপা এ সব বানিয়ে আনল। পরের দিন রাস্তায় খেলা করছে ক্ষেপা। এদিকে তার ছ'ভাই একটি রাজকুমারীর পত্র পেল। কিন্তু সেই রাজকুমারী বরমাল্য দেবে। এরা ছয় ভায়ে যুক্তি করে বললে, যে আমরা ছয় জনায় রাজ সভায় যাব। যাক, আমাদের এক জনার গলায় তো মালা পড়বে! ছয় ভাই চলে যাচ্ছে।

ক্ষেপা ঃ তাদের জিজ্ঞাসা করলো, ভাই কোথায় যাবে ?

ছয় ভাই বলছে ঃ যেথায় যাই তোর এতো খোঁজ কি রে ?

ক্ষেপা ঃ ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে এলো। মাকে তখন শুধাচ্ছে।

ক্ষেপা ঃ ভাইরা কোথায় গেল বলতে পার, মা ?

মা বলছে ঃ ভাইরা একটা রাজসভায় গেল।

ক্ষেপা বলছে ঃ আমি যেতে পারি, মা ?

মা বলছে ঃ না, যেহেতু তুমি অশিক্ষিত ছেলে, ভাইদের অপমান হবে। ক্ষেপা তখন খুব কাঁদাকাটা করতে লাগল।

মা কান্না শুনে বলছে ঃ যাবে যাও, চাঁন করে এসো। হ্যাঁ মা, চাঁন করে আসতে হবে ?

মা বলছে ঃ ভাল কাপড় চোপড় পরবে বাবা, গায়ে ধূলো গুঁড়ো লেগে আছে।

মাকে ক্ষেপা বলছে ঃ "আমি এখন ডাঙ্গায় চাঁন করছি, তুমি দেখ। বনের সাধু বাবাকে স্মরণ করে বুকে থাপ্পড় দিল ক্ষেপা। আর ক্ষেপার শরীরটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। তা দেখে মা বেহুঁস হয়ে পড়ে গেল। ক্ষেপা মায়ের মুখে জল দিয়ে হুঁস করল। মা হুঁস পেল। তখন তাড়াতাড়ি মা খাবার এনে ক্ষেপাকে দিলে। ক্ষেপা খাবার খেয়ে পাখী লয়ে রওনা হলো। পাখীকে সাজিয়ে পাখীর উপর চাপল। আকাশে পাখী উড়তে লাগল। পাখী ছয় ভায়ের মাথার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল।

ছয় ভাই তখন বলছে ঃ   দেখ ভাই, আমাদের উপর দিয়ে শিব-তুর্গা উড়ে গেল । নিশ্চয় রাজকুমারীর মালা আমাদের গলে পড়তে হবে । সবার আগে ক্ষেপা যেয়ে বৈমুখ হয়ে রাজ সভার বাইরে বসে পড়ল । তারপর তার ছয় ভাই রাজ সভায় প্রবেশ করল । সুবুনের থালা হাতে রাজকুমারী শিব তুর্গার কাছে গেল ।

রাজকুমারী শিব তুর্গাকে বলছে ঃ আমি যার জন্য ভজছি তাকে যেন স্বামী রূপে বরণ করতে পাই । শিবতুর্গা কিন্তু কন্যার হাতে মালা দিল । এই মালা যার গলে বসবে, সেই তোমার পতি হবে ।

মালা নিয়ে রাজকুমারী রাজ সভায় নাচতে নাচতে সকলের গলায় এক একবার করে মালা দিল । কিন্তু মালা কারুর গলায় ঢুকল না । রাজকুমারী ফিরে শিব তুর্গার কাছে গেল । মা এ মালা কারও গলায় হলো না ।

শিবতুর্গা তখন কন্যাকে বলছে ঃ তুর বর রাজ সভার বাইরে আছে । সভায় নাই । তাড়াতাড়ি করে মালাটি নিয়ে রাজকুমারী রাজ সভার বাইরে এলো । দেখল একটা ক্ষেপা বৈমুখ হয়ে বসে আছে । শিবতুর্গার বলে তার গলায় মালা দিল । যেমন মালা তেমনি গলা । রাজ সভার লোক সবাই হাততালি দিয়ে বলছে, করল কি, এক ক্ষেপার গলায় মালা দিল ! তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর বাবা ছুটে এসে সভার তুয়োরে জোড় হাত করে দাঁড়াল ও বলল, আজ ইচ্ছাবর মাল্য হয়নি, আবার কাল হবে । যে যেমন সকলে খাতায় নাম সই করে দাও । কিন্তু এরা ছয় ভাই সাত ভাইয়ের নাম ভুলে লিখে দিলে । নাম সই হলে সকলে রাজ সভা থেকে চলে গেল । রাস্তায় আসতে আসতে ছয় ভাইয়ে বলছে, তাইতো আমরা একটা নাম বাড়িয়ে ফেলেছি ।

এক ভাই বলছে ঃ তাতে ক্ষতি কি ? আমরা ভাইতো সাতটাই আছি ।

আর এক ভাই ঃ এই কথা ক্ষেপাকে জানাতে হবে । গুনতিতে না পেলে গর্দান যাবে একথা রাজা বলে দিয়েছে ।

পথে দেখছে ক্ষেপা গাঁয়ের বাইরে রাস্তায় খেলা করছে। ছয় ভাই বলছে: ভাই ক্ষেপা, কাল তুকে সঙ্গে করে রাজ সভায় নিয়ে যাব।

ক্ষেপা বলছে: যদি শরীর ভাল থাকে তাহলে যাব।

পরদিন সকালে ভাইরা যখন রাজ সভায় যাবার ইন্‌তাম করছে, ক্ষেপা তখন সাধু বাবাকে স্মরণ করল ও বলছে যে, বাবা আমার শরীরকে একবারে কাঁকুড় ফাটা করে দাও। তাই সাধু বাবার আশীর্ব্বাদে ক্ষেপার শরীরে পুঁজ, রসানী ঝরতে লাগল। ছয় ভাই ক্ষেপাকে নিতে এসে দেখছে, ক্ষেপার অবস্থা খারাপ।

ভাইদের দেখে ক্ষেপা বলছে: আমার আর যাবার শক্তি নাই। বিধেতা আমাকে মেরেছে।

ছয় ভাই বলছে: ভাই, যদি আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাই!

ক্ষেপা বলছে: কিন্তু ফেলে আসবে না তো!

ভাইরা বলছে: ভাইরে ভাই, তাই ফেলিয়ে কি আসা হয়!

বড় ভাই: প্রথমে ক্ষেপাকে কাঁধে নিল। এইভাবে ছয় ভাই রাস্তা ভাগ করে সেই রাজ সভায় পৌঁছাল। রাজ সভায় ছয় ভাই হাত পা ধুয়ে বসে পড়ল। ক্ষেপা বাইরে বসে থাকল।

কন্যা নাচতে নাচতে এসে সকল রাজপুত্রের গলায় মালা দিল। কিন্তু মালা কারো গলায় হলো না। অনেক চিন্তা করে রাজকুমারী ক্ষেপা আতুরের গলায় মালা দিল। যেমন মালা, তেমনি গলা। সকলে হাততালি দিয়ে বলছে: এ রাজার ঘরে জল খাওয়া হবে না। কারণ রাজার মেয়ে এক আতুরের গলায় মালা দিয়েছে। রাজা মনের খেদে সবাইকে গলা ধাক্কা দিয়ে রাজ সভা হতে বার করে দেবার হুকুম দিল। রাজ সভা হতে সকলে চলে গেল। কিন্তু ছয় ভাই বলছে, আমরা ভাইকে না নিয়ে যাব না। এই ছয় ভাইয়ের কথা রাজা শুনে, রাজা একটু স্থির হয়ে বলছে, এদের বংশ ভাল, রাজার ছেলে বটে।

রাজা তখন সাত ভাইকে যত্ন করে, পরিবেশন করে আনন্দের

সঙ্গে খাওয়াতে লাগল। রাত্রি বেলায় ছয় ভাই যুক্তি করে বলাবলি করছে, ক্ষেপা যদি বৌ নিয়ে শহরে যায়, তা'হলে লোকে আমাদের নিন্দা করবে। যেমন করেই হোক মাঠের মাঝখানে যে ইন্দারা আছে, সেখানে ক্ষেপাকে ফেলে দিয়ে বৌ নিয়ে আমরা চলে যাব দেশে।

তাই সাত ভাই বৌ নিয়ে পাল্কীতে করে যখন ইন্দারার কাছে এলো, তখন ক্ষেপাকে তারা ইন্দারায় ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এদিকে বড় গাছের ডালে সেই পাক্ বসে ছিল ক্ষেপার জন্যে। পাক্ সব দেখলো। দেখলে ছয় ভাই যাচ্ছে, কিন্তু সাধক ক্ষেপা নাই। পাক্ তখন রাগে উড়ে যেয়ে ছয় ভাইকে ছয় ঠোক্রে খেয়ে নিল। তখন পাল্কীর কাহাররা পাখীটাকে বলছে, আমাদের দোষ নাই, আমাদের হুকুম দিয়েছে, চলতে লেগেছি। পাক্ তখন বলছে, অমি না আসা পর্যন্ত এক পা লড়বি না, লড়লেই সকলকে খেয়ে লেবো। পাক্ ফিরে গিয়ে আবার বড় গাছে বসল:

: গান :

ক্ষেপা : ও রে আমার সোনার পাখী
তুই নয়নের হিয়ে।
বড়ই সঙ্কটে পড়েছি পাখী
উদ্ধার কর এসে।

পাখী : আর ভেবো না, আর ভেবো না রাজা
আর ভেবো না তুমি,
চিলের মতন ঝাপট মেরে
তুলে লোব আমি।

পাখী ইন্দারা থেকে সাধক ক্ষেপাকে ঝাপট দিয়ে তুলে নিল। ক্ষেপা তখন পাককে বলছে: আমার সেই ছয় ভাই কোথায় গেল? পাখী তখন ক্ষেপাকে বলছে: আমি রাগে তোমার ছয় ভাইকে খেয়ে নিয়েছি।

ক্ষেপা বলছে ঃ ঠিক করেছিস্, যেমন শয়তান, তেমনি হাজুক।
তারপর ক্ষেপা কাহারদের বলছে ঃ তোল পাল্কী তোল।
পাল্কীতে করে বৌ নিয়ে ক্ষেপা বাড়ী চলে এলো।

ছয় রাণী তখন রাজ বাড়ীতে ক্ষেপার বৌ আনার কথা শুনে খুব চিন্তায় পড়ে গেল।
তারা তখন বলছে ঃ তাইতো ছয় শিক্ষিত ছেলে, কোথায় পড়ে রইল, আর সামান্য ক্ষেপা সাদি করে নিয়ে চলে এলো।
বড় রাণী তখন দাসীকে বলছে ঃ ডাকতো শাহজাদাকে।
দাসী তখন শাহজাদাকে ডাকতে গেল। শাহজাদা তখন রাজ কাজ করছিলো। দাসীর কথা শুনে চটপট বাড়ীর দিকে ফিরে এলো।
শাহজাদা বাড়ী এসে বড়রাণীকে বলছে ঃ আমাকে কিছু বলছো?
রাণী বলছে ঃ বলব না? ছয় ছয় শিক্ষিত ছেলে, ইচ্ছাবর করতে গিয়ে কোথায় থাকল, তার কোন খোঁজ রেখেছেন?
রাজা ঃ আমি খোঁজ না রাখলেও আমার খোঁজ রাখার লোক আছে। আমার সেই ছোট ছেলে আনন্দের তুলাল বৌ নিয়ে ফিরে এসেছে শুনছি। তবে আমি ছোটরাণীর বাড়ী গিয়ে ছেলেকে একটু জিজ্ঞাসা করে আসি।

অনেকদিন হলো শাহজাদা ছোটরাণীর বাড়ী যায় নাই। বাড়ী যাওয়া মাত্র ছোটরাণী শাহজাদার পায়ে সালাম দিল। সালাম দেওয়া বাদ একটা আসন দিল বসতে। বসবার আগে সেই ছোট ছেলে এসে বাবার পায়ে সালাম দিল। ছোট বৌমাও সালাম দিল। সালাম পর শাহজাদা আসনে বসল। অনেকদিন ছোটরাণী শাহজাদাকে খাওয়ায় নি। রাণী এক গ্লাস গোলাপের সরবত রাজাকে এনে দিল।

রাজা তখন ছোট ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, বাবা, তোমরা যে সাত ভাই গিয়েছিলে, তাদের কি হলো?
সাধক ক্ষেপা তখন বাপকে বলছে ঃ বাবা, আমরা এক সঙ্গে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছ ছেড়ে ছয়ভাই বন্ধুর বাড়ী গিয়েছে।

হয়তঃ কাল সকালের দিকে বাড়ী আসবে। তখন ছয় রাণীর বড় রাণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করছেঃ আমাদের ক্ষেপা কি বললে ছয় ভাইয়ের কথা?

রাজা: তারা বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে, কাল সকালে আসতে পারে।

ছয় রাণী বলছেঃ তাইতো কখন তারা আসবে, আর কখন তাদের মুখ দেখবো, ছয় ছেলের জন্যে অন্তর কাঁদে।

ক্ষেপা চিন্তা করছেঃ তাইতো, ছয় ভাইকে তো পাখী খেয়ে নিয়েছে। কি করি? ভাইদের কি আর ফিরে পাব না?

ক্ষেপা তখন চটপট পাক্‌কে বলছে, আরে পাক, আমার ছয় ভাই কি বেঁচে আছে?

পাখী শুনে বলছেঃ হ্যাঁ। বেঁচে আছে। তু যখনি হুকুম দিবি, তখনি উগ্‌লে দিব। সব পেটের মধ্যে নড়ছে।

ক্ষেপা বলছেঃ কাল ভোরের দিকে ঝুজ্‌কি থাকতে থাকতে উগ্‌লে দিবি। পাখী তখন ভোরের দিকে ঝুজ্‌কি থাকতে থাকতে ছয় ভাইকে গলা লাকড়ান দিয়ে উগ্‌লে দিল। ছয় ভাই তখন ছাড় পেয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী চলে গেল। ছেলেদের মুখে সব শুনে ছয় রাণী তখন কাঁদা কাটা করছে।

বড় রাণী বলছেঃ কে এমন আছে আমাদের চেয়ে বড় যে তোদের হাজতে দিল?

বড় ছেলে বলছেঃ মা, কে আর দেবে? সেই ছোট ছেলে ক্ষেপা, আমাদের হাজতে দিয়েছিল।

বড় রাণীঃ তার তো বাবা, হাজত নাই।

বড় ছেলেঃ বাবা যে পাক তাকে কিনে এনে দিয়েছে, সেইটাই তার হাজত। আমাদের ছয় ভাইকে খেয়ে নিয়েছিল সেই পাক্‌। কথা শুনে বড় রাণী চম্‌কে উঠল। আর মনে মনে বলছে, তাইতো, কোন দিনতো আমাদেরও খেয়ে নিতে পারে! পাক্‌টা মারবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে এখন থেকে।

একটি দাসীকে ডেকে বড় রাণী বলছে : বারবাড়ী থেকে এক বোঝা শণের কাঠি নিয়ে আয়গা তো। তারপর সেই শণের কাঠি বিছানার তলায় দিয়ে বড় রাণী তার উপর শুয়ে একাত-ওকাত করতে লাগল। যত পাশ ফিরতে লাগল, তত কাঠিগুলো মড়মড় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি রাজাকে গিয়ে একটা দাসী বলছে, শাহজাদা বড় রাণীর হাড় মড় মড়ে বাত হয়েছে।

রাজা চমকে উঠে বলছে : হঠাৎ হয়েছে ?

দাসী বলছে : হ্যাঁ, শাহজাদা, বড় রাণী হয়ত বাঁচবে না।

শাহজাদা বলছে : বলিস্ কি ? তখন শাহজাদা একটি কর্মচারীকে ঘোড়ায় ভিড়িয়ে দিয়ে বড় ডাক্তারকে ডাক দিল। ডাক পেয়ে ডাক্তার চটপট এসে বাদশাকে সালাম দিল।

বাদশা বলছে : শিগ্রী যাও, খাস মহলে বড় রাণী বাঁচে কি না ?

বড় রাণী তখন ডাক্তারের হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বলছে, তুমি রাজাকে বলবে, এ রোগের ওষুধ আমার কাছে নাই। তবে একটা কণ্ঠকমল পাক্ আনিয়ে কেটে, তার মাংস খাওয়াতে হবে, আর তার রক্তে রাণীকে চাঁন করাতে হবে, তবেই বাঁচবে। ডাক্তার তখন টাকা নিয়ে রাজার কাছে ফিরে এলো।

রাজা : কি খবর ডাক্তার ? রুগী কেমন দেখলে ?

ডাক্তার : শাহজাদা এ রুগী বাঁচান দায়। বাঁচতে পারে না। যত শিগ্রি পারেন একটা কণ্ঠকমল পাক্ এনে কেটে তার মাংস আর তার রক্তে চাঁন করাতে হবে। তবে যদি বাঁচে। এই কথা বলে ডাক্তার চলে গেল। রাজা কথা শুনে ভুম করে কোনো কথা না বলে মহলে ফিরে এলো।

রাজা রাণীকে বলছে : বড় রাণী তোমাকে বাঁচান দায় হবে।

রাণী : ওষুধ কি ডাক্তার বাবুর কাছে নাই ?

রাজা : না, কোন ওষুধ নাই। একটা কণ্ঠকমল পাকের মাংস খাওয়াতে হবে, আর তার রক্তে গা ধুয়াতে হবে।

রাণী শুনে চটপট বলছে : আমাদের ছোট ছেলের কাছে যাও না,

ওয়ার তো একটা পাক আছে। রাণীর কথা শুনে রাজা বলছে, ছোট ছেলের কাছে যাই, তবে দেবে না বোধ হয়, তার বহু কষ্টের পাক্।

রাজা তখন ছোট ছেলের মহলে গিয়ে বলছে, বাবা, তোমার বড় মা বাঁচবে না, বোধ হয়, তার কোন ওষুধ নাই।

সাধক ক্ষেপা শুনে বলছেঃ শুনেছি বাবা, আর তার ব্যবস্থাও করেছি।

রাজাঃ কি ব্যবস্থা, বাবা?

ক্ষেপা বলছেঃ গরম জলে ল্যাক্ড়া ডুবিয়ে তা দিয়ে গা মুছিয়ে দাও, আর ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে দাও। আর পুরাতন বিছানা পাল্টিয়ে নতুন বিছানা পেতে দাও, রোগ সেরে যাবে।

রাজাঃ তা নয় বাবা, ও ভাবে রোগ সারবে না। তোমাকে একটা পাক্ এনে দিয়েছি, সেইটা দাও। আমি বাণিজ্যে গিয়ে ওমন দুটো পাক এনে দেবো। সাধক ক্ষেপা শুনে বলছে, আচ্ছা বাবা, তোমাকে কাল বলব।

বাদশা ফিরে গিয়ে বড় রাণীর কাছে গিয়ে বলছে, সে পাখী দেবে না, তবে সে বলছে গরম জলে গা মুছাতে, আর ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুতে। আর পুরানো বিছানা পাল্টিয়ে নতুন বিছানা করে দিলেই রোগ সেরে যাবে।

বিমুখ হয়ে রাণী বলছেঃ বিছানা পাল্টালে হাড়ের খিলিন ছেড়ে যাবে।

এদিকে সাধক ক্ষেপা রাতে তার মাকে বলছেঃ মা, আমাকে আর পাবে না। এই তোমার বৌমা থাকল। জানবে এইটেই আমার সাধক ক্ষেপা।

ক্ষেপা তখন সেই রাতে পাকের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর দেশে উড়ে চলে গেল।

॥ চার ॥

পাকের পিঠে চেপে সাধক ক্ষেপা উড়তে উড়তে অনেক দূরে

শ্যামনগর বলে এক শহরে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে ছিল রাজার এক বাগান। সাধক ক্ষেপা সেই বাগানে গিয়ে নামল। গাছের উপরে পাখীটিকে বেঁধে দিয়ে, গাছের নীচে ঢালাও কাপড় গায়ে দিয়ে ক্ষেপা ঘুমুতে লাগল। এদিকে সেই বাগানে বার বছর ফুল ফোটে নাই। সেদিন কিন্তু ফুলে বাগান আলো। একটু বেলা হলো রাখালরা গরু নিয়ে সেই বাগানের দিকে চরাতে আসল। বাগান দেখে রাখালদের সদ্দার বলছেঃ দাঁড়া আমি মেলেনীকে খবর দিয়ে আসি। তার বাগানে ফুল ফুটেছে! রাখাল্ সদ্দারের কথা শুনে মেলিনী বেরিয়ে একটি পুষ্করিনিতে ডুব দিয়ে সঁচুলে, সঁকাপড়ে বাগানে ঢুকল। অনেক গাছের ফুল তুলে শুঁক্‌তে লাগল। তারপর একটি গাছের গোঁড়ায় দেখছে, ঢালাও কাপড় গায়ে দিয়ে, কে যেন শুয়ে আছে।

গলায় কাপড় দিয়ে মেলেনী বলছে, বাবা! তুমি কোন দেবতা? মুসলমানের, না হিন্দুর। যদি হিন্দুর দেবতা হও জোড়া পাঁঠা দুবো, আর যদি মুসলমানের পয়গম্বর হও জোড়া মোরগ দুবো। আড়ীমুড়ি ছেড়ে উঠে সাধক ক্ষেপা মেলেনীর পা ধরে বলছে, মা তুমি আমাকে নরকের পথে দিলে, আমি একজন মানুষ।

কথা শুনে মেলেনী বলছেঃ আমার একটি বোনপো ছিল, তোমার মত। মাসখানেক তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি।

ক্ষেপা তখন বলছেঃ তবে আমিই তোর বোনপো, তুই চিন্‌তে পারছিস না। সাধক ক্ষেপাকে নিয়ে মেলেনী তখন তার বাড়ী চলে গেল।

শ্যামনগর শহরের বাদশার একটি মেয়ে আছে। তার নাম তুলাবতী। সতী-অসতী পরীক্ষা করার জন্যে একধারে ফুলের মালা, আর একধারে কন্যা চাপাতো। দু'চার দিন সেই মালা দেওয়া বাদ। বসে বসে সাধক ক্ষেপা একটি মালা গেঁথেছে। মালাটি কিন্তু বিনি সুতোর। সেদিন কিন্তু মালাটি গলায় দিয়ে কন্যার এক সুতো ভার বেশী হলো।

কন্যা ঃ আমি তো সতী,' আজ ভারী এক সুতো বেশী হবার কারণ কি ? একথা মেলেনীকে বলছে। মালাটি নিয়ে রাজকুমারী নাড়া-চাড়া করতে লাগল। দেখলো এটা বিনি সুতোর মালা।

রাজকুমারী তখন মেলেনীকে বলছে ঃ এ মালা কে গেঁথেছে বলতে পারিস ?

মেলেনী ভয়ে বলছে ঃ মা, আমিই গেঁথেছি। তবে আমি বুড়ো মানুষ, চোখের কি আর ঠিক আছে ?

রাজকুমারী বলছে ঃ এ যে বিনি সুতোর মালা, তোর বাবারও তাগত নাই যে গাঁথে ! সত্যি করে বল এ মালা কে গেঁথেছে ? নইলে শঙ্খ মাছের কোড়া আছে, মেরে তোর পিঠ ভেঙে দেব।

মেলেনী ভয়ে ভয়ে বলছে ঃ আমার একটা বুনপো আছে মা, তবে এ মালাটা সেই হতভাগা হয়ত গেঁথেছে।

রাজকুমারী বলছে ঃ সেকথা এতক্ষণ বলতে কি হলো ! মেলেনী তোর বুনপোকে একবার এনে আমাকে দেখাতে পারিস ?

মেলেনী ঃ না মা, দেখাতে পারবো না, সে ক্ষেপা খোপা, নোংরা।

রাজকুমারী ঃ এত সুন্দর মালা গেঁথেছে ! তাকে আন্‌লে তুকে বহুৎ উপহার দেবো। এই বলে সে মেলেনীর হাতে এক ভাঁড় খুদ দিয়ে তার একগালে চুন, আর একগালে কালী দিয়ে খিড়্‌কি দিয়ে বার করে দিল। মেলেনী সেদিন সদর দিয়ে ঢুকেছিল। মেলেনী লজ্জায় গাল দিতে দিতে বলছে, গুখুরো বেটাকে ঝাঁটা মেরে বিদায় দিব। এই্ বলে, বাড়ী এসে রাগে ভাঁড়টাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁটা মারে, আর কি ! মেলেনী তখন দেখছে, এংনেতে সোনার মোহর পড়ে আছে। খুদের ভাঁড়ে সোনার মোহর ভরা ছিলো। তাড়াতাড়ি মেলেনী ঝাঁটা ফেলে দিয়ে আগ্রহ কোরে ক্ষেপাকে কোলে তুলে নিল।

মেলেনী বলছে ঃ কোনদিন তোকে নিষেধ করব না, এবং প্রত্যেক দিন তু মালা গাঁথিস। তবে একটি কথা বাবা !

ক্ষেপা ঃ কি কথা মাসী ?

মেলেনী ঃ তুকে রাজকন্যা যে একবার দেখতে চেয়েছে, কেমন করে দেখাই ?

ক্ষেপা বলছে ঃ দেখবার একটা আয় আছে মাসীমা। আমাকে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজ বাড়ী নতুবা সাত দ্বারে সাতটি দ্বারী আছে, কেমন করে যাওয়া যাবে ? সন্ধ্যার দিকে মেলেনী বুনপোকে মেয়ে সাজিয়ে রাজ বাড়ী নিয়ে গেল। পোশাক দেখে দ্বারীরা সব দ্বার ছেড়ে দিল। ভাবলে কোন রাজকুমারী আসছে। রাজকুমারী, মেলেনী ও তার বোনঝিকে দেখে তাড়াতাড়ি জল খাবারের ব্যবস্থা করল। তারপর রাজকুমারী মেলেনীকে বলছে, তুমি এখানে জল খাও। আর মেয়ে ছেলের পোশাক পরা ক্ষেপাকে নিয়ে রাজকন্যা চিলে কোঠার উপরে চলে গেল।

রাজকন্যা বলছে ঃ আমি এখানে একা থাকি। এখানে আসবার তোমার কোন ব্যবস্থা আছে ?

ক্ষেপা বলছে ঃ হুকুম দিলে আমি নিশ্চয়ই আসতে পারবো। আমার ময়ূরপঙ্খী আছে। সেই ময়ূরপঙ্খীর পিঠে চেপে আমি যাতায়াত করতে পারি। এই সব কথাবার্তার পর রাজকন্যা মেয়ে সাজা ক্ষেপাকে মেলেনীর কাছে এনে দিয়ে বলছে, আমার দেখা হয়ে গিয়েছে, তুমি তোমার বুনপোকে বাড়া নিয়ে যাও।

তারপর রাজকন্যা তাদের দুটো দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। ফিরে এসে রাজকন্যা ভাল ভাল খাবার দ্রব্য তৈরী করতে লাগল। এদিকে অনেক রাত হ'লে সাধক ক্ষেপা পাখীর পিঠে চেপে চিলে কোঠায় গিয়ে নামল। এই ভাবে পাঁচ মাস যাতায়াত করছে ক্ষেপা। এদিকে তোলাবতীর সতীত্ব নষ্ট হয়ে গিয়াছে। মেলেনী একদিন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার কাছে গেল। রাজা দেখে মেলেনীকে বলছে, কি বলতে চাস নির্ভয়ে বল। ভাববার কারণ কি আছে !

মেলেনী ঃ হুজুর, আগে আপনার মেয়ে একটি ফুলের মালায় ওজন হতো। এখন দেখছি তোলাবতীকে ওজন করতে বাগানের

যত ফুল আছে, সবই লেগে যাচ্ছে। এরপর বাগানের গাছ কেটে একদিকে চাপাতে হবে, আর আপনার মেয়েকে একদিকে চাপাতে হবে। আমি এত ফুল কোথা পাব হুজুর?

কথা শুনে রাজা চমকে উঠে মেলেনীকে বলছে, কি! ছোট মুখে বড় কথা! আমার বাড়ীতে সাতটি দ্বারে সাতটি দ্বারী আছে। কি ভাবে লোক আসবে?

মেলেনী: তবে রাজা আমার কোন দোষ নাই। পরে আমাকে দোষ দেবেন না।

রাজা রেগে দ্বারীদের মারপিট করতে লাগলো। রাজা দ্বারীদের বলছে, বেতন খাও, রাত্রি বেলায় আমোদ কর নাকি! আমার বাড়ীতে চোর প্রবেশ হয়। একটি দ্বারী কাঁদতে কাঁদতে বলছে, হুজুর চোরের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। একটা সাড়া পাওয়া যায়, সে চোর আমাদের ধরবার তাগৎ নাই। রাজকন্যার চিলে কোঠায়, অনেক রাতে সোঁ করে কী একটা নামে, আবার শেষ রাতে সোঁ করে চলে যায়!

রাজা: এই চোর ধরার কোন পন্থা আছে?

দ্বারী: হ্যাঁ হুজুর আছে। যদি চার মণ ঘুংগোর কিনে আনতে পারেন, আর চারটে তারের জাল তৈরী করে তাতে ঘুংগোর গুলো গাঁথা যায়, তবে চোর ধরা পড়বে। ঘুংগোর বাজলে আমরা শুনতে পাবো। রাজা তখন মন্ত্রীকে হুকুম দিয়ে চার মণ ঘুংগোর কিনে আনালো। চিলে কোঠাকে মজবুত করে জাল দিয়ে গাঁথল। তারপর জালের সঙ্গে ঘুংগোর বেঁধে দিল। মেলেনী চিলে কোঠায় জাল ও ঘুংগোর বাঁধার কথা শুনে গেল, ফুলের মালা দিতে এসে। নিজের বোনপোকে তেল দিতে গিয়ে মেলেনী আপন মনে বলছে, আজ কিন্তু চোর বেটা ধরা পড়বে, বাবা।

ক্ষেপা বলছে: সে চোর বাড়ীতে কী চুরি করে?

লজ্জায় মেলেনী বোনপোকে সেকথা খুলে বলতে না পেরে বলছে: বাবা, চোর বেটা রাজকুমারীকে নারী নির্যাতন করছে। ধরতে

পেলে রেহাই নাই, যেহেতু রাজবাড়ী। ক্ষেপা বসে বসে ইন্তাম করছে, তাইতো, আজ আর আমি যাব না। একটু রাত হলে পাখী বলছে : ক্ষেপা, যাবি না খাবার দ্রব্য খেতে ?

ক্ষেপা বলছে : আজ যাওয়া হবে না ভাই, তুমি তো মাখন ছানা খেয়ে লোভাচ্ছ, কিন্তু আমার পিঠের ছাল যাবে।

পাখী ক্ষেপাকে বলছে : আমি থাকতে তোর পিঠের ছাল যাবে ? কি হয়েছে বল না !

ক্ষেপা : চিলেকোঠা ঘিরে দিয়েছে জাল আর ঘুংগোর দিয়ে, কোথায় নামবি গিয়ে ? মেলেনী মাসি একথা বাড়ীতে বলেছে।

পাখী : মনের কথা মনেই রাখবি, আমাকে তো খুলে বলবি এতক্ষণ বললে আমি সব সেরে দিতাম।

ক্ষেপা বলছে : এখন পারবি ?

পাখী বলছে : পারবো বইকি, ওতো আধ ঘন্টার কাজ। তবে আমার বাঁধন খুলে দে। পাখী তখন ফাঁকা মাঠে একটি বাগানের ধারে চিৎকার করল। কণ্ঠকমল হচ্ছে পাখীদের রাজা। তার ডাকে তিন লাখ তেত্রিশ হাজার পাখী এসে দর্শন দিল।

পাখীর রাজা বলছে : প্রত্যেক বাগান থেকে তুমরা মোম আনতে দ্বিধাবোধ করবে না। চার মণ ঘুংগোরের ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। পাখীরা সব দূর দেশের বাগানে চলে গেল মোম আনতে।

মোম আনা বাদ তিন হাজার পাক থেকে গেল, তারা কার্নিশের গায়ে বসে ঘুংগোরের মুখে মোম লাগাতে লাগল। আর বাকীরা সব মোম আনছে। চার মণ ঘুংগোরের ছিদ্র বন্ধ করে ডানার ঝাপট দিয়ে দেখলো কোন ঘুংগোরটির সাড়া নাই, সব বোবা !

পাখীর রাজা বলছে : যাও ভাই সব ফিরে যাও। আমার কাজ হাসিল হয়েছে।

তারপর পাক ক্ষেপাকে পিঠে করে নিয়ে চিলেকোঠায় গিয়ে নামল। তখন অনেক রাত, রাজকন্যা বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষেপা গিয়ে পালঙ্কে বসতেই কন্যা চেতন হয়ে গেল।

শুধাল ঃ তুমি এলে কি করে? চিলেকোঠায় যে ঘুংগোর গাঁথা আছে!

ক্ষেপা বলছে ঃ সব ঘুংগোরের ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তোমার কাছে আসতে দেরী হয়ে গেল।

রাজকুমারী হেসে বলছে ঃ যেমন মালদার, তেমনি চোর। মালদার তার মাল আটকাতে চায়, দুষ্টু চোর ঠিক চুরিও করতে চলে এসেছে। বেশ তোমার জন্য খাবার তোলা আছে, পেড়ে আনতো, কারণ আমার আজ শরীর ভাল নাই। ক্ষেপা তখন নিজেই খাবার পেড়ে খেতে লাগল। সেদিন চিলেকোঠায় ক্ষেপার ঘুম হলো না। গল্প করতে করতে রাত কেটে গেল। ভোরের দিকে ফিরে এলো ক্ষেপা মেলেনীর বাড়ী।

দ্বারীরা বলছে ঃ ভাই, আজ শয়তান সেই চোরটি আসে নাই।

অন্যজন বলছে ঃ তুমি কি করে জানলে হে?

অন্যদ্বারী ঃ চিলেকোঠায় ঘুংগোর সাজান আছে, কোন সাড়া নাই।

অন্যদ্বারী বলছে ঃ তোমরা কেউ গিয়ে দেখে এসো।

একটি দ্বারী তাড়াতাড়ি দেখতে গেল। সব দেখে সে থ হয়ে গেল। সে ফিরে এসে অন্য সব দ্বারীদের বলছে ঃ সে চোর ধরা যাবে না। আজো সে এসেছে। কোন ঘুংগোরের মুখ খোলা নাই দেখলাম। সব মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করা আছে।

তখন সাতজন দ্বারী রাজার কাছে দর্শন দিয়ে বলছে ঃ হুজুর! এ চোর আমাদের ধরবার কারও শক্তিতে হবে না। কারণ সে চার মণ ঘুংগোরের মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

সেখানে একটি দাসী দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বলছে ঃ তাহলে কি উপায়?

দাসী বলছে ঃ উপায় আছে, হুজুর!

রাজা ঃ কি উপায়?

দাসী ঃ আমাকে বাজার থেকে এক পুয়া সিঁদুর এনে দিতে হবে।

আর আপনার শহরে ঢেঁড়ি দিতে হবে যে, রাতে কাপড় কাচা চলবে না। রাতে যদি কেউ কাপড় কাচে, বিনা বিচারে তার গর্দ্দান যাবে।

দাসীর কথা শুনে তাই হবে বলে শহরে ঢেঁড়ি দিল। এদিকে সন্ধ্যায় দাসী বিছানা করে রেখে এসে, রাজকুমারীর খাওয়া-দাওয়ার পর সঙ্গে করে নিয়ে খাটে চাপিয়ে দিল। সেই এক পোয়া সিঁদুর বিছানা বা খাটের চারিদিকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিল। দাসী দুয়োরটা টেনে দিয়ে চলে এলো। ঘরে একটি প্রদীপ জানালার দিকে জ্বলছে। কিন্তু একটু হাওয়া ছিল সেদিন, হাওয়াতে প্রদীপটা নিবিয়ে গেল। অনেক রাত হলে পাখীর উপর চেপে চিলেকোঠায় গিয়ে নামল ক্ষেপা। তারপর রাজকুমারী চেতন হয়ে গেল। বলছে: কে তুমি?

ক্ষেপা বলছে, আমি কে বাতি জ্বাললেই বুঝতে পারবে।

রাজকন্যা কাঠি জ্বেলে বাতি ধরিয়ে দেখছে, সব্বোনাশ! তারপর ক্ষেপাকে বলছে, পাকা চোর হলেও আজ ধরা পড়েছ।

ক্ষেপা বলছে: বাইরে কেউ তো নাই, কে ধরল?

কন্যা: ঐ তোমার কাপড়ে সিঁদুরের ছাপ। এ ছাপ কে মুছবে! তাড়াতাড়ি ধোবাবাড়ী গিয়ে কাপড় ধুয়ে আন। এই লাও দুটো সোনার আসরফী, চেনতো?

মোহর দুটো হাতে করে, বিলম্ব না করে সেই রাতেই কাপড় ধুতে গেল ক্ষেপা। কিন্তু কোন ধোবা কাপড় কাচতে চাইলো না রাতে। কারণ আগের দিন তারা রাজার ঢেঁড়ি শুনেছে। একটি অচল কুড়ি কুষ্ঠী ধোবা ছিল, সে বলছে: হুজুর, রেখে দিন একটু বাদে লিয়ে যাবেন।

ধোবা ঘাট বাদ দিয়ে বেঘাটে কাপড়টি কাচতে লাগল। কাপড় কাচার সাড়া পেয়ে রাজার দ্বারী ধোবাকে রাজার নিকট ধরে লিয়ে গেল। রাজা বলছে: বল বেটা, কার কাপড়? ধোবা ভয়ে কিছু বলছে না। তখন রাজা ধোবাকে মারতে লাগল।

ঃ গান ঃ

ধোবা ঃ আর মেরো না, আর মেরো না
ও রাজা আর মেরো না তুমি।
বিধেতায় মেরেছে আমায়
তার অধীন বিধে তুমি।

রাজা তখন বলছে ঃ সত্যি করে বল এ কাপড় কার ?

ধোপা বলছে ; হুজুর, এ কাপড় মেলেনীর বাড়ীতে, মেলেনীর একটি বোনপো আছে তার। রাজা তখন গরম হয়ে বলছে ঃ যে আগলদার তারই বাড়ীতে গরু ভরা, সেই গরুতে ফসল খাচ্ছে। রাজা দ্বারীদের সর্দ্দারকে বলছে ঃ কাল সকাল বেলায় তাকে ধরে কেটে তার রক্ত আনবে, তার রক্ত দেখবো, তবে জল খাবো।

পরের দিন সকাল বেলায় রাজার লোকেরা মেলেনীর বাড়ী ঘেরাও করে ক্ষেপাকে ধরে ফেললো।

ক্ষেপা বলছে ঃ সে কি রে, আমি চোরও নই, চোরের ভাইও নই, আমাকে কেন ধরো ?

দ্বারী ঃ তুমি চোর না হলেও চোরের বড় ভাই। নারী চুরি, বড় চুরি।

ক্ষেপা ঃ আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করবে ?

দ্বারী ঃ তোমাকে কেটে তোমার রক্ত রাজার নিকট নিয়ে যেতে হবে, রাজা রক্ত দেখে, তবে জল খাবে।

ক্ষেপা বলছে ঃ তাই হবে, চল। তোমরা পাশে পাশে চল, আমি মাঝে মাঝে যাই। যেতে যেতে ক্ষেপা বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

ও রে আমার সোনার পাখী
দুইটি নয়ন ভিজা।
বড় কষ্টে পড়েছি পাখী
উদ্ধার কর এসে॥

ক্ষেপার গানটি যেই পাখীর কানে গেল, আর অমনি পাখী

ছট্‌ফট্‌ করে মাটি ছাড়া হয়ে আকাশে উড়তে উড়তে ক্ষেপার নিকট চলে এলো। তারপর ঝাপটি দিয়ে ক্ষেপাকে শূন্যে তুলে নিল পাখী। দেখে রাজার লোকেরা অবাক হয়ে গেল। দ্বারীদের সর্দ্দার বাদশাকে গিয়ে বলছে ঃ হুজুর! আমরা চোরকে ধরে আনছিলাম, এমন সময় আকাশ থেকে পাখী একটা নেমে চোরকে তুলে নিল আকাশে।

রাজা রাগযুক্ত হয়ে বলছে ঃ যাক বেটা, তবে সে আমার কাছ হ'তে এড়াতে পারবে না। কাল সকালে ধরে কোলে ক'রে নিয়ে আসবে তাকে। পরের দিন সকালে রাজার লোকেরা আবার তাকে মেলেনীর বাড়ীতে ধরে ফেললো। তারপর সেদিন আর না ছেড়ে কোলে ক'রে নিয়ে গেল শ্মশান ময়দানে।

দ্বারীদের সর্দ্দার বলছে ঃ কাল পালিয়েছ, আজ যাবে কোথা?

ক্ষেপা কেঁদে বলছে ঃ ভাই, আমাকে একবার ছেড়ে দাও। এই দরিয়ায় চাঁন করে দেহটাতে পাক পবিত্র করে আসি।

সর্দ্দার বলছে ঃ না তা হবে না, পালিয়ে যেতে পারে।

অন্য একজন দ্বারী বলছে ঃ জানিস না, মানুষ হত্যা মহাপাপ। যদি পালিয়ে যায় তা যাক। এইবার ক্ষেপা চাঁন করতে দরিয়াতে নেমে বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

ওরে আমার সোনার পাখী
তুই নয়নের হিয়ে।
বড় সঙ্কটে পড়েছি পাখী
উদ্ধার কর এসে।

এই গানের সুরটি পাখীর কানে গেল। পাখী বুঝতে পেরে ছটফট করে বাঁধন খুলে আকাশ পথে উড়তে উড়তে দরিয়ার ধারে এলো। তারপর পাক মেরে উড়তে লাগলো। ক্ষেপা বুঝতে পারলো যে তার পাক চলে এসেছে তার মাথার কাছে। বুঝতে পেরে কাপড়-চোপড় নিংড়াতে লাগল। ক্ষেপা পাড়ের দিকে ফিরে

আসছে। এক হাঁটু জল যেমন হয়েছে তেমনি পাখী ঝাপট মেরে ক্ষেপাকে শূন্যে তুলে নিল।

দ্বারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করছে। এমন সময় তারা দরিয়ার ধারে একটা কুকুর দেখতে পেয়ে, সকলে মিলে কুকুরটাকে কেটে তার রক্ত নিয়ে গিয়ে রাজাকে দেখালো। রাজা রক্ত দেখে আনন্দিত হয়ে জলপান করল।

পাখী তখন অনুরাগে ক্ষেপাকে বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

হুকুম দাও, হুকুম দাও ক্ষেপা
হুকুম দাও গো তুমি।
চিলের মতন ঝাপটা মেরে
রাজার সকল করবো মাটি।

পাখীর কথা শুনে সাধক ক্ষেপা বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

হুকুম দিলাম, ওরে পাখী
হুকুম দিলাম আমি।
চিলেকোঠা বাদ রেখে পাখী
রাজার সংসার কর মাটি।

তারপর ক্ষেপাকে পিঠে করে নিয়ে পাখী উঠে পড়ল আকাশে। তারপর রাজবাড়ীর উপর পাক মারতে লাগল। আর পাখার ঝাপটা মেরে রাজার দালান বাড়ী চরাতে লাগলো। এই সব দেখে রাজা ছুটতে ছুটতে তার মেয়ের কাছে গেল।

রাজা তার মেয়েকে বলছে ঃ মা, তুমি রক্ষা কর, আমার সংসার সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মেয়েটি পিতাকে বলছে ঃ বাবা, ওনার সাথে যদি আমার শাদি দাও, তবেই আমি রক্ষা করতে পারি। তা না হলে রক্ষা করা যাবে না।

রাজা বলছে ঃ তাই হবে, আমি শাদি দেব, তুমি চটপট রক্ষা কর।

তোলাবতী তখন চিলেকোঠায় গিয়ে সাধক ক্ষেপাকে ইশারা দিল। সাধক ক্ষেপা বলছে : তুমার বাবা আমাকে কাটতে আদেশ দিয়েছে তুমি আবার নামতে বলছ, কারণটা কি ?
মেয়ে বলছে : আমি তিসত্যি করেছি বাবার সঙ্গে, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

ক্ষেপা তখন পাখী নিয়ে রাজবাড়ীতে নামল। পরের দিন পাত্র মিত্রদের নিয়ে একটা শুভ দিন ঠিক করলো রাজা, ক্ষেপার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের জন্যে। সেই শুভ দিনে কন্যা সাধক ক্ষেপার গলে বরমাল্য দিল। রাজকুমারীর নাম তোলাবতী। তোলা দিয়ে রোজ রোজ ওজন করতো বলে এই নাম।

কিছু দিন বাদ মেয়েটির একটি পুত্র সন্তান হলো। তারপব আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। একদিন পাখী ক্ষেপাকে বলছে : অনেক দিন তু বাড়ী ছাড়া। তুর মা আব তুর আগেকার বিবি কেমন আছে ? চ ক্ষেপা তুকে বাড়ী লিয়ে যাই। পহেলাকার বিবি আর মায়েব কথা শুনে ক্ষেপার মন খুব খাবাপ হয়ে গেল। ক্ষেপা তখন পাখীকে বলছে : চল, কালই বাড়ী চলে যাব।

॥ পাঁচ ॥

এই বলে রাজাব নিকট বিদায় লিয়ে ক্ষেপা, তার বিবি তোলা-বতী আর পুত্র পাখীর পিঠে চেপে বসল। এদিকে তোলাবতী তখন আট মাসের গর্ভবতী। তিনজনাকে লিয়ে পাখী উড়তে লাগল। কয়দিন উড়ার পর তোলাবতীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। পাখীকে বলছে : পাখী তাড়াতাড়ি নাম, নইলে আমি হাত পা ছেড়ে দেবো। পাখী তখন সাত সমুদ্দুর তের নদীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। সে বলছে : তাইতো, সবইতো জলাকার কোথায় নামি ! পাখী সুমুদ্দুরের উপর পাক মেরে উড়তে লাগলো। পাখী দেখছে সাগরের উপরে একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে পাখী নামল। সেখানে তোলাবতীর জোড়া সন্তান প্রসব হলো।

সাধক ক্ষেপা চিন্তা করতে লাগল তাইতো কি করি ? গ্রাম

বা শহর এখানে নাই'। অন্য শহরে গিয়ে আমাকে তেলপানির ব্যবস্থা করতে হবে। কিনতে হবে মাল ও কাঠ। পাখীর পিঠে চেপে দরিয়া পার হয়ে এক শহর দেখতে পেলো ক্ষেপা। দরিয়ার ধারে এক শরকাঠির বনে পাখীটিকে রেখে বাজারের খোঁজে চলে গেল। এদিকে রাখালরা বলছে, চ ভাই ঐ শরকাঠির বনে যাই। ঐ ভদ্দলোক ওখানে কি রেখে গেল, দেখিগা। রাখালরা যেয়ে দেখে এক বড় পাখী। পাখীটিকে ধরতে যায় রাখালরা। আর পাখী হাঁ করে কামড়াতে আসে। রাখালরা তখন রাগে শরকাঠির বনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাখীটি পুড়ে যাবে এ কথা বুঝতে পারে সেই বনের দরবেশ—যার দয়াতে ক্ষেপারা সাত ভাই জন্ম নিয়েছে— সে তখন তার বস্ত্র দ্বারা শিকল উপড়ে পাখীটিকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। বাজার করে ফিরে এসে সাধক ক্ষেপা দেখছে সারা শরকাঠির বন আগুনে জ্বলছে। কিন্তু তার প্রিয় পাখী নাই। দেখছে গোটাকতক পালক পড়ে আছে। ক্ষেপা তখন সেই পালক কটি কুড়িয়ে হাতে করে দরিয়ার ধারে গেল। বিবি ও ছেলেদের জন্য যে সব বাজার করেছিল, সব দুঃখে দরিয়ার মধ্যে ফেলে দিল। কারণ আর তো সে বিবি ও ছেলেদের কাছে যেতে পারবে না। তারপর কাপড়ের কুঁপি টেনে সূতো এক গোছা বার করে বাজারের ফন্দ ও পালক কটি বেঁধে গলায় মালার মতন পরল। তারপর মুখে বলতে লাগল, হায় তোলাবতী, হায় তোলাবতী!

দিন গত হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় এক সওদাগর জাহাজ নিয়ে তোলাবতী যেখানে আছে, সেই দিকে চলে আসছে। এদিকে তোলাবতী ছোট ছেলে দুটোর গুয়ের কানি কয়খানা কাচতে দরিয়ার ধারে এসেছে। সওদাগর দেখতে পেলে দরিয়ার মাঝে দ্বীপের ধারে এক সুন্দরী নারী।

সওদাগর বলছেঃ নারী! তুমি কি চাও আমার কাছে?

তোলাবতী বলছেঃ আমি চাই তোমার কাছে কিছু অন্ন ভিখ্‌খা।

সওদাগর বলছেঃ হে কন্যা, তোমার যা খুশী তুমি জাহাজে উঠে হাতে করে নিয়ে লাও।

কন্যা বলছেঃ আমি জাহাজের উপরে উঠে ভিক্ষা লিব না। এই বলে সে চলে যেতে লাগল।

তখন সওদাগর তাকে জোর করে ধরে জাহাজের উপর তুলে নিল।

কন্যা তখন কাঁদছে আর বলছেঃ সওদাগর তুমি যে আশায় আমাকে জাহাজে তুলেছ, তোমার সে আশা পূরণ হবে না। আজ থেকে বার বৎসর তোমার সঙ্গে বাপবিটি পাতানো থাকল। তারপর তুমি আমাকে শাদী করতে পার।

দ্বীপের মাঝে ছেলে তিনটি থেকে গেল। কিছুদিন পর এক রাতে শ্বেত হাতী এসে বড় ছেলেটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে দরিয়ার ধারের রাজ্যের রাজা করে দিল। সেই শহরে ছিল এক ঘোষ। তার ছিল এক কপিলা গাই। সেদিন রাখাল দরিয়ার ধারে কপিলা গাইকে চরাতে নিয়ে আসলো। তখন বেলা অনেকটা হয়েছে। দ্বীপের উপরে ছেলে দুটো ভেঁাকে ভেঁাকে চিৎকার করছে। সেই কপিলা গাই শুনতে পেল, ছেলে দুটোর কাঁদনের সুর।

কপিলা মনে মনে বলছেঃ আহা, এই ছেলে দুটোর বোধ হয় মা নাই। কপিলা চরতে চরতে জল খেতে গেল। জল খেয়ে দরিয়ায় সাঁতার দিয়ে সেই দ্বীপে হাজির হলো। দেখে কপিলা বলছেঃ আহা, মা হারা ছেলে বটে। ছেলে দুটোর কাছে শুয়ে পা দুটো পায়ে করে ঠেলে ছেলে দুটোকে তলপেটে কাছে নিয়ে এলো। ছেলে দুটো আনন্দিত হয়ে চারটি, বাঁটের দুধ খেতে লাগলো। পেট ভরে গেলে তারা বাঁট ছেড়ে দিল।

কপিলা উঠে বলছেঃ ভগবান! তুমি এদের হিয়াৎ দিয়ো, আমি এদের আহার যোগাব।

গাই আবার সাঁতরিয়ে এসে দরিয়ার ধারে চরাট করতে লাগলো। তখন রাখাল সেই গাই ডাকিয়ে বাড়ী লয়ে যায়।

গাইটিকে খাবার দ্রব্য খেতে দিয়ে কিছুক্ষণ বাদে গয়লা গাই দুয়াতে আসল। ঘোষ গাই দুয়াতে বসে বাঁটে হাত দিয়ে বলছেঃ তাইতো বাঁটে দুধ নাই।

গয়লা তখন ধমকিয়ে রাখালটাকে মার ধোর করল। তারপর ঘোষ রাখালকে বলছেঃ আচ্ছা কাল থেকে তুমি গাই চরাতে নিয়ে যাবে, কিন্তু বাছুর বেঁধে রাখবে বাড়ীতে। সেদিনও কপিলা চরাট করতে গিয়ে ছেলে দুটিকে দ্বীপে দুধ দিয়ে এলো। পরের দিনে আবার দুয়াতে যেয়ে দেখে গাইয়ের বাঁটে দুধ নাই!

ঘোষ বলছেঃ তুই খেলা করতে করতে আসিস্, বাড়ী এসে বোধ হয় বাছুরকে দুধ দিয়ে দিয়েছে। আগামী কাল তুই বাছুর মাঠে নিয়ে যাবি, গাই বাঁধা থাকবে। কপিলা চিন্তায় পড়ে গেল, তখন মনে মনে বলছেঃ তাইতো ছেলে দুটোর আজ পিত্তি পড়ে যাবে। অনেক রাত হলে কপিলা দড়া ছিঁড়ে দ্বীপের দিকে চলে যাচ্ছে ছেলে দুটিকে দুধ দিতে। সকালে ঘোষ গাই দুইয়া কয়টি দোকানে দুধ দিবে বলে বায়না নিয়েছিল। কিন্তু সেদিনও দুধ পেল না। ঘোষ ভাবল, এমন শত্রু আমার কে আছে, কেও তো নাই, যে রাতের বেলায় দুধ দুয়ে নিয়ে যাবে।

পরের দিন রাতে ঘোষ গাইকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে-দেয়ে এসে ছানি ঘরে শুয়ে থাকল। রাত একটু বেশী হলে কপিলা দড়া ছিঁড়ে গোয়াল থেকে বেরুল। ঘোষ চুপি চুপি কপিলার পেছন ধরল। পিছু পিছু যায়। দরিয়ার ধারে পায়ের সাড়া পেয়ে কপিলা থমকিয়ে দাঁড়াল। দেখল পিছু পিছু ঘোষ আসছে। তখন মারের ভয়ে কপিলা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

ঘোষ বলছেঃ মা, তুই যেখানে যাবি সরল মনে চ, আমি তোর পিছন পিছন যাবো। রাতের বেলায় গাই সমুদ্রে নেমে পড়ল, ঘোষ তার লেজ ধরে চলে গেল। দেখে দ্বীপে দুটি ছেলে মাণিক রতন। আনন্দিত হয়ে ছেলে দুটোকে ধরে যেই কপিলা দুধ খাইয়ে দিল, ঘোষ মনে মনে বলছে, যাক দুটো মাণিক রতন পেয়েছি। এই

নিয়ে ভুলে থাকবো। আমার বাড়ীতে তো ছেলে নাই। ফিরে বাড়ী চলে এলো ঘোষ।

ঘোষানীকে ঘোষ বলছে, দুধ কম দেয় কেনে জানিস? দুটো রাজপুত্র মানুষ করছে কপিলা। সেখানে গিয়ে রোজ দুধ দিয়ে আসে। তু এক কাজ কর ঘোষানী, পেটের মধ্যে একটা আড়ী বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় দুধ দই বিক্রি কর গা।

ঘোষানী ঘোষকে বলছে, আঃ মর, মরণ নাই তোর, বৃদ্ধ অবস্থায় লোকে কত টিট্‌কারী দেবে। ঘোষ বলছে, ক্ষতি নাই। যেমন ধন পাব আমরা, তেমন ধন শহর-বাজারে মেলে না। বিকেল বেলায় ঘোষ দাই বাড়ী গিয়ে দাইকে বলে এলো, সকালে আমার বাড়ীতে কাজ করতে যাবি। একশত টাকা সে দাইকে পুরস্কার দিল। রাত্রিকালে একটি মাটির ব্যান নিয়ে মাথায় করে কপিলার সঙ্গে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হলো। দুই হাতে করে ছেলে দুটোকে দুধ খাইয়ে মাটির ব্যানের ভিতর শুইয়ে দিল। কপিলা তখন জলে নামল, ঘোষ তখন মাটির ব্যানটি জলে ভাসিয়ে দিয়ে এক হাতে ব্যান আর অন্য হাতে কপিলার লেজ ধরে পার হয়ে এলো। ছেলে দুটি পেয়ে ঘোষানীর খুব আনন্দ হলো। ঘোষ ঠিক করল লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হবে। ছেলে দুটো একটু বড় হলে তার বড় ভায়ের রাজ্যে যে পাঠশালা ছিল, সেখানে তাদের পড়তে দিল। ঘোষও ঐ রাজ্যে বাস করতো। ঘোষের ছেলে দুটোকে যে দেখে সেই ভালবাসে, কোলে নেয়। লোকে বলে ঘোষের ঘরে ভগবান, এমন সুন্দর ছেলে তুমি দিয়েছ। পাঠশালে পড়তে পড়তে ছেলে দুটো একটা ক্ষেপাকে দেখলো, সে ক্ষেপা ভিক্ষা করতে আসছে। পাঠশালের ছেলেরা ক্ষেপাকে ধূলো ডেলা ছুঁড়তে লাগল। ছেলে দুটো তাদের জল খাবার, গাছতলায় বসে ক্ষেপাকে খাওয়াল। অন্য সব ছেলেরা এই দেখে, ছেলে দুটোকে আরও ভালবাসতে লাগল। ক্ষেপা জল খাবার খেয়ে গাঁয়ের দিকে ভিক্ষা করতে চলে গেল। এদিকে

তোলাবতীর বড় ছেলে এখন সেই দেশের রাজা। সে পাঠশালা দেখতে এসে ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলল। গুরুমশায়কে শুধাল, এই ছেলে দুটো কার? গুরুমশায় বলল, এক ঘোষের। রাজা বলল, ডাক ঘোষ আর ঘোষানীকে। রাজার ডাকে তারা পাঠশালে এলো। রাজা তখন ঘোষ আর ঘোষানীকে বলছে, শুন ঘোষ আর ঘোষানী, এই ছেলে দুটির সব খরচ আমার, বই, খাতা, পেন্সিল যা লাগবে সব আমি দেব। এরা রাজ বাড়ীতে খাবে আর রাজ বাড়ীতে থাকবে। তোমরা রোজ একবার করে দেখে যাবে। ঘোষ-ঘোষানী বলল, তাই হবে রাজামশায়। এই ভাবে দিন যায়।

এদিকে বার বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ঐ সদাগর যে তোলাবতীকে বন্দী করেছিল, সে দ্বীপে বাণিজ্য করে দেশে ফিরছে। তোলাবতীর বড় পুত্র যেখানে রাজা হয়েছে, সেই দিকে ফেরার পথ। পূর্বে এই রাজ্যে যে রাজা ছিল, সে ছিল এই সদাগরের বন্ধু। সদাগর জানে না যে, বন্ধু মারা গিয়েছে, অন্য রাজা হয়েছে। তাই সে নদীর ঘাটে জাহাজ নঙ্গর করে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলো। এসে দেখে সিংহাসনে অন্য লোক বসে আছে। তখন সদাগর রাজ দরবারে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাজা মন্ত্রীকে শুধাল, কে এই লোক?

মন্ত্রী বলল, মহারাজ, ইনি একজন বড় সদাগর, পূর্বের রাজার বন্ধু। রাজা তখন সদাগরকে বলল, বেশতো তুমিও আমার বন্ধু। এই বলে সদাগরকে খুব আদর যত্ন করল। সন্ধ্যা হলে সদাগর জাহাজে ফিরে যেতে চাইল। রাজা বলে, এখানে রাতে থাক।

সদাগর: জাহাজে আমার বেগম সাহেবা আছে। সে ভাবছে। আমার এই বেগম সাহেবার সঙ্গে এখানেই আমি বিয়ে করব, তোমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজা বলল, আমার মৌলভী ও কাজী আছে। শুভ দিন দেখে তোমার বিয়ে পড়িয়ে দেব।

রাজা সদাগরকে বলল, তুমি পাশাখেলা জান ?

সদাগর বলল, জানি।

রাজা বলল, তবে এসো, আজ রাতে দু'জনে পাশা খেলি আর তোমার বেগম সাহেবা ও জাহাজে পাহারা দিবার জন্য দুইজন বিশ্বাসী লোক দিচ্ছি। এই বলে সেই দুই ভাইকে জাহাজ ও বেগম সাহেবাকে পাহারা দিবার জন্য পাঠাল। আর রাজা ও সদাগর পাশা খেলতে লাগল।

রাজার কথামত দুই ভাই জাহাজে গিয়ে বেগম সাহেবার দরজার চৌকাঠের সামনে বসে পাহারা দিতে লাগল। ছোট ভাই বলল, শুধু শুধু বসে থাকতে ভাল লাগছে না, তুমি একটা কেচ্ছা বল।

বড় ভাই ঃ পরের কেচ্ছা শুনবি, না ঘরের কেচ্ছা শুনবি ?

ছোট ভাই ঃ ঘরের কেচ্ছাই শুনব।

বড় ভাই তখন ছোট ভাইকে ঃ কণ্ঠকমল পাখী ও তার মা বাপের কথা বলতে লাগল। বন্দিনী তোলাবতী সব শুনল। সে বুঝল, এই দুটি ছেলে তার। সকাল হলে ছেলে দুটি গিয়ে রাজ বাড়ীতে শুয়ে পড়ল। সদাগর জাহাজে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে বেগম সাহেবা এলো চুলে বসে বসে কাঁদছে। সদাগর শুধাল, কি হয়েছে ?

বেগম ঃ কাল রাতে যারা পাহারা দিতে এসেছিল, তারা খুব খারাপ। সারা রাত তারা দরজা মাড়ুলী করেছে, দরজা খোলা পেলে আমার সতীত্ব নাশ করতো।

এই কথা শুনে সদাগর বন্ধুর নিকট গিয়ে সব বলল। বন্ধু বলল, বেশ এর উপযুক্ত বিচার আমি করবো। পাল্কীতে করে বেগম সাহেবাকে দরবারে আনা হলো। ছেলে দুটিকে দরবারে ডাকা হলো।

বেগম সাহেবা বলল, এই ছেলে দুটি রাতে যে কেচ্ছা বলেছে তা আর একবার বলুক। দুই ভাই মনের দুখে কেচ্ছা বলতে

লাগল। বলল্ঃ বাপ গেল আগুন আনতে, তাকে খেল বাঘে, মা গেল কাপড় কাচ্তে, তাকে খেল কুমীরে, আর বড় ভাইকে শ্বেত হাতীতে শুঁড়ে তুলে নিয়ে চলে গেল। এই দুঃখের কথা কাল রাতে বলেছি আমার এই ছোট ভাইকে ঃ

ঃ গান ঃ

বাপ গেল আগুন আনতে
ফিরে নাহি এলো,
পাখীর শোকে অনুরাগে
ক্ষেপা সেজে গেল।
আহা কি দুঃখ দিলিরে বিধি।
মাও গেল কানি কাচতে
ও মা ফিরে নাহি এলো,
বাবার শোকে অনুরাগে
জলে ডুবে মল,
আহা কি দুঃখ দিলিরে বিধি ॥
কোথা ছিল শ্বেত হাতী
দ্বীপে চলে এলো,
শুঁড়ে করে ভাইকে তুলে
কোথায় নিয়ে গেল,
আহা কি দুঃখ দিলিরে বিধি ॥

রাজা তখন বলল, আমিই তোমাদের সেই বড় ভাই। শ্বেত হাতী তুলে এনে এখানে রাজা করেছে আমাকে। তখন বেগম সাহেবা বলছে, আমি তোদের সেই অভাগিনী মা। আমি ছেলে তিনটি রেখে কাপড় কাচ্তে গিয়েছিলাম, এই সদাগর জোর করে আমাকে ধরে এনেছে। বলেছিলাম, ছেলে দুটো নাও, তা নেয়নি। রাজা তখন সদাগরের জাহাজ বাজেয়াপ্ত করল। আর তাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দুইদিকে দুই ডালকুত্তা লাগিয়ে দিল।

এদিকে ক্ষেপা তার বুকে ঝুলিয়ে রেখেছে সেই ফর্দ, আর

কণ্ঠকমল পাখীর জীবনী শক্তি। ক্ষেপা তখন কি আর করে, ছুতোরের বাড়ীতে রোজ ঢেঁকিতে চিড়ে কুটে। একদিন তোলাবতী আর তার পুত্রবধূ বসে আছে রাজ বাড়ীর ছাদে। ক্ষেপা ছুতোরদের সাথে মাথায় করে চিড়ে নিয়ে হাটে যাচ্ছে। তোলাবতী দেখে তাকে চিনতে পেরে বলল, বৌমা ঐ ক্ষেপাটা তোমার শ্বশুর। ছেলেকে বল, সম্মান ক'রে ওকে রাজ বাড়ীতে নিয়ে আসতে। তবে সহসা আসতে চাইবে না। রাজা চারজন দাসী পাঠাল ছুতোরের বাড়ী। ক্ষেপাকে বলল, চলুন রাজা আপনাকে ডাক্‌ছে। ক্ষেপা বলল, রাজার ডাকের ধার ধারিনা। তখন দাসীরা জোর করে ক্ষেপাকে ধরে আনল। তোলাবতী তখন ছেলেকে বলল : একজন নাপিত ডেকে এনে এর হাজমত করাও। নাপিত এলো, চুল-দাড়ী সব পরিষ্কার করে কেটে ক্ষেপাকে সাবান মাখানো হলো। তারপর রাজবেশ পরিয়ে রাজভোগ খেতে দিল। ক্ষেপা রাজভোগ খায় আর কাঁদে। দাসীরা বলে কাঁদছেন কেন? হায়রে, আমার বিবি আর তিন ছেলে কোথায় আছে, তার জন্য কাঁদছি। তোলাবতী ছিল প্রায় বিধবার বেশে। তোলাবতী ক্ষেপাকে বলল, আমাকে চিন্‌তে পারো? ক্ষেপা বলে না তো! কারণ ক্ষেপা তাকে রাজরাণীর বেশে দেখছে।

তখন তোলাবতী রাণীকে বলল, বৌমা আমার মাথায় চুঁটি গেঁথে বেঁধে দাও। আর আমাকে ভাল ভাল সোনার গহনা পরিয়ে দাও। পরিয়ে দাও ভাল সোনার কামকরা শাড়ী। বৌ তখন আর দশগুণ ভাবে শাশুড়ীকে সাজাল। তোলাবতী তোলাবতী হয়ে উঠল। ক্ষেপা তখন চিন্‌তে পেরে জড়িয়ে ধরল।

ক্ষেপা বলল, তুমি এখানে! তোলাবতী বলল : তুমি গেলে আগুন আন্‌তে। আর ফিরলে না। আমি গেলাম কানি কাচতে এক সদাগর আমাকে তুলে নিল জাহাজে। তাকে বললাম, বার বৎসর বাপবিটি পাতানো থাকবে, তারপর তোকে মালা দিব। বড় ছেলেকে শ্বেত হাতীতে নিয়ে এসে এই রাজ্যের রাজা করে

দিল। ছোট ছুটোকে সেই দ্বীপ হ'তে এক ঘোষ উদ্ধার করল। তারা এই রাজার পাঠশালায় পড়ে। তারপর সব কথা বলল। শুনে ক্ষেপা বলল, তা'হলে সব কিছু ফিরে পেলাম। পেলাম না আমার সেই কণ্ঠকমল পাখী। এই বলে কণ্ঠকমল পাখীর জন্য ক্ষেপা কাঁদতে লাগল। তিন ছেলে, পুত্রবধূ ছুটে এলো। সকলের মিলন হলো।

সেই রাজ্যে তারা সুখে বাস করতে লাগল।

—o—

[লোককথাটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার, রাজুয়া গ্রামের লবু শেখ ও মহম্মদ ইসরাইল শেখের নিকট হইতে সংগৃহীত।]

। আপাং ও দুলাং ।

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোক-লস্কর, চাকর-বাকর নানা কাজে করছে ছোটাছুটি। উজির, নাজির সকলে সব দেখাশুনা করছে। রাজা বয়সে তরুণ। তার একমাত্র রূপবতী বৌ, নাম তার আদুরী। রাজার ঔরসে আর আদুরীর গর্ভে দুটো সুন্দর ছেলে হয়েছে। রাজা রাণী আদর করে ছেলে দুটোর নাম রেখেছে আপাং আর দুলাং। দুলাং একটু বড় আর আপাং ছোট। সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর সুন্দর দুই ছেলে—আপাং আর দুলাং আর রাজ্য নিয়ে রাজা বেশ সুখে আছে। একদিন রাজা কাজ সেরে বাড়ী ফিরে দেখছে—আদুরী বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে তার খুব জ্বর। রাজার পরিবারের অসুখ। এলো বৈদ্য, রোজা, হেকিম। কিন্তু জ্বর ভাল হয় না। এমনি করে আদুরী কঠিন অসুখে পড়ল। একদিন আদুরী রাজাকে ডেকে বলছে, দেখ রাজা, আমি আর বাঁচব না। আমাদের আদরের দুলাল আপাং আর দুলাং থাকল। আর একটা অনুরোধ, তুমি আর বিয়ে কোরো না। রাজা বললে ঃ না আদুরী, তুমি মরে গেলে আমি আর বিয়ে করবো না। কিছুদিন পর রাণী আদুরী মরে গেল। রাজবাড়ীর যে ধাই মা ছিল, সে আপাং, দুলাংকে মানুষ করতে লাগল। আপাং আর দুলাং রাজার দুই নয়নের মণি। রাজা তাদের চোখের আড় করে না। তাদের পড়ানোর জন্য এক পণ্ডিত ঠিক করলো রাজা। এই ভাবে দিন যায়।

একদিন উজির রাজাকে বলছে, মহারাজ! ঘর সংসারে স্ত্রী না থাকলে মানায় না। আপনি আর একটা বিয়ে করুন। রাজা

বলে, না উজির, আমি আদুরী রাণীর সঙ্গে সত্যবন্দী করেছি — বিয়ে করবো না। আপাং-দুলাং আছে আদরের ধন, তাদের নিয়ে থাকবো। উজির তখন রাজার কথা শুনে বলছে, মহারাজ, বিয়ে না করলে কষ্ট হবে আপনার। তাছাড়া আপাং-তুলাং-এর কোন কষ্ট হবে না। যে রাণী হয়ে আসবে তার তো ছেলে নাই। সুন্দর এই আপাং-তুলাংদের দেখে নতুন রাণীর মায়া বসে যাবে। বার বার উজিরের কথা শুনে রাজা বিবাহে রাজী হলো। অন্য দেশের এক রাজার, এক সুন্দরী আনবেহালা কন্যা ছিল। তার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হলো। আপাং, তুলাং বাপের সঙ্গে যেতে চায়। উজির বলে, না ছেলেদের নিয়ে যাওয়া হবে না। কি জানি ছেলে দেখে রাজা যদি বিয়ে না দেয় তার মেয়ের। রাজা বিয়ে করতে চলে গেল। আপাং, তুলাং দাই মায়ের কাছে বাড়ীতে থাকল। পরদিন বিয়ে করে রাজা আসছে পাল্কীতে করে, আসছে নতুন বাণী। ছোট ছেলে আপাং নতুন মা দেখতে ছুটে যেতে চায়। বড় ভাই তুলাং যেতে দেয় না। আপাং তবু যেতে চায়। শেষে আপাং যেই ছুটে পাল্কীর কাছে গিয়েছে, নতুন রাণী শুধাচ্ছে এ ছেলেটা কে? চাকরে বলছে, বাজার প্রথম রাণীর ছোট ছেলে। অমনি রাণী পাল্কী হতে তার বুকে মারল এক লাথি। আপাং পড়ে গেল ধূলায়। তুলাং ছুটে এসে ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, যেতে বারণ করলাম, তবু গিয়ে অপমানিত হলি। এদিকে রাজার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হলো, সে মেয়ে খারাপ। যুবতী হলে রাজ বাড়ীর তরুণ দারোয়ানের সঙ্গে তার ভালবাসা হয়। বিবাহ শেষে যুবতীর পিতা যখন তাকে শুধাল, মা তোমার কি চাই? মেয়ে তখন বাবাকে বলছে, বাবা! আমার চাই একটা বড় সিন্দুক, তাতে লাগানো থাকবে চারটি চাকা। তার মধ্যে আমি সব কিছু ভরে নিয়ে যাব। রাজার মেয়ের কথামত চাকাওয়ালা একটা সিন্দুক বানিয়ে দিলো। তার মধ্যে সযত্নে দারোয়ানকে ভরে, সে নিয়ে গেল স্বামীর ঘরে। রাজা যখন রাজ কাজে যায়, আপাং, তুলাং যখন পড়তে যায়, তখন সিন্দুক

খুলে দারোয়ানকে বার করে। তারপর খায়-দায় এক সঙ্গে বিছানায় শোয়। একদিন তুলাং পাঠশালে পড়তে গিয়েছে, আপাং তার বয়সী ছেলেদের সাথে সোনার ভেটুল নিয়ে খেলা করছে। খেলতে খেলতে সবকটা সোনার ভেটুল হেরে গেল আপাং। হেরে সে কাঁদতে লাগল। কান্না শুনে তুলাং ছুটে এল। ভেটুল হারান কথা শুনে ছেলের কাছে সে ভেটুল চাইল। তারা বলল, ভেটুল জিতেছি দিব না। তুলাং তখন ভেটুল আনতে অসময় বাড়ী ফিরে গেল। গিয়ে দেখে সিন্দুক খোলা দারোয়ান আর নতুন মা এক সঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ে তাদের চাদর। ঘুমিয়ে গেছে তারা। তুলাং তখন তার চাদরটা তাদের গায়ে দিয়ে, তাদের চাদরটা তুলে নিয়ে চলে গেল। ঘুম হতে উঠে রাণী চাদর বদলের কথা জানতে পারল। দারোয়ানকে সে ঢুকিয়ে দিল সিন্দুকের মধ্যে। নেড়েচেড়ে চাদরটি দেখে, মনে মনে বলল, এ চাদরতো তুলার গায়ে দেখেছি। তুলা এসব কথা কাউকে বলে না। রাণী তার সৎ ছেলেদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। একদিন রাণী চুল এলোমেলো করল, সারা গায়ে পাখীর রক্ত মাখল, তারপর ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁদতে লাগল। এই সব দেখে ঝি রাণীকে শুধায় কি হয়েছে? রাণী বলে সৎ ছেলেরা খেতে চেয়েছিল দিতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই তারা দুই জনে আমাকে মেরেছে। ঝি গিয়ে রাজাকে সব কথা বলল, রাজা বাড়ী এসে রাণীর অবস্থা দেখে খুব রেগে গেল এবং আপাং, তুলাংকে কঠিন শাস্তি দিতে চাইল। যে দাই ছেলে দুটিকে মানুষ করেছিল, সে ছুটে পাঠশালে পণ্ডিতের কাছে গিয়ে সব বলল। দাই অনুরোধ করল পণ্ডিতকে যে এযাত্রা যেন নিজে ছেলে দুটি সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করে। পণ্ডিত আপাং ও তুলাংকে সঙ্গে করে রাজার নিকট নিয়ে গিয়ে বলল, মহারাজ, পাঠশালায় পড়ছিল কোথাও যায় নি; এ যাত্রা ওদের মাফ করুন। রাজা বলল, এ যাত্রা আপনার কথামত ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে যদি এই রকম কাজ

করে তাহলে কঠিন শাস্তি দিব।

দিন যায়। রাণী মনে মনে ভাবে শত্রু ত্নটোকে যে করেই হোক সরাতে হবে। আবার রাণী চুল এলোমেলো করল যে তাকে ছিঁড়ে দিয়েছে। গায়ে মাখল ধূলা বালি কাদা। তার উপর ছিটালো পাখীর রক্ত। ঝি আবার দেখল। শুনে রাজার নিকট গিয়ে সব বলল। রাজা বাড়ী এসে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হলো, বলল, আজ ত্নই ছেলেকে জল্লাদ দিয়ে খুন করাব। তারপর সেই রক্ত দিয়ে তোমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিব, আর কপালে দিব ফোঁটা। দাই সব শুনল। তারপর সে একটা লিখন তার বিশ্বাসী লোকের নিকট হতে লিখে এনে রাজ বাড়ীর দরজায় টাঙিয়ে দিল।

লিখন—

আপাং ও ত্নলাং তোমরা এই লিখন পড়ে যেদিকে তোমাদের ত্ন'চোখ যায়, সেই দিকে চলে যাবে। তোমাদের সৎমা চুল ছিঁড়ে ধূলোকাদা, পাখীর রক্ত মেখে তোমাদের বাবাকে দেখিয়ে বলেছে যে, তোমরা ত্নই জনে তাকে মেরেছ। তাই তোমার বাবা তোমাদের খুন করার জন্য বাড়ীতে বসে আছে।

ইতি—দাই মা।

পাঠশালের পড়া শেষ করে ত্ন'ভাই মনের আনন্দে বাড়ী ফিরছে। খুব খিদে পেয়েছে, ভাত ইত্যাদি খাবে। কিন্তু বাড়ী ঢুকতে দেখে ত্নয়ারে টাঙানো 'লিখন'। লিখন পড়ে ত্নলাং আপাংকে বলল, ভাই, আর থাকা হবে না; এখনি পালাতে হবে, নচেৎ প্রাণ যাবে। আপাং বলছেঃ ভাই, জনমের মত চলে যাচ্ছি, একবার বাপের মুখ দেখবো। ত্নলাং বলছে, না। দেখা হলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু ছোট ভাই কিছুতেই শোনে না। তখন ত্নলাং আপাংকে কাঁধে নিয়ে জানালা পথে বাবাকে দেখালো। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখে চোখ পড়ে গেল। ত্নই ভাই ধরা পড়ে গেল। রাজার হুকুমে ত্ন'ভাইকে রসা দিয়ে বাঁধা হলো।

শহরের শেষে শ্মশান। তার পাশে মশান। সেখানে দু'ভাইকে নিয়ে যাওয়া হলো। জল্লাদ একে একে দুই ভাইকে কাটতে গেল। দুলাং বলছে, ভাই জল্লাদ আমাদের দু'ভাইকে এক সঙ্গে কাট। কারণ আমাকে যদি আগে কাট, আপাং দেখতে পারবে না। আপাংকে যদি আগে কাট, আমি দেখতে পারবো না।

ঃ গান ঃ

বাঁধ বাঁধ জল্লাদ ভাই একই রসিতে
আপাং আর দুলাংকে।
কাট কাট জল্লাদ ভাই একই চোটে
আপাং আর দুলাং-কে।

এই গান ও কান্না শুনে জল্লাদের মনে দয়া হলো। সে বলল, আপাং আর দুলাং তোমাদের মায়ের হাতে অনেক নিমক খেয়েছি। তোমাদের এই সর্তে ছেড়ে দিতে পারি যে, তোমরা এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে। আর এদেশে আসবে না। তাই হলো, আপাং আর দুলাং দেশ ছেড়ে দেশান্তরে চলে গেল। জল্লাদ একটা কুকুরের ছা মেরে মাটির কোটরায় করে রক্ত নিয়ে রাজাকে দিল। রাজা তা দিল রাণীকে, আর রাণী তা দিয়ে পায়ে আলতা ও কপালে ফোঁটা নিল।

ছাড়া পেয়ে জল্লাদের গুণ গাইতে গাইতে আপাং আর দুলাং চলে যাচ্ছে বাপের রাজ্য ছেড়ে। কয়দিন হাঁটার পর আপাং কাতর হয়ে গেছে। আর হাঁটতে পারছে না। তাই দেখে দুলাং তখন আপাংকে বলছে ঃ

ঃ গান ঃ

চল চল আপাং রে
এ দেশ থেকে চলে।
সতীন কাঁটা
বড় লেঠা
কোন্ দিন ফেলবে ভাইরে মেরে।
চল চল আপাং রে আমরা যাইগো দেশান্তরে।

আপাং আর তুলাং মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল। আর রাণী বলল আর দুঃখ নাই। সে মনের আনন্দে দারোয়ানকে নিয়ে কু-কাজ করতে লাগল।

আপাং আর তুলাং তার বাপের রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে আর এক রাজার রাজ্যে এসে হাজির হলো। দেখলো সামনে এক বিরাট শহর। শহর ঢোকার মুখে এক বিরাট দীঘি। তারা গিয়ে দীঘির পাড়ে এক বট গাছের ছায়ায় বসল। কিছুক্ষণ পর এক ঘোড়ার কচুয়ান সেখানে এলো দল কাট্‌তে। কচুয়ান দল কাটল। তুলাং তার কাছে গিয়ে বলল, ভাই আমরা বিদেশী। তোমার সঙ্গে দল কাটবো, তুমি যা দেবে, তাই খাবো আর তোমার সাথে থাকবো। আর তোমার এই কাটাদল দাও আমরা মাথায় করে নিয়ে যাই। কচুয়ান দেখল, ছেলে দুটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি ব্যবহার। তাই সে তাদের ভালবেসে ফেলল। বলল, তোমাদের দল নিয়ে যেতে হবে না। আমি দল নিয়ে যাবো। চল, তোমরা আমার নিকট থাকবে। আমি যা খাবার পাবো তা তিনজনে ভাগ করে খাবো। আপাং আর তুলাং এখন কচুয়ানের নিকট থাকে। মাঝে মাঝে তার কাজ করে দেয়। এই কচুয়ান এক সদাগরের ঘোড়া দেখাশুনা করে। সদাগর দেশে সদাগরি করে বেড়ায়। রাজার সে ডান হাত। কিন্তু সদাগরের মনে সুখ নাই। তার ছেলেপিলে নাই, একমাত্র সুন্দরী কন্যা কিন্তু তার পেটের অসুখ। পেট কন্‌কন্‌ করে। কেহ ভাল করতে পারে না। অনেক অনেক কবিরাজ, বৈদ্য এলো, কেহ কিছু করতে পারে না। আপাং আর তুলাং এই অসুখের কথা শুনল।

একদিন সে কচুয়ানকে বলল, ভাই আমি একবার মেয়েটিকে দেখতে চাই। তুমি একবার সদাগর ও তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর আমাকে দেখতে দেবে কিনা? সদাগর আর তার স্ত্রী কচুয়ানের মুখে কথা শুনে বলল, নিশ্চয় দেখতে দোব। যদি ভাল করতে পারে বহু টাকা ইনাম দিব। তুলাং তখন সদাগর কন্যাকে দেখতে

গেল। দেখে সে বলল এই কন্যাকে সারারাত পাহারা দিতে হবে। আর সে চাইল এক পোয়া ঘি, আর সাত মুখ যুক্ত প্রদীপ। প্রদীপের উপর ঘি ঢেলে দিয়ে সাতটি বাতি জ্বালিয়ে দিল দুলাং। তলোয়ার হাতে দুলাং বসে থাকে। এদিকে কন্যার পেটে বাস করে এক সাপ। সুতোর মতো সরু হয়ে নাক দিয়ে ঢোকে আর সুতোর মত সরু হয়ে নিশিভোর রাতে বেরিয়ে চরাট করে। তারপর আবার এসে ঢোকে নাক দিয়ে। এর জন্য কন্যার পেট কন্‌কন্‌ করে, ভাল হয় না। নিশিভোর রাতে সেদিন সাপ যেই বেরিয়েছে অমনি প্রদীপের আলোয় কানা হয়ে গিয়েছে। আর তলোয়ার দিয়ে সাপকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেছে দুলাং। এই সাপ মাটিতে পড়লেই মোটা হয়। সাপ মারা পড়ল। কন্যা বহু দিন পর বেভুল ঘুমাল। দুলাং তাকে জাগাতে বারণ করল। দুলাং-এর চেহারা আর কাজ দেখে সদাগর ও তার স্ত্রী খুব খুশী হলো। সদাগর কন্যার সঙ্গে দুলাং-এর বিয়ে দিল তারা। আপাং আর দুলাং সদাগরের বাড়ীতে সুখে বাস করতে লাগল। এই ভাবে দিন যায়।

সদাগর ঠিক করল সে বাণিজ্য করতে যাবে। দুলাং বলল, আপনি বুড়ো হয়েছেন কষ্ট হবে, বাণিজ্য করতে আমি যাই আপনার সঙ্গে। তাই ঠিক হলো। যাত্রার আগে দুলাং তার স্ত্রীকে বলল, আপাং থাকল তোমার জিম্মায়। আমার চোখের মণি, আদরের ছোট ভাই। একে ঠিকমতো যত্ন করে রেখো। স্ত্রী বলল, তাই হবে। দুলাং সদাগরের সঙ্গে বাণিজ্যে চলে গেল। এদিকে আপাং আর দুলাং-এর বাপ সেই রাজা রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে যে আপাং আর দুলাং তার দুই ছেলে সমুদ্রে সাঁতার কাটিছে। চেষ্টা করেও রাজা তাদের ধরতে পারছে না। ঘুম হতে জেগে মা-মরা দুই পুত্রের জন্য রাজা কাঁদতে লাগল।

: গান :

কোথা গেলি ওরে আমার আপাং দুলাং।

তোদের সৎ মায়ের কথা শুনে
পাঠালাম শ্মশানে
বুঝতে পারলাম না ছলাকলা
কোথা গেলি ওরে আমার আপাং তুলাং।

তারপর জল্লাদকে বলল, ভাই জল্লাদ আমাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যে ভাবে আমার তুই ছেলেকে কেটেছিস্ সেই ভাবে আমাকে কাট। পুত্র শোক আমি ভুলতে পারছি না। তখন জল্লাদ রাজাকে বলছে; মহারাজ আপনার তুই পুত্রকে আমি কাটি নাই। তারা ফকিরের বেশে দেশান্তরে চলে গিয়েছে। রাজা বলছে, তাহলে তাদের ফেরানোর উপায় কি? জল্লাদ তখন রাজাকে বলছে, মহারাজ! আপনি দেশে দেশে ঢেড়া দিয়ে প্রচার করুন যে, যারা তুঃখী, গরীব, ফকির তাদের অমুক দেশের বাদশা দান করবেন—কাপড়, টাকা-কড়ি ইত্যাদি, তাহলে আপনার ঐ তুই ছেলে ফিরে আসবে। কারণ তারা তো এখন ফকির। দেশে দেশে এই কথা রটনা হতেই, ফকির, গরীব, তুঃখীর দল রাজার রাজধানীতে আসতে লাগল। একদিন আপাং দেখছে অনেক ফকির পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। সে ফকিরদের শুধাল, ভাই তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ফকিররা বলল, অমুক দেশের বাদশা অনেক দান করবে, সেই দান আনতে যাচ্ছি। ফকিরদের সঙ্গে এই দান দেখতে যেতে সে ইচ্ছা করল; আর এ কথা সে তার ভাবীকে জানাল। কথা শুনে ভাবী বলল, যাওয়া হবে না। স্বামীর নির্দ্দেশের কথা তার মনে পড়ে গেল। আপাং কিছুতেই বারণ মানে না। তার ভাবী যেই অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি সে অন্য একদল ফকিরের সাথে মিশে রাজার দান দেখতে গেল। জল্লাদের কথামত সব ফকিরকে খেতে দিয়ে তাদের এক বড় ঘরে আটক করে রাখা হলো। এদের মধ্যে কে আপাং তুলাং তা খুঁজতে হবে। এই ভাবে প্রতিদিন ফকির আটক করতে লাগল রাজা।

এদিকে বাণিজ্য শেষ করে দুলাং ফিরে এসেছে। ভাইকে

দেখতে না পেয়ে তার কথা স্ত্রীকে শুধাল। স্ত্রী সব কথা বলল। শুনে স্ত্রীর উপর দুলার খুব রাগ হলো। স্ত্রী বলল, আমার কোন দোষ নাই। দুলাং তখন ফকিরের ছদ্মবেশে কাঁধে ঝোলা নিয়ে নোংরা কাপড় পরে হাতে একটা ডুব্‌কি নিয়ে পিতার রাজ্যে এসে গেল। রাজবাড়ীর দুয়ারে গিয়ে সে গান গাইতে লাগল ঃ

আমার হাতে ডুব্‌কি, কাঁধে ঝোলা
করি আমি গান।
এক বাদশা গেল বিয়ে করতে
কি কি পেল দান।
দান আনে সেই বাদশার নারী
এসে হলো গোসা ভারী
আপাং আর দুলাং-এ রাজা দিল বলিদান।

গান শুনে রাজা তখন ভাবছে, আমিই তো সেই বাদশা। কারণ আপাং দুলাং-এর নাম আছে গানে। রাজা তখন তার নতুন বিবিকে বলছে ঃ

আনো চাবি খুলবো সিন্ধুক
দেখবো কিবা আছে,
তোমার কথায় খুন করেছি
আপাং আর দুলাংকে।

গান শুনে রাণী বলছে ঃ

চাবিতো নাই আমার কাছে
হারিয়ে গেছে চাবি,
আপাং দুলাংকে ডাকো
এই কথা আজ ভাবি।
চালের বাতায় ছিল চাবি
চাবি নিল চোরে
কপাল আমার ভেঙে গেল
পড়লাম বিপদ ঘোরে।

এলো বিপদ খাটল না মোর

কোন ছলাকলা।

এ গোল আমার লাগিয়ে গেল

আপাং আর তুলাং।

চাবি না পেয়ে রাজা সিন্ধুকে মারে লাথি। সিন্ধুকের ডালা ভেঙে গেল। বেরিয়ে পড়ল, রাণীর ভাবের লোক। সিন্দুক সমেত তাকে পুঁতে ফেলা হলো। সব ফকিরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ফকির দল হতে আপাং এলো বড় ভাই তুলাং এর কাছে। বাপ তাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। রাজা তখন রাণীর বিচারের ভার দিল তুলাং-এর হাতে। তুলাং বলল, আমাদের মা মরে গিয়েছে ; আর একে যখন একবার মা বলেছি তখন এ মা হয়ে থাক। বাপ বলল না, যখন আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন একে পাঠিয়ে দাও বাপের বাড়ী। তাই হলো। শুভ দিন দেখে রাজা পুত্রবধূকে নিয়ে এলো। সকলে সুখে বাস করতে লাগল।

—০—

[বর্দ্ধমান জেলার রাজুর থানার রাজুয়া গ্রাম নিবাসী ঝড়ু শেখের নিকট হতে সংগৃহীত।

চোরচক্রবর্ত্তী রাজা

এক দেশে ছিল এক রাজা। উজির, নাজির, লোক লস্করে রাজ্য জমজমাট। কিন্তু রাজার নাই কোন পুত্র সন্তান। তার ছিল দুটি মাত্র কন্যা। কন্যাদের রাজা খুব ভালবাসেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাইকে নিজের কাছে রেখেছেন তিনি। জামাইদেরও রাজা নিজের ছেলের মত ভালবাসেন। একদিন রাজা রাজসভায় বসে সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বিদ্যা বড়? রাজার প্রশ্নের জবাবে কেহ বলে লেখাপড়া, কেহ বলে যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি বড়। রাজার ছোট জামাই এই সব কথা শুনে বললে,

"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা
যদি না পড়ে ধরা।
আর যদি পড়ে ধরা, তো
জীয়ন্তোয় মরা।"

এই কথা শুনে মনে মনে রাজা ঠিক করলো, চুরিবিদ্যা কেমন বড় তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সেদিন রাতে রাজ পোশাক ছেড়ে ছদ্মবেশ ধরে রাজা চুরি করতে গেল। রাজা একটা মাটি কাটা কোদাল নিয়ে রাজধানীর এক প্রজার বাড়ীতে দেওয়ালে সিঁদ দিয়ে চুরি করতে গেল। যে ঘরে রাজা সিঁদ দিচ্ছিল, সে ঘরের মালিক ও তার স্ত্রী মাটি কাটার শব্দ শুনে জেগে উঠল। রাজা যেই সিঁদ পথে ঘরে ঢুকেছে, অমনি তারা চোরকে ধরে ফেলল। তারপর চোরকে উই মার। মারের চোটে রাজা নিজের পরিচয় দিল। পরিচয় শুনে রাজাকে ছেড়ে দিয়ে চুরি করার কারণ শুধাল তারা। রাজা তখন সব কথা বলল।

জামাই-এর কথা পরখ করতে গিয়ে রাজা অপমানিত হলো, তাই রাগে, দুঃখে রাজা ছোট জামাই-এর প্রাণদণ্ড দিল। এই কথা শুনে ছোট মেয়ে বলল, তার জামাই যে তাকে বলেছিল "ধরা পড়লে জীয়ন্তে মরা" হবে। এই কথা শুনে কন্যার উপরও রাজা রেগে গেল। কন্যাকে রাজা বনবাসে দিল। রাজকন্যা তখন ছয় মাসের গর্ভবতী। রাজা কন্যার হাতে তার শীলমোহরযুক্ত একটা লিখন লিখে দিল।

ঃ লিখন ঃ

"চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা"— এই কথা তুমি বা তোমার পুত্র অথবা কন্যা কোনদিন যদি আমার নিকট প্রমাণ করতে পার, তাহলে সেদিন হতে এই লিখন বলে তুমি বা তোমার পুত্র অথবা কন্যা হবে এই রাজ্যের রাজা। আমি সেদিন স্বেচ্ছায় রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।"

লিখন শেষে নিজের নাম দস্তখত করে, তাতে রাজকীয় শীল-মোহর দিয়ে কন্যার হাতে দিল। তারপর একটি পাল্কীতে চাপিয়ে কন্যাকে রাজ্যের নিকটবর্তী এক গভীর বনের মাঝে রেখে এলো। স্বামীহারা বিধবা রাজকন্যা বনের মধ্যে পাল্কীর উপর বসে কাঁদতে লাগল।

একাকিনী রাজকন্যা কমলা পাল্কীর উপর বসে কাঁদছে, আর কাঁদছে। কান্না তার শেষ হয় না। কিছুক্ষণ পর এক কাঠুরে সর্দ্দার বনে কাঠ কাটার জন্য সদলে এসে হাজির হলো। বিজন বনে, পাল্কীর মধ্যে কান্নারত এক রূপবতী কন্যা দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। সর্দ্দার তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কমলা সর্দ্দারকে জানাল তার সব দুঃখের কথা। কাঠ কাটা শেষে সর্দ্দার তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে কন্যাস্নেহে পালন করতে লাগল। কিছুদিন পর কাঠুরের বাড়ীতে কমলা একটা পুত্র সন্তান প্রসব করল। যেমন নাক, তেমনি চোখ, গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট, আর সুন্দর চেহারা দেখে সকলে খুব খুশী। কন্যাও পুত্র পেয়ে সব

দুঃখ ভুলে গেল। তিলে তিলে সেখানে মানুষ হতে লাগল কমলার ছেলে। ছেলে পাঠশালায় যায় আর কাঠুরে ছেলেদের সাথে খেলা করে। ছেলেটি একদিন কাঠুরে ছেলেদের সঙ্গে চোর পুলিশ খেলা করছে। ছেলেটি সেজেছে পুলিশ আর কাঠুরের ছেলেরা সেজেছে চোর। শিশু বয়সে খেলাচ্ছলে চোর ধরে এমন ভাবে বিচার করছে যে, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে রাজকীয়তা। একদিন বৃদ্ধ রাজা সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ছেলেটির খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সে জানতে পারল না, এই ছেলে তার নির্বাসিত কন্যা কমলার ছেলে। রাজা ছেলেটিকে তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি উত্তর দিল, জানি না। খেলার সাথীরা এই কথা শুনে পাঠশালায় পড়তে গিয়ে সহপাঠিদের এই কথা বলে দিল। ছেলেরা সব বলে, আমার পিতার নাম অমুক, আমার পিতার নাম অমুক, কিন্তু কমলার ছেলে পিতার নাম বলতে পারে না। মনের দুঃখে বাড়ী এসে, ছেলে মাকে সব কথা বলল। ছেলের কথা শুনে, ছেলেকে বুকে চেপে ধরে মা সব কথা বলে, ছেলেকে তার পিতার নাম বলে দিল। সব শুনে ছেলে চুরিবিদ্যা শিখতে চাইল। সে তার মাকে বলল, এই চুরি বিদ্যা শিখে বাপের মৃত্যুর শোধ নেব।

কাঠুরেরা যে গ্রামে বাস করতো সেই গ্রামের পাশের গ্রামে ছিল এক চোরের সর্দ্দার। সে এখন বৃদ্ধ। তাকে গুরু ধরে, তার নিকটে ছেলেটি চুরিবিদ্যা শিখতে লাগল। শৈশবে ছেলেটির মা ছেলেটির নাম রেখেছিল গোপাল। সে গুরুর কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে চুরি বিদ্যা শিখতে লাগল। এক বৎসর ধরে সে চুরি বিদ্যার প্রাথমিক বিদ্যা শিখে ফেলল। গুরু বলল, বাবা গোপাল! আমার যা বিদ্যা সব তোমাকে শিখেয়েছি। আমাকে গুরু দক্ষিণা দিতে হবে। গোপাল বলে কী দক্ষিণা দিব ?

গুরু বলল, আগামী শনিবার অমাবস্যা। ঐ দিন রাতে আমি ঘরে শুয়ে থাকব। ঠিক আমার বুকের উপর টাঙানো থাকবে বড় একটা কাঁসার থালা। থালায় থাকবে জল। জলের

নীচে থালার মধ্যস্থলে থাকবে একটা রূপোর টাকা। এই টাকা এমনভাবে চুরি করতে হবে, যেন এক ফোঁটা জল গায়ে না পড়ে। গোপাল বলল, বেশ তাই হবে গুরুদেব।

গুরু চোর সর্দার শোবার আগে ঠিক তার বুকের উপর একটা থালা ঝুলিয়ে রাখল। তারপর তাতে জল ঢেলে, ঠিক তার মধ্যস্থলে রেখে দিল একটা রূপার টাকা। গুরু ঘুমিয়ে পড়ল। গোপাল দরজার ফাঁকে আঙ্গুল চালিয়ে ধীরে ধীরে খিল খুলে, আরও ধীরে নিঃশব্দে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। গুরু তখন ঘুমে মগ্ন। সে কোচরে করে নিয়ে গিয়েছিল ছাই। সেই ছাই সে টাকার চারি পাশে হাতে করে দিয়ে দিল। জল শুষে গেল। অতি ধীরে টাকাটি তুলে ধীরে ধীরে দরজা লাগাল। তারপর আঙ্গুল চালিয়ে খিলটি লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলো। গুরু ঘুম হতে উঠে ঝোলান থালা ও নিজের বুক পরীক্ষা করে জলের দাগ দেখতে পেল না। ভাবল, আজ গোপাল চুরি করতে আসে নাই। গোপাল সকালে এসে গুরুর চরণে টাকাটি রেখে প্রণাম করল। এই দেখে গুরু অবাক। গোপাল গুরুকে টাকা চুরির কথা শুনাল। গুরু শুনে বলল, তুই বড় চোর হবি। তবে আমার বিদ্যা শেষ।

গোপাল আরও ভালভাবে চুরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য সেই পরগণায় যে বড় চোর তার নিকট গেল। এ চোর পূর্বের চোরের চেয়েও বড়। তবে সেও বুড়ো হয়েছে। গোপালকে সে চৌর্য মন্ত্র দিয়ে চুরি শেখাতে লাগল। এক বৎসর ধরে গোপাল তার নিকট চৌর্য বিদ্যার নানা কলা কৌশল শিখল। শিক্ষা শেষ হ'লে গুরু শিষ্যের নিকট গুরু দক্ষিণা চাইল। এবারের গুরু দক্ষিণা হলো গাছের ডালে চিল বসে ডিমে তা দিবে। গাছে উঠে সেই তা-দেওয়া ডিম তুলে আনতে হবে। ডিম এমনভাবে আনতে হবে, চিল যেন জানতে না পারে। বনের ধারে গাছের ডালে ছিল চিলের বাসা। একটা চিল সেখানে বসে ডিমে তা দিচ্ছিল। গোপাল কালিঝুলি মেখে সারা গায়ে পাতা যুক্ত লতা জড়িয়ে ধীরে ধীরে

চিলের বাসার পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে বসল। তারপর দুটি আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল অতি ধীরে। সেই দুটি আঙ্গুলে তুলে আনল একটা ডিম। চিল তায়ে বসে থাকল, কিছুই জানতে পারলো না। সেই ডিম গুরুর হাতে দিল। গুরু ডিমটা সিদ্ধ করে খেতে বলে দিল। গুরু বলল, তুমি হবে সবচেয়ে বড় চোর। গুরু শিষ্যকে বলল, আমার বিদ্যা শেষ। গোপাল আরও চুরিবিদ্যা শিখতে চাইল। ঐ গুরু বলল: এখান থেকে পঞ্চাশ কোশ দূরে আছে এক শহর। সেই শহরে আছে এক অতি বৃদ্ধ চোর। সে যাকে তাকে বিদ্যা শেখায় না। পরগণার চোর তাকে একটা লিখন লিখে দিল। সেই লিখন নিয়ে গোপাল গিয়ে হাজির হলো সেই বৃদ্ধ চোরের কাছে। বৃদ্ধ চোর সব শুনে তাকে চৌর্যবিদ্যা শিক্ষা দিতে শুরু করল।

পাঁচ বৎসর ধরে সে নিষ্ঠার সঙ্গে চুরি বিদ্যা শিখল। শিক্ষা শেষে পরীক্ষা ও গুরু দক্ষিণা। এবারের দক্ষিণা থালা হতে টাকা বা তায়ের ডিম চুরি নয়। এ পরীক্ষা কঠিন। সেই শহরে ছিল এক জাগ্রত ডাকাতে কালী। এই কালীর একটা মানসিক পাঁঠা ছিল। গুরু বলল, এই পাঁঠা এমন ভাবে চুরি করে কেটে খেতে হবে যে, মা কালী যেন জানতে না পারে। গোপাল এখন চতুর চোর, মা কালীর পাঁঠা খাবার আয়োজন সে করতে লাগল। তারপর একদিন সে পাঁঠা খেয়ে ফেলল। মা কালী পাঁঠা দেখতে না পেয়ে রেগে আগুন। যে তার পাঁঠা খেয়েছে, তাকে সে কঠিন শাস্তি দেবে। প্রথমে লোহার খাঁড়াদের ডাকা হলো, কে পাঁঠা কেটেছে বলার জন্য। কেহ বলতে পারে না। তারপর চন্দ্র, সূর্যকে ডাকা হলো, তারা বলল, আমরা যতক্ষণ আকাশে ছিলাম ততক্ষণ পাঁঠা কাটা দেখি নাই। ডাকা হলো আগুন, মাটি ও ধাতু নির্মিত হাঁড়িকে, ডাকা হল জলকে। আগুন বলে রাঁধি নাই, জল বলে সিদ্ধ করি নাই, হাঁড়িরা বলে আমাদের গর্ভে রেখে রাঁধা হয় নাই। তখন মা কালী বলল, যে আমার পাঁঠা খেয়েছিল আমার নিকট আয়,

আমি বর দিব। বৃদ্ধ গুরুকে সাথে নিয়ে গোপাল মা কালীর কাছে হাজির হয়ে জোড় হাতে দাঁড়াল। মা কালী বলল, কিভাবে পাঁঠা খেয়েচি্স বল। গোপাল বলল, পাঁঠা কেটেছি সূর্য অস্ত গিয়েছে, চাঁদ উঠে নাই সেই সময়। মা কালীর হাতের খাঁড়ায় কেটেছি যার জন্য সে ভয়ে বলেনি। মরা ফেলা ছুতো হাঁড়ি ধুয়ে, ধান ভিজে জলে আঁতুরের কঠোর অশৌচ আগুনে রান্না করেছি। যার জন্য কেহ সাক্ষ্য দিতে পারে নি। এই কথা শুনে মা কালী তাকে বর দিল, চুরি করার সময় তোকে কেহ ধরতে পারবে না। গুরু-শিষ্য মা কালীকে প্রণাম করল।

চুরি বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে মায়ের নিকট হতে লিখনটি নিয়ে দিয়ে দাদুর রাজ্যে যাবার আয়োজন করল গোপাল। তৎপূর্বে সে দাদুকে লিখল, এক বড় চোর তোমার রাজ্যে চুরি করতে যাবে, বল থাকেতো তাকে আটকাও। রাজা সব শুনে গেটে গেটে পাহাড়া বসাল। দুই রাজ্যের মধ্যে আছে এক নদী। বিনা অনু-মতিপত্রে পারাপার নিষিদ্ধ হলো বিদেশীর। গোপাল নদীর এপাড়ে অন্য রাজ্যের ছোট শহরে নানা কাজ করতে লাগল। একদিন এলো এক মাদুর বিক্রেতা। সে যাবে নদীপারের রাজ্যে মাদুর বেচতে। কিন্তু তার এক বোঝা মাদুরের একটা লোক দরকার। গোপাল মজুরীর বিনিময়ে মাদুর বয়ে দিতে রাজী হলো। মাদুর বিক্রেতা তার ও তার মুনিশের জন্য নৌকা পাড়ের ছাড়পত্র যোগাড় করল। এইভাবে মাদুর বিক্রেতার সঙ্গে নদী পার হয়ে একটা গাড়ীতে মাদুর তুলে দিল। নদীর ধারে মাঠ। মাঠে চাষীরা চাষ করছে। মাঠের শেষে নগরের সিংহদ্বার দেখা যাচ্ছে। নগরে ঢোকার ছাড়পত্র তার নিকট নাই। এক স্থানে সে দেখল এক বৃদ্ধ চাষী জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে। বুড়ো ক্লান্ত, ছেলেপিলে নাই। জলখাবার গামছায় বাঁধা। বুড়োর জমির আলে গোপাল বসল ও সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগল। বুড়ো জল খেতে এলো। গোপাল ততক্ষণ তার লাঙ্গলটা বয়ে দিতে চাইল। বুড়ো রাজী হলো। বুড়োর জমির

আলে ছিল একটা বটগাছ। তার ছায়ায় জলখাবার খেয়ে গামছাটা বিছিয়ে বুড়ো একটু গা-গড়া দিয়েছে, আর বুড়ো ঘুমিয়ে পড়েছে। গোপাল তখন লাঙ্গলটা কাঁদালে দিয়ে জোয়ান বলদ তুটোর পিঠে মেরেছে তুই বাড়ি। গরু তুটো ঘরমুখো হয়ে ছুটতে লেগেছে। সেও গরু তুটোর পিছনে পিছনে শহরের সিংহদ্বারে ঢুকে পড়েছে। তারপর গরু তুটো ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে বুড়ো ঘুম হতে উঠে দেখে গরু নাই জমিতে। কাঁদালা লাঙ্গল নিয়ে গরু তুটো ছুটছে। বুড়োও ছুটতে লেগেছে। শহরে ঢুকে লাঙ্গল গরু নিয়ে সে বাড়ী চলে গেল।

পথের ধারে ছিল এক পরামাণিকের চুল কাটার ঘর। গোপাল পরামাণিকের ঘরে গিয়ে বসল ও শুধাল, ভায়া চার টাকার ছাঁট ছাঁটতে পারবে?

পরামাণিক : হ্যাঁ, পারব।

পরামাণিক গোপালের চুল ছাঁটতে লাগল। চুল ছাঁটা শেষ হলে বলল, এতো চার টাকার চুল ছাঁটা হয় নাই। যাক চার টাকাই দিব। তোমার কাছে একশো টাকার ভাঙ্গানী আছে?

পরামাণিক : না।

গোপাল বলল, তোমার একটা ছেলে পাঠিয়ে দাও টাকা ভাঙিয়ে তার হাতে টাকা দিচ্ছি। গোপাল নাপিতের ছেলেকে নিয়ে ঢুকল এক মিষ্টির দোকানে। দোকানদারকে বলল, তু'ঠোঙা ভাল মিষ্টি দাও। তারা তাই দিল। নাপিতের ছেলে ও গোপাল সেই মিষ্টি খেয়ে বলল, তু'সের মিষ্টি বেঁধে দাও। ময়রা তু'সের মিষ্টি বেঁধে দিল। দাম কত, শুধিয়ে বলল, একশো টাকার ভাঙ্গানী আছে? ময়রার ছোট দোকান বলল, না ভাঙ্গানী হবে না। গোপাল বলল, আমার ছেলে থাকল, টাকা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। মিষ্ট নিয়ে একজন মজুরকে তুটো টাকা দিয়ে তার সঙ্গে যেতে বলল। মজুর নিয়ে সে ঢুকল একটা বড় কাপড়ের দোকানে। বলল তু'হাজার টাকার ধুতি, শাড়ী, জামা বেঁধে দাও, কিনব। কাপড় বেঁধে দিল

দোকানদার। বলল একটা ধুতি দেখি। একটা ভাল ধুতি নিয়ে সে বলল, আমি ধুতিটা একটু দেখিয়ে আসি আমার ভাইকে, সে পাশের দোকানে মিষ্টি খাচ্ছে। তারপর এখুনি এসে টাকা দিয়ে কাপড় নিয়ে যাব। থাকল আমার লোক। মজুরটি বসে থাকল। মিষ্টি আর কাপড় নিয়ে গোপাল অন্য দিকে চলে গেল। ক্রমে নাপিত, ময়রা ও কাপড়ওয়ালা সব জানতে পারল। চোর এসে গিয়েছে বলে একটা সোরগোল উঠল। এদিকে গোপাল ধুতি জামা ভাল ভাবে পরে মিষ্টিব হাঁড়ি ও নতুন কাপড়টা থলেতে ভরে বাজার ছাড়িয়ে একটা পাড়ায় এসে তার মাসীর খোঁজ করতে লাগল। গোপাল বলল, খুব ছোটতে এই পাড়ায় আমি আমার মায়ের সঙ্গে বড় মাসীর নিকট ছিলাম। সেই পাড়ায় ছিল এক বুড়ী। সে থাকে একা। তার এক বোন ও বোনপো ছিল। তারা এক সময় কিছুদিন তার নিকটে ছিল। পাড়ার লোকেরা বুড়ীর বাড়ীতে গোপালকে নিয়ে গেল। বুড়ীকে গোপাল ধুতি ও মিষ্টির হাঁড়িটা দিল।

এই বুড়ী রাজ বাড়ীতে কাজ করত। সে এসে বৈকালে বোনপোকে বলল, বাবা রাতে বেরিয়ো না। শহরে এক বড় চোর এসেছে শুনে এলাম। সে নাপিত, ময়রা ও এক কাপড়ের দোকানে চুরি করেছে। আজ রাতে রাজার কর্মচারী সাত ভাই পালোয়ান শহরে রুণ দেবে। গোপাল শুধাল, তাদের বাড়ীতে আর কে আছে? বুড়ী বলল, তাদের একটা ছোট বোন আছে। বহুদিন বিয়ে হয়েছে, তবে জামাই অনেকদিন আসেনি। রাতে গোপাল কোচানো ধুতি জামা পরে, জামাই সেজে হাতে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে পালোয়ানদের বাড়ী গেল। বাড়ীর দরজাব নিকটে ছিল একটা থাম। থামের আড়ালে সে লুকিয়ে রইল। ঘোড়ায় চেপে সাত ভাই পাহারাওয়ালা বেরিয়ে গেল। গোপাল জামাই সেজে তাদের বাড়ীতে ঢুকল। অনেকদিন পর জামাই এসেছে। বাড়ীতে ভাল খাবার তৈরী হলো। সাত বৌ ননদকে নানা রকম সোনার

গহনা, সোনার কাজ-করা শাড়ী পরিয়ে জামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল। গোপাল তার ইজ্জত নষ্ট করল না। সে ঘুমিয়ে গেলে তার সব গহনা একে একে খুলে নিল, তারপর সোনার কাজ-করা কাপড়টাও খুলে নিয়ে মেয়েটাকে উলঙ্গ রেখে গহনা ও কাপড় নিয়ে অন্য পথে চম্পট দিয়ে মাসীর বাড়ীতে শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে জেগে উঠে স্বামীকে ঘরে না পেয়ে, নিজেকে গহনাহীন উলঙ্গ দেখে মেয়েটি কাঁদতে লাগল। বৌদিরা ছুটে এলো। সব দেখে সঙ্গে সঙ্গে কাপড় এনে পরতে দিল। ভোর রাতে সাত ভাই এসে সব শুনল। রাজা শুনল। সাত ভাই পালোয়ান পাহারাদারদের রুণ দেওয়া বন্ধ হলো। রাজা হুকুম দিল — আজ রাতে শহর কতোয়াল একা পাহারা দেবে। কারণ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

বুড়ী এসে বোনপোকে বলল, সব কথা। সব শুনে গোপাল বলল, কতোয়ালের কে আছে? বুড়ী বলল, তার এক ভাইপো আছে, ৬।৭ বৎসর হলো আসেনি, থাকে কোথাকার এক শহরে, তোর মত বয়স। তুই বাবা দিনে যেখানে যাবি যাস, রাতে কোথাও যাস্ না। না মাসী, আমি রাতে কোথাও যাব না। সেদিন সন্ধ্যার পর কতোয়ালের ভাইপো সেজে তার বাড়ীতে গেল গোপাল। বহুদিন পর ভাইপোকে পেয়ে কাকা খুসী। কতোয়ালের কোন সন্তানাদি ছিল না। এদিকে কতোয়াল তৈরী হচ্ছে শহরে রুণ দেবার জন্য। এই দেখে ভাইপোবেশী গোপাল শুধাচ্ছেঃ কাকা, কোথায় যাবে?

কাকাঃ শহরে এক বড় চোর এসেছে, সে কাল সাতভাই পালোয়ানদের বাড়ীতে চুরি করেছে। রাজা আমাকে এই চোর ধরার হুকুম দিয়েছে। তাই চোর ধরতে যাচ্ছি।

ভাইপোঃ আমি যাব তোমার সঙ্গে।

কাকাঃ না তোমাকে যেতে হবে না। বড় চোর, কখন কি হয়। কিন্তু ভাইপো নাছোড় বান্দা। শেষে ভাইপোকে নিয়ে কতোয়াল

শহরে বেরুল। তারা দুইজনে বড় বড় রাস্তা জেলখানা, রাজবাড়ী আসপাশ পাহারা দিতে লাগল। ভাইপো র ব্যবহারে কাকা খুসী। একস্থানে ভাইপো দেখল একটা যন্ত্র। ভাইপো বলল, এটা কি? কাকা ঃ এটা দুষ্ট বন্দীদের ধরে রাখার যন্ত্র। এই চাকটা ডাইনে ঘোরালে এটা উঠে পড়বে। এর নীচে দুষ্ট চোরদের রেখে বাঁয়ে ঘোরালে এটা চোরের বুকে চেপে বসে যাবে। ভাইপো যন্ত্রটার কাছে শুয়ে পড়ে যন্ত্রটা পরখ করতে চাইল। কাকা বলল, না কোথায় বুকে পিঠে লাগবে। আমি এর নীচে শুচ্ছি, তুমি চাকাটা বাঁদিকে ঘোরাও। কতোয়াল যেই শুয়েছে। গোপাল আচ্ছা করে কয়েক পাক্ দিয়ে কতোয়ালকে বন্দী করে চলে গেল মাসীর বাড়ী।

সকালে বন্দী শহর-কতোয়ালকে উদ্ধার করা হলো। বুড়ী রাজ বাড়ীতে কাজ করতে গিয়েছিল। সে সব কথা বোনপোকে বলল। আর বলল, আজ স্বয়ং মন্ত্রী শহর রুণ দেবে। গোপাল বলল, মাসী মন্ত্রীর কে আছে? মাসী ঃ মন্ত্রীর কেউ নাই। তবে মন্ত্রী খুব শিবের ভক্ত। শিব তার ইষ্ট দেবতা। শিব পূজা না করে মন্ত্রী কিছু করে না।

মন্ত্রী শিবপূজা করে রাত্রে চোর ধরতে গেল। এ দিকে গোপাল এক গোয়ালার ঘর হতে খুলে আনল একটা জোয়ান ষাঁড়। তাকে নিয়ে গেল এক তে-মাথার রাস্তায়। সেখানে থলেতে করে আনল এক থলে খোল। খোল খেতে দিল তাকে। খোল খেয়ে ষাঁড়টি তার সামনে শুয়ে পড়ল। গোপাল শিব সেজে গাঁজা খেতে লাগল। তার পরনে বাঘছাল, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল, জটার উপর বাঁকা একফালি চাঁদ। রুণ দিতে মন্ত্রী তে-মাথার মোড়ে এসে হাজির। এখানে শিব দেখে সে গড় হয়ে প্রণাম করল। গোপাল শিববেশী। বলল, আমি তোর ইষ্ট দেবতা। তোর পূজায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তোকে বর দিতে এসেছি। তোর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে। আমার এই ষাঁড়ের পিঠে চেপে চোখ বন্ধ করে

বস। এই ষাঁড় তোকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাবে। ষাঁড়ের পিঠে মন্ত্রীকে চাপিয়ে দিতেই, ষাঁড় তাকে নিয়ে গোয়াল ঘরে চলে গেল। দড়ি খোলা ষাঁড়। অন্য গরুদের গোঁতাতে লাগল। সব গরু দড়ি ছিঁড়ে গোঁতা গোঁতি করতে লাগল। গরুদের হুটপট শব্দ শুনে গোয়ালারা ছুটে এলো গোহালে। এসে দেখে এক গরু চোর। চোরকে ধরে ফেলল তারা। তাকে গোয়ালের খুঁটিতে বেঁধে রাখল। সকাল হলে দেখল মন্ত্রী। তখন তারা এর কারণ শুধাল। মন্ত্রী রাতের সব খবর বলল। সব দেখে শুনে রাজা বলল, আজ রাতে আমিই পাহারা দেব।

দিন গেল রাত এলো। রাজা রাজ পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে শহর রুণ দিতে বেরুল। বীরদর্প ভরে রাজা খুঁজে বেড়ায় চোরকে। মাসীর নিকট রাজার পাহারা দেওয়ার খবর শুনে ছেঁড়া কাপড় পরা এক গরীব সেজে রাস্তার পাশে একটা ভাঙা ঘরে জাঁতা ঘুরিয়ে গম ভাঙ্‌তে লাগল। পাহারা দিতে দিতে রাজা জাঁতা-ওয়ালার নিকট শুধাল, এদিকে কোন লোককে যেতে দেখছিস্? জাঁতাওয়ালা বলল, হুজুর যখন পূর্বমুখে গেলেন, আর একটা লোক চকিতে পশ্চিম মুখে চলে গেল। কথা শুনে রাজা পশ্চিম মুখে ঘোড়া ছুটাল। কিন্তু দেখা পেল না। ফিরে এসে আবার শুধাল, কইরে বেটা, দেখতে পেলাম না। সে বলল, হুজুর যেই আপনি পশ্চিমে গিয়েছেন, আর বেটা পূর্বদিক চলে গেল। এই ভাবে পূর্ব পশ্চিমে রাজা অনেকক্ষণ ফিরল। রাজা বলল, তুই আমার পোশাক পরে ঘোড়ায় চাপ, আর আমি তোর পোশাক পরে এখানে থাকি। তা'হলে বেটাকে ধরে ফেলব। তাই হলো। গোপাল রাজার পোশাক পরে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজবাড়ী চলে গেল। রাণী দরজা খুলে দিল। গোপাল দরজার উপর লিখনটি আঁটা দিয়ে এঁটে রাণীর পাশে শুয়ে পড়ল। সকাল হলে ছেঁড়া কাপড় পরে রাজা এসে হাজির। রাজা যেই ঘরে ঢুকতে যাবে, অমনি গোপাল বলল, এ রাজ্য আমার, তুমি দূরে চলে যাও।

রাজা দেখে এতো সেই জাঁতাওয়ালা! রাজা বলল, বেটা তোর প্রাণদণ্ড দেব। তুই চোর, তুই আমার সঙ্গে রহস্য করছিস। গোপাল বলল, দরজায় কী লেখা আছে পড়। রাজা নিজের 'লিখনটি' পড়ে সব জানতে পারল। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

তারপর রাজা তাকে 'চোর চক্রবর্তী' উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসাল। নতুন রাজা তার মাকে কাঠুরে সর্দ্দারের বাড়ী হতে নিয়ে এলো। তারপর কাঠুরে সর্দ্দার ও বুড়ী মাসীকে অনেক কিছু ইনাম দিল।

—৭—

[বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার, একাইহাট গ্রামের আব্দুল কাদের খানের নিকট হতে সংগৃহীত।]

। সতী কমলা ।

চন্দনপুর গ্রামে ছিল এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। স্বগ্রামে এবং ভিন্ন গ্রামে তার ছিল অনেক শিষ্য। শিষ্যরা তাকে গুরুদেব বলে ডাকতো। তাই সকলের নিকট তিনি গুরুদেব নামে পরিচিত। গুরুদেব কয়েকটা দূর গ্রামে শিষ্য বাড়ী যাবেন। স্বগ্রামে সদানন্দ নামে তার একটি যুবক শিষ্য আছে। সদানন্দ চাষী। দুটো ভাল বলদ আছে। আছে গোগাড়ী ও টপ্পর। গুরুদেব সদানন্দকে বলল, তোমার গাড়ীতে করে আমাকে শিষ্য বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। সদানন্দ বলল, নিয়ে যাব তবে পথে যা দেখবো তার মানে বলে দিতে হবে! গুরুদেব বলল, বেশ তাই হবে। তারপর যাবার আগের দিন সদানন্দ গাড়ী বাঁধল, অর্থাৎ গাড়ীর উপর টপ্পর চাপিয়ে রসা দিয়ে গাড়ীর সঙ্গে বাঁধল। টপ্পরের মধ্যে গাড়ীর উপর লম্বা লম্বা খড় পুরু করে বিছিয়ে দিল। তার উপর বিছিয়ে দিল কম্বল। বস্তায় ভরে নিল ছানি, সাঙ্গালে ভরে নিল দা, রুদখুলি ইত্যাদি, ছোট খুঁতিতে ভরে নিল খৈল। গরুর ছানি খাবার ডালা, আর জল তোলার ছোট বালতি গাড়ীর নীচে বাতার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল। একটা লণ্ঠনে তেল ভরে গাড়ীর নীচে ঝুলিয়ে দিল। সন্ধ্যার সময় গুরুদেব বসল গাড়ীতে। সদানন্দ ছেড়ে দিল গাড়ী। গাড়ী চলছে চলছে। চন্দনপুর হতে গাড়ী চলছে পশ্চিম মুখে মেঠো পথ ধরে। অজয় নদী, রসুই, তেওড়া, বাকলশা, গণফুল, ভাণ্ডারগড়িয়া, নপাড়া, বিশ্রামতলা ছেড়ে চলেছে গাড়ী। পথে পড়ে বাঁকুই-বাঁশ্ড়া, তিলডাঙ্গা, ভবানীবেড়া, শাইলোর ডাঙ্গা-পাড়। তারপর শামুক শেহালা পার হয়ে বাদশাহী সড়কের মোড়। তখন ভোর হয়েছে স্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছে। গুরু গাড়ী

হ'তে নেমে মোড়ে পড়ে থাকা তুটো মড়ার মাথায় লাথি মেরে, পুকুর ঘাটে-পা ধুয়ে গাড়ীতে উঠল। সদানন্দ শুধায় গুরুদেব, মড়ার মাথা তুটোয় লাথি মারলেন কেন? গুরুদেব বলে, ও কিছু না এমনি। সদানন্দ বলে, বলতে হবে, কেন লাথি মারলেন নচেৎ এখান হতেই গাড়ী চন্দনপুরের দিকে ঘোরাব। গুরুদেব বলে, আচ্ছা শোন তবে: কমলগড়ের রাজা ছিল নিঃসন্তান। তার ছিল একমাত্র রাণী নাম অমলাবতী। রাণীর সেবা করার জন্য ছিল এক দাসী। দাসী সারাদিন রাজবাড়ীতে রাণীর নিকট থাকতো এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়া করতো। একদিন সকালে রাজ অন্তঃপুর হতে, রাজার নিকট খবর পাঠানো হলো যে দাসী কাজে আসে নি। রাজা মন্ত্রীকে পাঠাল দাসীর খোঁজ নিতে। মন্ত্রী দাসীর বাড়ী খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে দাসী উনুন জেলে রান্না করছে। মন্ত্রী দাসীকে বলল: কি রে, তু উনুন জেলে রান্না করছিস, তু তো রাজ বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করিস।

দাসী মন্ত্রীকে বলল: মন্ত্রী মশায়, রাজা-রাণী আঁটকুড়ো-আঁটকুড়ি, ওদের মুখ দেখলে দিন ভাল যায় না, তাই রান্না করে খেয়ে তবে যাব।

মন্ত্রী: রাজা-রাণীকে তুই আঁটকুড়ো, আঁটকুড়ি বলছিস্, সাহস তো কম নয়!

দাসী: আঁটকুড়ো, আঁটকুড়িকে আঁটকুড়ো, আঁটকুড়ি বলব তাতে আর ভয়ের কি আছে? মন্ত্রী কথা না বাড়িয়ে রাজাকে এসে সব কিছু বলল। রাজার সন্তান না হওয়ায় খুব তুঃখিত ছিলো। মন্ত্রীরও কোন সন্তান ছিল না। রাজা আর মন্ত্রী একসঙ্গে যুক্তি করে মনের তুঃখে চলে গেল নিকটবর্তী গভীর বনে। বন পথে চলতে চলতে তাদের সঙ্গে দেখা হলো এক সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী তাদের তু'জনকে ডেকে কাছে বসাল। রাজা মন্ত্রী তাদের তুঃখের কথা জানাল সন্ন্যাসীকে। সব শুনে সন্ন্যাসী রাজার হাতে দিল একটা লাঠি। তারপর একটা মরা গাছ দেখিয়ে বলল, ঐ মরা

গাছে লাঠির বাড়ি মার, মারলেই পাবি একটা কাঁচা আম। আমটা নিয়ে আয় আমার কাছে। সন্ন্যাসীর কথামত রাজা মরা গাছে লাঠির বাড়ি মারলেই পেল একটা কাঁচা আম। আমটা এনে রাজা দিল সন্ন্যাসীর হাতে। সন্ন্যাসী আমটা তু'ভাগ করে এক ভাগ দিল রাজাকে, আর অন্য ভাগ দিল মন্ত্রীকে, তারপর রাজ্যে ফিরে যেতে বলল। বলল, তাদের তু'জনার সন্তান হলে বন্ধু পাতাবে, আর কন্যা হলে সই পাতাবে। যদি তু'জনার পুত্র হয়, তাহলে শৈশবে তাদের বিয়ে দিতে হবে, তেমনি বয়সী কন্যার সাথে। তবে রাজ-পুত্রের বিয়ে আর একবার দিতে হবে যুবক হলে। রাজা ও মন্ত্রী রাজ্যে ফিরে গেল। বৎসরান্তে তাদের ঘরে এলো তুটো পুত্র। অন্য দেশের এক শিশু রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের এবং আর এক দেশের এক মন্ত্রীর শিশুকন্যার সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের বিয়ে দেওয়া হলো। ক্রমে তারা যখন যুবক হলো তখন যুবক রাজপুত্রের বিয়ে দিল অন্য একদেশের রাজকন্যার সঙ্গে। এই কন্যার নাম কমলা।

একদিন রাজপুত্র তার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে বলল, কোন শিশুকালে তোমার ও আমার বিয়ে হয়েছিল, তাদের কোন খবর জানি না, চল, একবার সেখান হতে ঘুরে আসি। মন্ত্রীপুত্র বলল, বেশ তাই হোক।

ঠিক হলো প্রথম রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ী ও পরে মন্ত্রীপুত্রের শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হবে। তারপর একদিন তুই বন্ধুতে রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ীতে হাজির হলো। রাজা খুব খুসী, কারণ অনেকদিন পর জামাই এসেছে। মেয়ে এখন যুবতী হয়েছে। খুব আদর যত্ন হলো। অতঃপর রাতে একসঙ্গে শোবার ব্যবস্থা হলো। রাজপুত্র বলল, একটা রাত বন্ধুকে নিয়ে রাজকন্যা সহ একই ঘরে থাকবো। রাজকন্যা রাজী হয় না। শেষে ঠিক হলো ঘরের একদিকে তুটো খাট পাতা থাকবে। এক খাটে রাজপুত্র ও অন্য খাটে মন্ত্রীপুত্র থাকবে। আর অন্য পাশে আর একটি খাটে থাকবে রাজকন্যা। সকলে একসঙ্গে ঘরে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

মন্ত্রীপুত্র ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল। একটু রাত হলে রাজকন্যা দু'জনকে পরীক্ষা করে দেখল ওরা ঘুমিয়ে গিয়েছে। তখন সে একটা আলমারী খুলে একটা বড় বগীথালা বার করল। সেই থালায় সাজান ছিল অনেক ভাল ভাল খাবার। তারপর ঘরের দেওয়ালের বিশেষ একস্থানে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এক পাশ ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ। মন্ত্রীপুত্র শুয়ে শুয়ে সব দেখছে। তারপর কন্যা এক হাতে খাবার আর অন্য হাতে একটা বাতি নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে চলে গেল। মন্ত্রীপুত্র চট করে উঠে সেই সুড়ঙ্গ পথদিয়ে চলতে লাগল। দেখল সুড়ঙ্গ পথটা একটা বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে। সুড়ঙ্গ হতে মন্ত্রীপুত্র দেখল, রাজকন্যা বাগানের মালীর সঙ্গে কথা বলছে। মালী রাজ কন্যাকে গালাগালি দিচ্ছে ও বলছে আজ কেন এত দেরী? রাজ-কন্যা বলল, তার স্বামী আর তার বন্ধু এসেছে। তারা না ঘুমালে, কি করে আসি তাই দেরী হয়েছে। মালী বলল, তুই কাকে বেশী ভাল বাসিস, আমাকে না তোর স্বামীকে? রাজকন্যা বলল, তোমাকে। তখন মালী তার হাতে একটা তলোয়ার দিয়ে বলল, এই তলোয়ার নিয়ে তোর স্বামীকে কেটে আয়, তবে জানব আমাকে ভালবাসিস। এই কথা শুনে মন্ত্রীপুত্র চট করে সুড়ঙ্গ পথে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। এদিকে রাজকন্যা ঘরে এসে এক-কোপে রাজপুত্রের মাথা কেটে ফেলল ও সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে মালীকে জানাল। মন্ত্রীপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে গেল। হত্যার কথায় মালী ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, সকাল হলে রাজাকে বলবি, মন্ত্রীপুত্র আমার চরিত্র হনন করতে এসেছিল। ঘুম হ'তে রাজপুত্র বাধা দিতে এলে মন্ত্রীপুত্র তাকে হত্যা করে। মন্ত্রীপুত্র সব শুনে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে আছে মনে করে রাজকন্যা মন্ত্রীপুত্রের হাতে রক্ত মাখিয়ে দিল। মন্ত্রীপুত্র কিছু বলল না। সকালে রাজকন্যা কাঁদতে লাগল ও মালীর শিখানো কথা গুলো বলতে লাগল। কান্না শুনে রাজা-রানী, পাত্র-মিত্র সব এসে হাজির।

ছিন্নমস্তক রাজপুত্রের দশা দেখে সকলে দুঃখিত হলো। আর সকলে মন্ত্রীপুত্রকে ধরে নিয়ে গেল। বিচার করে মন্ত্রীপুত্রের প্রাণ দণ্ডাদেশ দেওয়া হলো। মন্ত্রীপুত্র বলল, আমার বন্ধু যখন মরেছে তখন আমিও মরতে চাই। তবে মরার আগে আপনাদের আমি একটা মজার জিনিস দেখাব, আপনারা দেখতে চান কি না? সকলে বলে, হ্যাঁ দেখবো। মন্ত্রীপুত্র তখন রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র ও রাজকন্যাকে নিয়ে গেল সেই ঘরে, যে ঘরে গত রাত্রে তারা শুয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে মন্ত্রীপুত্র দেওয়ালে চাপ দিল, সুড়ঙ্গ বের হলো, সুড়ঙ্গ পথে সকলকে নিয়ে গেল, সকলে দেখল সুড়ঙ্গ পথে রক্ত পড়ে আছে। সুড়ঙ্গ বাগানে গিয়ে শেষ হলো। দেখল, সেখানে পড়ে আছে রক্ত, আর বগী থালায় ভাল ভাল খাবার, আর ঘর খোলা শুয়ে আছে মালী। রাজা মালীকে কর্কশ স্বরে এসবের কারণ শুধাল, ভয়ে মালী সব বলে দিল, রাজকন্যাও সব স্বীকার করল। রাজা মন্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে দিল। মন্ত্রীপুত্র বন্ধুর দেহটি একটা বড় ঝোলায় ভরে নিয়ে গেল। তারপর তার শ্বশুর গাঁয়ে ঢোকার মুখে এক পাকুড় গাছে মৃত দেহটি বেঁধে রেখে গেল নিজের শ্বশুর বাড়ী।

শ্বশুর বাড়ী যেতেই খুব আদর যত্ন পেল। কন্যা যুবতী হয়েছে। খুব সুন্দরী, তবে একটু গম্ভীর। মেয়ে জামাই এক ঘরে শুয়ে পড়ল। মন্ত্রীপুত্র ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। ভাবল এ কি করে দেখা যাক। নিশি ভোর রাতে কন্যা উঠল এবং দেখল স্বামী ঘুমন্ত। তারপর কাঁকে একটা মাটির কলসী নিয়ে সে চলে গেল গ্রামের শেষে নদীর ধারে শ্মশানে। মন্ত্রীপুত্রও পিছু পিছু গেল। মন্ত্রীপুত্র দেখল তার স্ত্রী কালীমন্দিরে ঢুকে পূজা করছে। পূজা শেষে যখন সে মুখ ফিরিয়েছে, তখন দেখতে পেল স্বামীকে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে? তখন মন্ত্রীপুত্র তার বন্ধু রাজপুত্র ও তার স্ত্রী এবং তার পরিণামের সব কথা জানাল। মন্ত্রীকন্যা বলল, দুইদিন পর অমাবস্যা। ঐ দিন আমি রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দিব।

ঐ দিন তুমি রাজপুত্রের মৃতদেহ এখানে এনে উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি বলব, তবে ঘুরবে। নচেৎ হিতে বিপরীত হবে। তাই হলো, অমাবস্যা রাতে রাজপুত্রের মৃতদেহ এনে কালী মন্দিরের সামনে রাখল মন্ত্রীপুত্র। তারপর পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল। মন্ত্রীকন্যা উলঙ্গ হয়ে নদী হতে জল এনে মাকালীর সামনে অনেক মন্ত্র পড়ল। তারপর সেই জল রাজপুত্রের গায়ে ছিটিয়ে দিল। তারপর মাথার চুল খুলে উলঙ্গ হয়ে মৃতের চারিপাশে নাচতে লাগল। এই সময় উঠল ঝড়। কিছু বৃষ্টিও হলো। কন্যা মন্দিরে ঢুকে কাপড় পরল। রাজপুত্র আড়িমুড়ি ছেড়ে উঠে বসল। কন্যা তখন তার স্বামীকে ডাকল। স্বামী ঘুরে দেখে রাজপুত্র বেঁচে উঠেছে। তখন মন্ত্রীপুত্র বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল। রাজপুত্র জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কেন? মন্ত্রীপুত্র তখন রাজপুত্রকে সব খুলে বলল। তারপর মন্ত্রীপুত্রের শ্বশুর বাড়ীতে দু'একদিন থেকে তারা বাড়ী ফিরল। বাড়ীতে রাজপুত্র কারো সঙ্গে কথা বলে না। মেয়েদের প্রতি এলো তার বিতৃষ্ণা। এদিকে সতী কমলা বাপের বাড়ী হতে স্বামীর বাড়ী এসেছে। কিন্তু তার স্নেহ, ভালবাসা, সেবা স্বামীর মন জয় করতে পারে না। কিছুদিন পর রাজপুত্র ঠিক করল সে নৌকা পথে ভ্রমণে যাবে। একটা ভাল নৌকা সাজানো হলো। তারপর একদিন মন্ত্রীপুত্রকে নাজানিয়ে রাজপুত্র নৌপথে পাড়ি দিল। যাবার প্রাক্‌কালে সতীকমলা একটা কনকচাঁপার মালা গেঁথে স্বামীর গলায় দিয়ে বলল আমি যতদিন সতী থাকব, ততদিন এই মালা অটুট থাকবে। ফুল শুখাবে না বা ঝরবে না। রাজপুত্র ভেসে চলল। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

কিছুদিন পর রাজপুত্র দেখতে পেল নদীর দক্ষিণ তীরে সুন্দর একটি বাঁধানো ঘাট। রাজপুত্র সেই ঘাটে নৌকা বাঁধতে বলল মাঝিকে। ঘাটে নেমে দেখল একটা ডঙ্গা ঝুলান আছে। পাশে আছে ঘা মারার একটা দণ্ড। তার পাশে একটা চৌকো কাঠের উপর খোদাই করা আছে কিছু কথা। কথাগুলি হলো এই:

'এই দেশের রাজকন্যাকে, চার প্রহর রাতে, যে চারবার কথা বলাতে পারবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেওয়া হবে এবং অর্ধ রাজ্য দান করা হবে। আর না পারলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।'

এই 'লিখন' পড়ে রাজপুত্র ডঙ্গায় ঘা দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীর লোকেরা তাকে সসম্মানে রাজবাড়ী নিয়ে গেল। তার-পর রাতে শুরু হলো কথা বলানো। কিন্তু চার প্রহরে রাজপুত্র সেই রাজকন্যাকে একটাও কথা বলাতে পারল না। তাই সে বন্দী হলো। ঐ রাজকন্যা জানতো ডাকিনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার বলে সে বুঝতে পারল এই রাজপুত্রের স্ত্রী সতী। তার দেওয়া মালা রাজপুত্রের গলায় অটুট থাকবে যতদিন তার সতীত্ব থাকবে। ঐ রাজকন্যা যে করেই হোক সতী কমলার চরিত্র নষ্ট করায় চেষ্টা করতে লাগল।

ঐ রাজকন্যার' এক মাসতুতো ভাই ছিল। তাকে অনেক টাকা দিয়ে সতী কমলার দেশে পাঠাল, তার সতীত্ব নষ্ট করতে। কারণ তার অভিশাপ ছিল, কোন দিন কোন সতীকন্যা যদি ছদ্মবেশে তার সঙ্গে কথা বলতে আসে, তাহলে তার পরাজয় ঘটবে। আর তার সতীত্ব নষ্ট হলে রাজপুত্রের গলার মালায় তা বুঝতে পারা যাবে। ছেলেটি অনেক টাকা নিয়ে সতী কমলার দেশে গেল। গিয়ে কমলার এক দাসীর সঙ্গে আলাপ করল ও তাকে টাকা দিয়ে বশীভূত করল। একদিন সতী কমলা নদীতে স্নানে যাচ্ছে। ছেলেটি দাসীকে দিয়ে বলে পাঠাল, সতী কমলা যেন একবার স্নানের ঘাটে তার দিকে তাকায়। সকালে সতী কমলা স্নানে গেল। ছেলেটি ঘাটের পূর্বদিকে একটা পৈঠার উপর দাড়িয়ে থাকল। সতী স্নান শেষে একবার ছেলেটির দিকে তাকাল, তারপর চলে গেল। তারপর একদিন দাসীকে আর কিছু টাকা দিয়ে বলল, আমি অমুক স্থানে রাত্রি বাস করি, কমলা যেন একদিন রাতে আমার বিছানায় আমার পাশে শোয়। দাসী কমলাকে এই কথা বলল। কমলা

বলল, বেশ তাই হবে। সেদিন রাতে সে একবার ছেলেটির পাশে শুয়ে এলো। ছেলেটি ঘুমিয়ে ছিল জানতে পারলো না। শোয়ার চিহ্ন স্বরূপ সতী কমলা, তার একটা মাথার কাঁটা বিছানায় রেখে গেল। কয়দিন পর ছেলেটি আবার দাসীকে টাকা দিয়ে বলল, আজ যেন সতী কমলা আমার হাতে একটা পান সেজে দেয়। দাসী কমলাকে বলল। কমলা সেদিন ভালভাবে একটি পান সেজে ছেলেটির হাতে দিল। ঐ ছেলেটি দেশে ফিরে ডাকিনী সিদ্ধ তার দিদিকে সবকথা বলল। দিদি কারাগারে গিয়ে রাজপুত্রের গলায় দেওয়া সতী কমলার মালা দেখল। মালা অটুট আছে। বলল, না সতী কমলার সতীত্ব নষ্ট হয়নি।

সতী কমলাব স্বামী অনেকদিন ঘরছাড়া। স্বামীর জন্য সে চিন্তিত। তাই সে তার কয়েকজন সখীকে পুরুষ সাজাল ও নিজে পুরুষের ছদ্মবেশ নিল। তারপর যেদিকে নৌকা নিয়ে তার স্বামী গিয়েছে, সেই দিকে গেল। কয়েকদিন নৌকা চালিয়ে সে এলো ডাকিনীসিদ্ধ রাজকন্যার ঘাটে। সেখানে নেমে সে ডঙ্গা, ডঙ্গার দণ্ড ও কাঠের উপর লিখন দেখল। সেখানে যে সব রাজকর্ম্মচারী ছিল, তারা বলল, কথা বলাতে না পারার জন্য অনেক রাজপুত্র এখানে বন্দী জীবন যাপন করছে। ছদ্মবেশী কমলা ডঙ্গায় ঘা দিল। রাজার লোকেরা সসম্মানে তাকে নিয়ে গেল। রাতে ছদ্মবেশী কমলা কন্যার সঙ্গে মুখোমুখি বসে বলল, তোমাকে কথা বলাতে চাইনা। আমি একটা গল্প বলব, সেই গল্পে কে দোষী তা তোমাকে বলতে হবে। এই বলে সে রাতের প্রথম প্রহরে একটা গল্প বলল ঃ

এক দেশে ছিল এক রাজপুত্র। তার ছিল শক্তিশালী ও বিশ্বাসী একটা ঘোড়া। ঘোড়াটি ছিল যেমন দ্রুতগামী, তেমনি বুদ্ধিমান। একদিন রাজপুত্র তার সেই প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে বনে শিকারে গেল। সারা বন তোলপাড় করে কোন শিকার পেল না। সারা বন ভ্রমণ করে রাজপুত্র শ্রান্ত ক্লান্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে।

খোঁজ করে কোথাও জল পেল না, শেষে কিছুদূর গিয়ে বনের ধারে দেখল একটা খেজুর গাছের গলা চাঁছা। সেই গলা দিয়ে দরদর করে পড়ছে খেজুরের রস। পিপাসার্ত রাজপুত্র সেই রস খেতে গেল, অমনি ঘোড়াটি দিল গাঝাড়া। রাজপুত্র ঘোড়া হতে পড়ে গেল ও রেগে তলোয়ারের এক কোপে ঘোড়াটির মাথা কেটে ফেলল। তারপর খেজুরের রস খেতে গিয়ে দেখে এক বিরাট সাপ খেজুর গাছের গলা জড়িয়ে আছে আর তার মুখ চাঁছা স্থানটার উপরে, তার বিষ চাঁছা গা বেয়ে পড়ছে। এই দেখে সে ঘোড়াটার জন্য হায় হায় করতে লাগল। আর তলোয়ার দিয়ে সাপটাকে কেটে ফেলল। ছদ্মবেশী কমলা বলল এখানে দোষী কে? ঘোড়া, সাপ, না রাজপুত্র? রাজকন্যা বলল, দোষী ঐ রাজপুত্র। কারণ তার সব কিছু ভাল ভাবে দেখা উচিত ছিল। এই ভাবে রাতের প্রথম প্রহর গেল।

রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ছদ্মবেশী কমলা রাজকন্যাকে আর একটা গল্প বলল ঃ

এক গ্রামে ছিল এক গৃহস্থ।— স্বামী, স্ত্রী ও একটা শিশুপুত্র নিয়ে তাদের সংসার। তারা একটি বেজী পুষে ছিল। বেজীটি সব সময় তাদের বাড়ীতে থাকত। একদিন গৃহস্থ গিয়েছে কাজে। শিশুটি দাওয়ার উপর একটা শীতল পাটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেজীটা শুয়ে আছে শিশুটির নিকটে। গৃহিনী গিয়েছে পুকুরে স্নান করতে। ইতিমধ্যে একটা কেউটে সাপ দাওয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটাকে কামড়াবে। বেজীটা সাপটার সঙ্গে লড়াই করে সাপটাকে কেটে ফেলল। সাপ কাটার রক্ত, খণ্ড খণ্ড সাপের দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ল ছেলেটির গায়ে। তাই বেজী গেল ঔষধ আনতে। বেজী ঔষধ নিয়ে ফিরছে। পথে গৃহিনীর সঙ্গে দেখা। গৃহিনী ভাবল, বেজীর মুখে যখন রক্ত তখন বেজী মেরে ফেলেছে তার ছেলেকে। তাই গৃহিনী বেজীটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। বাড়ী এসে দেখে ছেলে ঘুমাচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বেজীর কাটা

কেউটে সাপ। গৃহিনী খুব দুঃখ পেল। বেজীর মুখের ভিতর সাপের ঔষধ। তারপর সেই ঔষধ বেঁটে ছেলেকে খাওয়ান হলো। বেজীটার জন্য তার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো।

প্রশ্ন :—এখানে দোষী কে? বেজী, সাপ, না গৃহিনী?

রাজকন্যা—গৃহিনী।

এই ভাবে দ্বিতীয় প্রহর শেষ হলো। তৃতীয় প্রহরে ছদ্মবেশী কমলা আর একটি গল্প শুরু করল :—

ভাগীরথী নদীর তীরে কল্যাণপুর গ্রাম। এই গ্রামে বাস করে এক কামার পরিবার। পিতা, পুত্র ও নতুন পুত্রবধূ। কিছুদিন হলো কামারের স্ত্রী মারা গিয়েছে। তাই ছেলের বিয়ে দিয়েছে, কামার পার্শ্ববর্তী কেউগুঁড়ি গ্রামে। সেখানে কামারের বাড়ী তার কিছু দূরে মহাশ্মশান। বহু দূর-দূরান্ত হতে অনেক মরা এখানে পোড়াতে আনে। একদিন সন্ধ্যারাত। নদীর গাবায় শিয়াল ডাকছে। শিয়ালের ডাকশুনে পুত্রবধূ চলে গেল নদীর দিকে। রাতটা ছিল ছামুচান্নি। কামার শাঁখাই হ'তে বাড়ী ফিরছে। নদীর গাবার দিকে তাকিয়ে দেখে এক যুবতী মেয়ে একটা মড়ার আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে তাদের বাড়ীর পুত্রবধূ। কোন কথা না বলে কামার বাড়ী এলো ও গোপনে ছেলেকে ডেকে সব কথা বলল। আরও বলল, এই মেয়ে পিশাচী, কোনদিন আমাদের ও খেয়ে ফেলবে। পরদিন ওকে বাপের বাড়ী কেউগুঁড়িতে রেখে আয়। পরদিন একটু ভোরে বৌ নিয়ে ছেলে কেউগুঁড়ি যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে যেখানে গাঁ শেষ হয়ে মাঠ। সেই মাঠের ধারে পথ, আলের পাশে একটা গর্তে একটা ব্যাঙ কট্‌কট্ করে ডাকছে। বৌটা তার স্বামীকে বলল, এই গর্তটা খুঁড়ো, অনেক টাকা পাবে। বৌর কথামত মাঠের পাশে একটা বাড়ী হতে একটা কোদাল চেয়ে এনে গর্তটা খুঁড়ে দেখে সত্যিই অনেক টাকা। বৌটা বলল, আমি সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল প্রভৃতির কথা বুঝতে পারি। গত সন্ধ্যায় নদীর গাবায় একটা শিয়াল

ডাকছিল ও বলছিল একটা মরার গায়ে অনেক সোনার গয়না। গয়নাগুলো খুলে নাও, মরাটা খাব। তাই কাল অনেক সোনা পেয়েছি। তবে মড়ার হাতে ছিল একটা দামী আংটি, সেটা খুলতে পারছিলাম না, তাই দাঁত দিয়ে কেটে খুলতে হলো। সব শুনে বৌকে ছেলেটা বাবার কথা বলল ও কেঁউগুঁড়ি না গিয়ে বাড়ী ফিরল। বৌ টাকাগুলি আঁচলে ঢেকে খিড়্কি পথ দিয়ে বাড়ী গেল, আর ছেলেটা সদর পথদিয়ে চলতে লাগল। একা একা বৌ বাড়ী ফিরছে দেখে কামার মনে করল, পিশাচী পথে ছেলেটাকে খেয়েছে; এই বার আমাকে খাবে। তাই একটা চেলা কাঠ দিয়ে বৌটার মাথায় মারল বাড়ী। কয়েক ঘা দিতেই বৌটা মরে গেল। ছেলে বাড়ী ফিরে সব দেখে কাঁদতে লাগল এবং বাবাকে সবকথা বলল। বাবা শুনে হায় হায় করতে লাগল।

ছদ্মবেশী কমলার প্রশ্ন : কে দোষী? কামার, বৌ না কামার পুত্র? রাজকন্যা বলল, কামার দোষী।

তিন প্রহর শেষে, যখন রাতে চার প্রহর শুরু হলো তখন ছদ্মবেশী কমলা আর একটা গল্প বলল :—

কুন্নুর নদীর ধারে বনের ভিতরে ছোট্ট একটা গ্রাম সিদিটি। এই বনে বাস করতো দুটো সাপ। একটা জাত, আর একটা অজাত। জাত সাপটি ভাল কিন্তু বেজাতটা খুব দুষ্ট। তারা কয়দিন জল খেতে পায় নি। জলাভাবে পিপাসায় মৃত প্রায়। জাত সাপটা একটু ঘুরে বেশ সুস্থ। অজাত বলল, তোমাকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে, তুমি কি জল পেয়েছ? জাত সাপ বলল, হ্যাঁ পেয়েছি, তবে সেভাবে তুমি জল খেতে পারবে না। কারণ একটা শিশু এক বালতি জল নিয়ে অমুক স্থানে খেলা করছে। জল খেতে গেলে সে তোমাকে খেলাচ্ছলে মারবে, আর তোমার যা স্বভাব তুমি তাকে ছোবলাবে। ছেলেটি মারা যাবে। তাই তুমি জল খেতে পারবে না বা তোমাকে সন্ধানও দিব না। মৃতপ্রায় সাপ অনেক প্রতিজ্ঞা করে বলল, কিছুতেই ছোবলাব না। অজাত শুধাল তোমাকে

জল খেতে কয় ঘা মেরেছে ? জাত বলল পাঁচ ঘা। অজাত বলল বেশ, এখন আমাকে বলে দাও। জাত বেজাতকে পথ বলে দিল। বেজাত মনের আনন্দে জলপান করতে লাগল। শরীর তখন বেশ ভাল হয়েছে। ছেলেটা যেই পাঁচ ঘায়ের পর ছয় ঘা মেরেছে অমনি অজাতের রাগ হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল, জাতকে মেরেছে পাঁচ, আর আমাকে ছয় ! তাই সে ছেলেটিকে ছোবলাল। ছেলেটি বিষের জ্বালায় মরে গেল। জাত জানতে পেরে অজাতকে খুব বলল। অজাত বলল, আমাকে ছয় ঘা মেরেছে আর তোমাকে পাঁচ ঘা মেরেছে। তাই ছোবল দিয়েছি।

ছদ্মবেশী কমলা প্রশ্ন করল দোষ কার ? জাতের, অজাতের, না ছেলেটির ?

রাজকন্যা—দোষ অজাতের।

ছদ্মবেশী কমলা বলল, তাহলে চার প্রহরে চারবার কথা বলিয়েছি তোমাকে। রাজকন্যা পরাজয় স্বীকার করল। কথামত তার সঙ্গে বিয়ে হবে রাজকন্যার। কমলা বলল, আগে সব রাজকুমারকে কারাগার হতে মুক্তি দাও। তাই দিল। কমলা নিজের স্বামীকে দেখতে পেয়ে কাছে আনল। তারপর নিজের পরিচয় দিল। এই রাজকন্যার সাথে স্বামীর বিবাহ দিল।

রাজকন্যা বলল, বল তুমি কিভাবে সতী ছিলে ? কারণ আমার আমার ভাই-এর দিকে তুমি তাকিয়েছ, বিছানায় শুয়েছ ও হাতে পান দিয়েছ।

কমলা বলল, সেদিন তাকিয়ে ছিলাম সূর্যের দিকে তোমার ভাই-এর দিকে নয়। বিছানায় শুয়ে ছিলাম তাকে পুত্র ভেবে যে, ভগবান এমনি একটা পুত্র আমাকে দিয়ো। মা ছেলের কাছে শোবে কোন বাধা নাই। আর পান দিয়েছি অতিথি ভেবে, হাত স্পর্শ না করে।

এদিকে রাজপুত্রের পিতা মারা গিয়েছে। সে হলো রাজা, মন্ত্রীপুত্র হলো মন্ত্রী। আর রাজা হয়ে রাজপুত্র ধরে আনল তার

ব্যাভিচারিনী প্রথমা পত্নীকে ও মালীকে। তাদের মাথা কেটে রাখা হলো তেমাথা পথে। তাদের কৃতকর্ম্মের জন্য লিখে দেওয়া হলো তাদের মাথায় লাথি মারতে। রাজপুত্র তার দুই পত্নী ও মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল। সদানন্দ গরু জুনে গাড়ী নিয়ে চলতে লাগল।

—০—

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রামের শ্রীঅসীম কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে সংগৃহীত।]

। মধুমালা ।

উজানী নামেতে নগর
সেথা রাজা দণ্ডধর
তার পুত্র সোনার মদনকুমার ।
যৌবনে শিকারে গেল,
পরীরা উড়িয়ে নিল
নিয়ে গেল মধুমালার ঘর ॥

অজয় নদীর ধারে উজানি বলে এক রাজ্য ছিল। তার বাজধানীব নামও উজানী নগর। এই রাজ্যের রাজার নাম দণ্ডধর। লোকলস্করে পুরী রমরম। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া কিন্তু সুখ নাই রাজা-রাণীর মনে। কাবণ তাদের নাই কোন সন্তান। কিছুদিন পর শোনা গেল রাণী গর্ভবতী। রাজ্যে বইল খুশীর তুফান। দশমাস দশদিন পর রাণী প্রসব করল এক সুন্দর পুত্র। রূপে তার ঘর আলো হয়ে উঠল। ছেলে ধীরে ধীরে শশীকলার মত বাড়ে। এই ছেলের নাম রাখল মদনকুমার। ক্রমে মদনকুমার যৌবনে পদার্পণ করল। রাজপুত্র লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া সব কিছুতে পারদর্শী হয়ে উঠল। যেমনি তার রূপ, তেমনি তার গুণ। একদিন রাজপুত্র তার বন্ধু-বান্ধবদের বলল, চল শিকারে যাই। লোকলস্কর নিয়ে নিকটবর্তী এক বড়বনে শিকারে গেল মদনকুমার। সারা দিন বন তোলপাড় করেও কোন শিকার পাওয়া গেল না। বনের মধ্যস্থলে ছিল এক সুবৃহৎ সরোবর। সেই সরোবরের ধারে অনেক তাম্বু খাটিয়ে রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করা হলো। একটি ভাল তাম্বুর মধ্যে সোনার খাটের উপর শুয়ে ক্লান্ত মদনকুমার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরীরা গভীর রাতে স্নান করতে আসতো এই সরোবরে। সেদিন চার বোন —কালোপরী, ঝালোপরী, ধলোপরী ও নিদ্রাপরী —পরী সরোবরে স্নান করতে এসে দেখে কারা যেন তাম্বু ফেলেছে। নিদ্রাপরী সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। চারবোন দেখল মদনকুমার শুয়ে আছে খাটে। তার রূপে যেন বন আলো হয়ে আছে। তার রূপ দেখে চার বোন লেগে গেল ঝগড়া—কে বেশী সুন্দর উজানীর রাজপুত্র এই মদনকুমার, না ভাটী নগরের রাজা বাসীকরের মেয়ে মধুমালা। তারপর পরীরা ঠিক করল মদনকুমারকে ভাটীনগরে নিয়ে গিয়ে মধুমালার পাশে রেখে দেখতে হবে কে বেশী সুন্দর। চারপরী খাটের চার কোণ ধরে মদনকুমারকে নিমিষে উড়িয়ে নিয়ে চলে ভাটী নগরে। সেখানে মধুমালার খাটের পাশে রাখল মদনকুমারের খাট। দুষ্টমী করে ঝালপরী দু'জনকে জাগিয়ে দিল। দু'জনার সঙ্গে হলো দু'জনের পরিচয়, তারপর অঙ্গুরী বিনিময় করে বিয়ে করল দু'জনে। কিছু কথাবার্তা বলল। রাত শেষ হবে তাই নিদ্রা পরী আবার তাদের মধ্যে নিদ্রা এনে দিল। দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল। মধুমালার খাটে মদনকুমারকে আর মদনকুমারের খাটে মধুমালাকে রেখে মদনকুমারকে উড়িয়ে এনে আবার বনের মধ্যে তাম্বুতে রেখে দিল। সকাল হলে মদনকুমার জেগে উঠল। কিন্তু কোথায় মধুমালা? রাজপুত্র মধুমালা মধুমালা বলে বিলাপ করতে লাগল। তার বন্ধু-বান্ধব বলল, এ সব স্বপ্ন। রাজপুত্র বলল, যদি স্বপ্ন হয় তাহলে আংটি ও খাট কেন বদল হলো। শিকার ছেড়ে সকলে উজানীতে ফিরে এলো। রাজা দণ্ডধর অনেক চেষ্টা করল। বহু অনুসন্ধান করেও মধুমালার সন্ধান পাওয়া গেল না।

উজানী নগরে রাজার নিকট থাকতো এক ব্রাহ্মণ। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তার বাড়ী। সে বলল, আমি মধুমালার দেশ চিনি। সেখানে যেতে হলে বহু ধনরত্ন দরকার। সাতটা বড় বড় নৌকায় অনেক ধনরত্ন, টাকাকড়ি, খাবার দাবার নেওয়া

হলো। অন্য একটি 'নৌকায় উঠল মদনকুমার ও ব্রাহ্মণ। এই নৌকাটি ময়ূরপঙ্খী। শুভ দিনে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো। নৌকা ভেসে চলল ভাটী পথে, কখনো উজানে। এই ভাবে সাত দিন সাত রাত নৌকা চলল। ব্রাহ্মণ ছিল কুচক্রী। সে উজানী হতে বাড়ী ফিবতে পাবছিল না। কৌশলে সে নিজের দেশে ফিরল। কৌশল করে অনেক বাতে সে নৌকা ভিড়াল নিজের গাঁয়েব ঘাটে। তারপর মদনকুমারের নৌকাব মাঝি মাল্লাদেব নামিয়ে মদনকুমারের নৌকার নঙ্গর কেটে দিল। ঘুমন্ত মদনকুমার স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলল। ধনরত্ন নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ী চলে গেল। কিছুক্ষণ যাবার পর মদনকুমার জেগে উঠে সব জানতে পারল এবং নিজের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে ভেসে চলল। সকাল হলো, নৌকা জলের বিরাট ঢেউ সহ্য করতে পারল না। কারণ দাঁড়া মাঝি, হাল দাঁড় কিছুই নাই। নৌকা ডুবে গেল। মদনকুমার জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। তারপব আলান্ত হয়ে ভেসে চলল। ভাসতে ভাসতে গিয়ে এক নদীর ঘাটেব সন্নিকটে চড়ার উপর মড়ার মত পড়ে রইল। এই দেশটি মধুমালার ভাটীনগর।

মধুমালা তার সখীদের নিয়ে স্নান করতে এলো নদীর ঘাটে। মদনকুমারের জন্য সেও চঞ্চল হয়ে আছে। ঘাটের পাশে একটা লোক পড়ে আছে দেখে সখীরা তাকে ধরাধরি করে ঘাটে আনল। কাদা পলি ভাল করে ধুয়ে মুছে দিল। তারপর শুকনো কাপড় পড়াল। উভয়ে উভয়কে চিনতে পারল। উভয়ের হাতে আংটিও ছিল। মধুমালা গোঁসাঘরে গিয়ে খিল দিল। রাজা রাণী গোঁসাঘরের দ্বাবে গিয়ে মনের কি বাসনা শুধাল। মধুমালা বলল কুড়িয়ে পাওয়া এই যুবককে সে বিয়ে করতে চায়। তাই হলো। রাজকন্যা মধুমালার সঙ্গে মদনকুমারের বিয়ে হয়ে গেল। পরে তার পরিচয় পেয়ে রাজা খুশী হলো। সেখানে কয়েক মাস থাকার পর বাড়ী ফেরার জন্য মদনকুমারের মন খারাপ করতে লাগল। কিন্তু কিভাবে দেশে ফেরা যায়! মধুমালা বলল, আমার বাবা রাজা বাসীকরের

একটা হংসা পাখী আছে। এই হংসাপাখী তুমি চেয়ে নাও। এই পাখীর পিঠে চেপে বসব আমরা। হংসা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাই হলো, রাজার জামাতা মদনকুমারকে হংসাপাখী দান করল। হংসাপাখীর পিঠে চেপে মধুমালা ও মদনকুমার উজানীর দিকে আকাশ পথে যাত্রা করল।

এদিকে মধুমালা ছিল পূর্ণগর্ভা। হংসাপাখী তাদের নিয়ে খুব বেগে উড়ে চলছে। কিছুদূর যাত্রার পর মধুমালার প্রসব বেদনা উঠল। মধুমালা বলল, হংসা নীচে নামো, আমার প্রসব বেদনা উঠেছে। কিন্তু চারিদিকে জল, কোথায় সে নাম্‌বে! অবশেষে এক চড়ার উপর তর্ তর্ করে নেমে পড়ল হংসা। সেখানে মধুমালা যমজ সন্তান প্রসব করল। একটির নাম চাঁদ আহতাব, অন্যটির নাম মধুসূদন। প্রসবের পর শীতে কাঁপতে লাগল মধুমালা। হংসাপাখীকে আগুনের খোঁজে পাঠাল। হংসা গিয়ে এক নলুয়ার ঘরে বন্দী হলো। চড়ার উপর রইল দুই পুত্র নিয়ে মদনকুমার আর মধুমালা। মধুমালা শীতে কাঁপতে লাগল। মদনকুমার আগুনের কোন সন্ধান পেল না। চাঁট খাঁ নামে এক বণিক নদী পথে বাণিজ্যে গিয়ে এখন বাড়ী ফিরছে। তার বাড়ী চাঁট গাঁ। সেও নদীপথে পথ ভুল করে ফেলেছে। তার নৌকায় যে সর্দ্দার মাঝি ছিল তার নাম তুলা মাঝি। তুলা মাঝি বলল, মাস্তুলের উপর একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে রাখি। যদি কেহ আলো দেখে আসে। নৌকা যখন চড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন মধুমালা ও মদনকুমার ঐ আলো দেখতে পেল। মধুমালা মদনকুমারকে পাঠাল ঐ আলোর নিশানা ধরে।

মদনকুমার নৌকার নিকট এসে আগুন চাইল। চড়ায় অপরিচিত মানুষ দেখে তুলামাঝি মদনকুমারকে বণিকের নিকট নিয়ে গেল। বণিক মদনকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। মদনকুমার নিজের পরিচয় ও সব কিছু বলল। এই বণিক ভাটীনগরের কন্যা মধুমালাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বাবা বিয়ে দেয় নি। সে ভাবল, এই বার পেয়েছি। কিন্তু মুখে খুব সহানুভূতি দেখিয়ে

বলল, তোমার বাবা দণ্ডধর আমার বন্ধু, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র নৌকায় নিয়ে এসে, তোমাদের উজানীতে পৌঁছে দিবে আমি চলে যাব। মদনকুমার, মধুমালাকে একথা জানাল। মধুমালা বলল, ঐ বণিককে বিশ্বাস করবেন না। হংসাপাখী ঠিক আসবে। মদনকুমার বলল, জোয়ার আসতে পারে, তা'হলে এই চরা ডুবে যাবে। বণিক ভাল লোক। চল নৌকায় উঠি। বনের পাখী আর কি ফিরে আসবে। অনিচ্ছা সত্বেও মধুমালা মদনকুমারের সঙ্গে নৌকায় গিয়ে চাপল। কিছুদূর যাবার পর বণিক তুলা মাঝিকে ডাকল ও মদনকুমারকে নদীতে ফেলে দিতে বলল। মাঝি ফেলতে চাইল না। কিন্তু মধুমালার রূপ দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল বণিক। বলল যত টাকা চাই দিব, তবুও ফেলে দিতে হবে মদনকুমারকে। টাকার লোভে তুলা মাঝি জলে ফেলে দিল মদনকুমারকে। মধুমালা তখন বলল, আমি বারণ করেছিলাম কিন্তু তখন শোননি আমার কথা। মধুমালা তার মাথার কাঁটাটা জলে ফেলে দিয়ে বলল, আমি যদি সতী হই, তবে এই কাঁটা আমার স্বামীকে রক্ষা করবে। কাঁটা একটা বড় কাঠ হয়ে মদনকুমারের সামনে ভেসে গেল। মদনকুমার সেটা ধরে ভেসে চলল ও স্ত্রী কথা না শুনে কি ভুল করেছে তা অনুধাবন করল। কিছুক্ষণ পর তুলা মাঝিকে দিয়ে ছেলে দুটোকে ফেলে দিতে চাইল। তুলা মাঝি রাজি হলো না। বণিক অনেক টাকা দিতে চাইল। তখন টাকার লোভে তুলা মাঝি ছেলে দুটিকে জলে ফেলে দিল। মধুমালা মাথার দুইটি চুল ছিঁড়ে জলে ফেলিয়ে দিয়ে বলল, আমি যদি সতী হই তাহলে এই চুল দু'খি আমার পুত্রদের বাঁচাবে। চুল দু'খি বড় কাঠ হয়ে ছেলে দুটোর নিকট ভেসে গেল। ছেলে দুটো কাঠ দুটো ধরে ভেসে চলল। তারপর বণিক মধুমালার নিকট গেল ও বিয়ে করতে চাইল। মধুমালা বলল, আমার বিশেষ ব্রত আছে। বারো বৎসর আমি বিয়ে করব না। বারো বৎসর পর বিয়ে করব। যদি বারো বৎসরের মধ্যে আমায় বিয়ে কর তাহলে আত্মঘাতী হবো। বণিক আর কি করে,

বারো বৎসর অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে উজানীতে রাজা দণ্ডধর মারা গিয়েছে। কে রাজা হবে তাই নিয়ে ঝগড়া। রাণীর কথামত রাজমন্ত্রী তেল সিঁদুর কপালে মাখিয়ে রাজ হস্তীকে ছেড়ে দিল। তার পিঠে বেঁধে দিল সিংহাসন। ঐ হাতী শুঁড়ে দিয়ে যাকে তুলে পিঠের সিংহাসনে বসাবে সেই হবে উজানীর রাজা। এ দিকে মদনকুমার কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে তীরে উঠে ভিখারীর মত চলতে লাগল। ছেলে দুটি ও মধুমালার কথা সে ভুলে গেল। ভুলে গেল সে কে? এই ভাবে সে বিভিন্ন স্থান ঘুরতে লাগল। রাজহস্তী ঘুরতে ঘুরতে তাকে পেল এবং শুঁড় দিয়ে তাকে তুলে পিঠের সিংহাসনে বসিয়ে উজানী নিয়ে গেল ও রাজা করল। রাজা হয়ে মদনকুমারের সব কথা মনে পড়ে গেল, কিন্তু অনেক খোঁজ করে স্ত্রীর কোন সন্ধান পেল না বা পুত্রদেরও সন্ধান পেল না।

এদিকে মধুমালার দুই পুত্র চাঁদ আহতাব ও মধুসূদন কাঠ ধরে এক বনে গিয়ে উঠল। নদীর ধারে বন। নদীর কিনারায় বনের ধারে পড়ে রইল তারা। এক গোপের ছিল অনেক গাই। তারা দুধও দিত অনেক। একজন রাখাল তাদের চরাত। গোপের একটা গাভী নদীতে জল খেতে এসে শিশু দুটিকে দেখল ও তাদের মুখের নিকট বাঁট নিয়ে গেল। ছেলে দুটো গাভীটির দুধ খেতে লাগল। প্রতিদিন ঐ গাইটা দুধ কম দেয়, কারণ সে মধুমালার ছেলে দুটিকে দুধ দেয়। একদিন রাখাল ও গোপ গাভীর পিছু পিছু গিয়ে মধুমালার পুত্র দুটিকে উদ্ধার করে আনল। আর গোপের বাড়ীতে তারা মানুষ হ'তে লাগল।

তারা যখন একটু বড় হলো, তখন ছোট ভাই বড় ভাইকে বলল দাদা, এই গোপ কি আমাদের পিতা? না অন্য কেউ? দাদা বলে, এরা আমাদের মা বাপ নয়। কে আমাদের মা বাপ, চল খোঁজ করি। এই বলে একদিন গোপ ও তার স্ত্রীর অগোচরে চাঁদ আহতাব ও মধুসূদন পিতা-মাতার খোঁজে চলে গেল।

দুই ভাই হাঁটতে হাঁটতে চলো এলো উজানী নগরে।

রাজা মদনকুমার উজানী নগরের উত্তরে নদী আর পথের মধ্যস্থলে কাটাচ্ছে একটা দীঘি। বহু লোক কাজ করছে সেখানে। পথশ্রমে কাতর দু'ভাই, অনেক দিন কিছু খায়নি। তারা এসে দীঘি কাটার কাজে লাগল। রাজা একদিন এলো দীঘি কাটার কাজ দেখতে। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে রাজা চাঁদ আহতাব ও মধুসূদনকে দেখতে পেল। তাদের মুখের আদলে আছে মধুমালার মুখের ছাপ। — রাজা ছেলে দুটির নিকট গিয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, কে আমাদের মা-বাপ জানি না; অমুক নদীর ধারে, বনের পাশে এক গ্রাম, এক গোপের ঘরে আমরা ছিলাম। তারা আমাদের মা-বাপ নয়। আমরা এখন মা-বাপের খোঁজে বেরিয়েছি। মদনকুমার বুঝল, এই নদীতেই আমাকে ফেলে দিয়েছিলো। এই ছেলেদের ফেলে দিয়েছিল দুষ্ট বণিক। কারণ এই ছেলেদের মুখে মধুমালার আদল। তাদের নিয়ে মদনকুমার রাজবাড়ী চলে গেল।

তারপর সাত নৌকা সাজিয়ে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে মদনকুমার ও চাঁদ আহতাব, মধুসূদন চলে গেল চাঁট গাঁ। চাঁট খাঁয়ের বণিককে যুদ্ধে পরাস্ত করে, মধুমালাকে উদ্ধার করে আনল। বন্দী চাঁট খাঁকে প্রাণদণ্ড দিল মদনকুমার।

হংসাপাখী নুলিয়ার ঘরে বন্দী হয়েছিল। বন্দী হংসাকে নুলিয়া খেতে চাইল। হংসা বলল, আমাকে তুমি কেটো না, আমার বরে বারো বৎসরের মধ্যে তোমাদের ঘরে পুত্র সন্তান আসবে। এই নুলিয়া দম্পতী ছিল পুত্র কন্যা হীনা। কিন্তু বারো বৎসরের মধ্যে তাদের সন্তান হলো না। তখন ঠিক হলো হংসাকে কাটা হবে। সেদিন বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে। হংসাকে কাটা হবে। হংসা নুলিয়াকে বলল, ভাই বারো বৎসর বন্দী হয়ে আছি, আকাশে উড়ার শক্তি হারিয়েছি। আমাকে তো কেটে খাবে। আমাকে একবার ছেড়ে দাও, আমি উঠানে একটু ঘুরে বেড়াই।

হংসাপাখীর কথা মত মুলিয়া হংসাকে ছেড়ে দিল। হংসা উঠানে হেঁটে বেড়াতে লাগল। আর যেই মুলিয়া অন্য মনস্ক হয়েছে, অমনি হংসা সাঁ সাঁ করে আকাশে উঠল। মুলিয়া জাল নিয়ে হংসার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু হংসার লাগ পেল না। হংসা উড়ে প্রথমে গেল সেই চড়ায়, তারপর ভাটীনগরে। কিন্তু সেখানে মধুমালা, মদনকুমার ও তার পুত্রদের সন্ধান পেল না। তখন হংসাপাখী উড়ে গেল উজানী নগরে।

মধুমালার ব্রত ছিল শত্রুর হাত হ'তে মুক্ত হলে সে দেবতার পূজা দেবে। সেদিন বারো বৎসর পূর্ণ হয়েছে। শত্রুর কবল হ'তে মুক্ত হয়ে স্বামী পুত্র ফেরত পেয়েছে মধুমালা। তাই দেবতার পূজা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে রাজপুরী। হংসাপাখী মধুমালাকে দেখে নেমে পড়ল। হংসা বলল তার দুঃখের কথা। মধুমালা মদনকুমার ও জানাল তাদের দুঃখের কথা। এতদিনের দুঃখের অবসান হলো।

উজানীর রাজ সিংহাসনে বসল মদনকুমার মধুমালা। দু'পাশে বসল চাঁদ আহতাব আর মধুসূদন আর হংসা পাখী দু'পাখা বিস্তার করে তাদের মাথায় ধরল ছাতী।

আমার কথাটি ফুরালো।

—•—

[কুচবিহারের শ্রী দীননাথ দাস (হুকা গিদাল)-এর নিকট হ'তে সংগৃহীত।

ভাগ্যধর

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার রাজ্যের নাম দেউল গড়। রাজধানীর নামও দেউল গড়। দেউল গড়ের রাজার দুই পুত্র। দেখতে তারা যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধিমান। রাজা একদিন বাগানে বেড়াচ্ছে, বেড়াতে বেড়াতে তার মনে হলো এই বিশাল রাজ্য সম্পদ সব আমার। আমার লোক, লস্কর, উজির, নাজির সকলকে বেতন দিই, তবে তারা খেতে পায়। আমার স্ত্রী-পুত্র দাস-দাসী সকলেই আমার রাজ্যে উৎপন্ন শস্য খায়। এ সব আমি ভাগ্যবলে পেয়েছি। তাহলে সকলেই আমার ভাগ্যে খায়। রাজা একে একে সকলকে শুধায়, তোমরা কার ভাগ্যে খাও? সকলেই রাজাকে ভালবাসে, তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সকলেই বলল, মহারাজ আমরা আপনার ভাগ্যে খাই। রাজা শুনে খুব খুশী। রাজার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ভাগ্যধর। রাজা তাকে শুধাল, তুমি কার ভাগ্যে খাও? আমার ভাগ্যে, না নিজের ভাগ্যে?
ভাগ্যধর বলল :

কে কার ভাগ্যে খায়।
নিজের ভাগ্যে নিজে খায়।

ভাগ্যধরের কথা শুনে রাজা রাগে, দুঃখে ফেটে পড়ল। তারপর ভাগ্যেধরকে বলল, দেখি তুমি কেমন নিজের ভাগ্যে খাও! তারপর তাকে একটা বড় লোহার খাঁজায় পুরে তার মুখ বন্ধ করে কুলুপ লাগিয়ে দিল। তারপর খাঁচাটি একটা বড় বাঁশে ঝুলিয়ে কয়েকজন লোক দিয়ে গভীর বনের এক পথের ধারে রেখে চলে এলো। অসহায় ভাগ্যধর নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে সেই খাঁচার মধ্যে থাকল। দিন শেষ হলে সূর্য অস্ত যায় যায়, এমনি গোধূলি

বেলায় ভাগ্যধর দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। ভাগ্যধর ভাবল, তার বাবার রাগ পড়েছে। নিশ্চয় আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছে, সেই আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে। কিন্তু ঘোড়া যখন খাঁচার নিকট এলো তখন ভাগ্যধর দেখল রাজ বেশ পরা একজন লোক। খাঁচার মধ্যে একজন যুবক দেখে ঘোড়ার রাশ টেনে রাজ পুরুষও দাঁড়াল। খাঁচাবন্দী ভাগ্যধরের মুখে সব শুনে, খাঁচার কুলুপ ভেঙে, খাঁচা হতে তাকে মুক্ত করল। তারপর নিজের ঘোড়ায় তাকে চাপিয়ে নিয়ে চলে গেল।

এই রাজবেশধারী হলো অজয়গড়ের রাজা। ভাগ্যধরকে সে অজয়গড়ে নিয়ে গিয়ে সভাসদ করে রেখে দিল। ভাগ্যধর এই অজয়গড়ে দুই ভাবে থাকত। রাজ সভায় যখন যেতো তখন ভাল পোশাক পরত। অন্য সময় থাকতো খুব গরীবের বেশে। অজয় গড়ের রাজার ছিল এক সুন্দরী কন্যা। নাম তার লীলাবতী। একদিন লীলাবতী ভ্রমণে যাবার সময় গরীব ভাগ্যধরকে দেখল ও তাকে নিজের চাকর নিযুক্ত করল। এরজন্য রাজকন্যা তাকে মাসে কিছু টাকা দিত। এইভাবে রাজার সভাসদ ও রাজকন্যার চাকর হয়ে সে অবস্থান করতে লাগল। একজন যুবক শিক্ষক রাজকন্যাকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিত। এর সঙ্গে রাজকন্যার হলো ভালবাসা। তারা ঠিক করল সোনা-দানা, গহনাগাঁটি নিয়ে নৌকাযোগে অন্য রাজ্যে গিয়ে বিয়ে করে বসবাস করবে তারা। ভাগ্যধর সবজানতে পারল। ধনরত্ন, সোনাদানা, গহনাগাঁটি, টাকাকড়ি সব ঠিক করে রাজকন্যা সেই শিক্ষককে একটি পত্র দিল ভাগ্যধরের হাতে। কন্যা লিখ্‌ল।

এই পত্র পড়ে তুমি ভাল একটি নৌকা ও ভাল চারজন মাঝি ঠিক করে নদীর ঘাটে রাখ্‌বে। আমি সন্ধ্যায় গিয়ে নৌকায় চাপ্‌বো। ইতি—

লীলাবতী

ভাগ্যধর পত্রটি পড়ে, সেটি নিজের কাছে রাখল ও নিজে একটি পত্র লিখ্‌ল :—

এই পত্র পাঠ মাত্র তুমি দেউলনগর ছেড়ে চলে যাবে।
কারণ আমাদের প্রেমের কথা রাজা জানতে পেরেছে।
তুমি এখানে থাকলে, তোমার প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে।
ইতি— লীলাবতী

চিঠি পেয়ে প্রাণের ভয়ে মাস্টার দে চম্পট। কোথায় গেল তার কোন খবর পাওয়া গেল না। এদিকে ভাগ্যধর একটা ভাল নৌকা, দু'তিন জন মাঝি নিয়ে, নৌকাটা ঘাটে লাগিয়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে রইল। একটু মুখ আঁধারি হলে লীলাবতী সব নিয়ে নৌকার কাছে এলো। শুধাল সব ঠিক। ভাগ্যধর ইশারায় বলল সব ঠিক। লীলাবতী নৌকায় চেপে মাঝিকে নৌকা ছেড়ে দিতে বলল। নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে চলল মাঝিরা স্রোতের অনুকূলে। সকাল হলে তারা অন্য একটি রাজ্যে এসে পৌঁছাল। একটু পর লীলাবতী বুঝতে পারল শিক্ষক না এসে, এসেছে ভাগ্যধর, সেই চাকরটা। চাকরটার সাহস দেখে খুব রেগে গেল রাজকন্যা। সেই রাজ্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগল লীলাবতী। ভাগ্যধর চাকরের মত থাকতে লাগল তার কাছে।

ভাগ্যধর সেই রাজ্যের রাজার দরবারে গেল এবং চাকরী নিল সভাসদের। লীলাবতীর নিকট থাকে চাকর হয়ে আর রাজবাড়ীতে, রাজার নিকট থাকে সভাসদ হয়ে। একদিন রাজা ভাগ্যধরকে নিয়ে শিকারে গেল। শিকার শেষ হলে ফেরার পথে কুড়িয়ে পেল সুন্দর একটি স্বর্ণচাঁপা। ফুলটির যেমন গন্ধ, তেমনি বর্ণ। ফুলটি রাজার হাতে তুলে দিল ভাগ্যধর। ফুল পেয়ে রাজা আনন্দিত। কিন্তু ফুলটি তিনি দিবেন কাকে? রাণীকে, রাজকন্যাকে না রাজপুত্রকে? সমস্যায় পড়ল রাজা। ভাগ্যধর বলল, মহারাজ এই ফুলটি দিন আপনি আপনার কন্যাকে। কারণ সে সবার ছোট। তাই হলো। ভাগ্যধরের কথামত সুগন্ধি স্বর্ণচাঁপাটি রাজা দিল তার প্রিয় কন্যার হাতে। এই প্রকার সুন্দর ফুল পেয়ে কন্যা খুব খুশি। কন্যা পিতাকে বলল বাবা, এই রকম একশত একটা

ফুল আমার দরকার। এই ফুল দিয়ে আমি শিব পূজা করব। রাজা এই কথা শুনে একশত একটা ফুল আনার ভার ভাগ্যধরের উপর দিল।

যে বনে ঐ একটি ফুল পাওয়া গিয়েছিল, সেই বনে ফুলের খোঁজে গেল ভাগ্যধর। গভীর বন। সারা দিন খুঁজে কোন স্বর্ণ-চাঁপা গাছের সন্ধান পেল না। কিন্তু কিভাবে একটা স্বর্ণচাঁপা এখানে পাওয়া গেল, তাই ভাবতে লাগল ভাগ্যধর। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বন হতে বেরিয়ে যাওয়া মুশকিল। তাই বনের মধ্যে একটা গাছের উপর রাত কাটাতে মনস্থ করল সে। এই বনের মধ্যে ছিল একটা বিরাট বটগাছ। তার গোড়াটা চৌকো করে মাটি দিয়ে বেদী করা। সেই গাছে উঠে একটা মোটা ডালে বসে থাকল ভাগ্যধর।

রাত যখন একটু ভারী হলো, তখন বনে এলো একদল ডাকাত। ডাকাত দলের সঙ্গে ছিল তাদের রাণী চম্পাবতী। চম্পাবতী ঐ বটগাছের নীচের বেদীতে তার ইষ্ট দেবতা শিবের পূজা দিল। পূজা শেষ হলে তার ইষ্ট দেবতা তাকে বলল, এই বনের মধ্যে গাছে লুকিয়ে আছে তোর স্বামী, তাকে বিয়ে কর। তাহলে তোর বাসনা পূর্ণ হবে। ডাকাতদল অনেক খোঁজ করে বটগাছ হতে ভাগ্যধরকে নামাল ও তার সঙ্গে রাণীর বিয়ে দিল। তারপর তারা ভাগ্যধরকে দিল একটা লোহার আংটি। আর বলল বিপদে পড়লে এই আংটিতে চাপ দিলেই ডাকাতদল চলে আসবে ও ভাগ্যধরকে বিপদ হতে মুক্ত করবে। ভাগ্যধর এই কন্যাকে এনে রেখে দিল আলাদা একটা বাড়ীতে। লীলাবতী এ খবর জানতে পারল না। পথে আসতে আসতে এই কন্যা যেই একটু হেসেছে, অমনি তার মুখ হ'তে ঝরতে লাগল চাঁপা ফুল। এইভাবে একশত একটি চম্পকফুল সংগ্রহ করে রাজকন্যাকে দিল। হাসলে ফুল ঝরে, তাই কন্যার নাম হয়েছিল চম্পাবতী। রাজকন্যা এই ফুল দিয়ে শিবের পূজা করল। রাজার কন্যার নাম ললিতা। ফুল এনে দেওয়ার জন্য

রাজা ভাগ্যধরকে খুব ভাল বাসতে লাগল।

রাজার যে একটা পুত্র ছিল, সে ভাবল রাজা যেভাবে ভাগ্যধরকে ভাল বাসছে, তাতে কোন্‌দিন ওকেই রাজা রাজ্য দিয়ে দেবে। সে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে ভাগ্যধরকে জব্দ করা যায়। রাজপুত্রের বন্ধু-বান্ধব সকলে বলল, রাজপুত্র! অসুখের ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকবে। রাজা দেখতে এলে বলবে, আমার খুব অসুখ। আমাকে এক দেবতা স্বপ্ন দিয়েছে। একশত একটা নীলপদ্ম আনতে হবে, আর সেই ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরলে অসুখ ভাল হবে। রাজা এই ফুল আনতে ভাগ্যধরকে পাঠাবে, ভাগ্যধর আনতে পারবে না, জব্দ হবে। যাইহোক রাজপুত্রের অসুখ শুনে রাজা এলো। সব শুনে ভাগ্যধরকে পাঠাল পুত্রের জন্য একশত নীলপদ্ম আনতে। ভাগ্যধর কি আর করে! চলে গেল নীলপদ্মের খোঁজে।

রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল একটা গভীর বন। সেই বনে ছিল এক বৃহৎ সরোবর। সেখানে নাকি নীলপদ্ম ফোঁটে। এই খবর পেয়ে ভাগ্যধর নীলপদ্মের খোঁজে সেই বনে প্রবেশ করল। তারপর খুঁজতে খুঁজতে সেই সরোবরের তীরে হাজির হলো। সেই সরোবরের চারি পাশে খুঁজে তার জলে একটাও নীলপদ্ম পেল না। সরোবরের পূর্বতীরে ছিল একটা বিবাট বটগাছ। তার বেদীটা লাল মাটি দিয়ে সুন্দর করে গোল করে বাঁধান। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বন হ'তে এই সন্ধ্যায় বের হওয়া মুসকিল। তাই সেই বটগাছে উঠে একটা মোটা ডালে বসে থাকল রাত কাটানোর জন্যে। রাত যখন গভীর হলো, তখন একপাল হাতী এলো সেই বটবৃক্ষের তলে। একটি ভাল হাতীর পিঠে চেপে আছে এক সুন্দরী। সুন্দরী নামল সেই বটতলে। হাতীরা সরোবরে নেমে স্নান করল। তারপর এসে বটতলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটি বটতলে পূজা দিল তার ইষ্টদেবতাকে। পূজা শেষ হলে তার ইষ্টদেবতা তাকে বলল, এই বনে এই গাছের ডালে বসে আছে তোর হবু পতি।

তাকে বিয়ে কর। হাতীরা তখন ভাগ্যধরকে গাছ হ'তে নামাল ও তাদের রাণীর সঙ্গে ভাগ্যধরের বিবাহ দিল। হাতীর সর্দ্দার ভাগ্যধরের হাতে দিল একটা তামার আংটি। তারপর বলল, বিপাকে পড়লে এই আংটিতে ঘষা দিলেই চলে আসব আমরা, আর বিপদ হ'তে উদ্ধার করব। এই কন্যার নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী যত চুল ঝাড়ে তত নীলপদ্ম ঝরে। একশত একটা হলে, তা নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা ফুল পেয়ে খুব আনন্দিত। রাজপুত্রের এই ষড়যন্ত্র কোন কাজে লাগল না।

চম্পাবতী ও পদ্মাবতীকে ভাগ্যধর একই বাড়ীতে রেখে দিল। আর তাদের দেখাশুনার জন্য ছিল এক নাপ্‌তিনী, এই নাপ্‌তিনী এদের চুল আঁচড়াত, ঝাঁমা দিয়ে পা ঘষে দিত, নখ কেটে দিত। এই নাপ্‌তিনী আবার সেই লীলাবতীরও নখ কেটে দিত। একদিন নাপ্‌তিনী কথা প্রসঙ্গে ভাগ্যধরের দুই স্ত্রীর গুণ ও ভাগ্যধর যে একজন রাজ সভাসদ তা বলে দিল, সবশুনে লীলাবতী ভুল বুঝতে পারল ও ভাগ্যধরকে বিয়ে করল। কিছুদিন পর রাজকন্যা ললিতা ভাগ্যধরের সবকথা শুনে বিয়ে করতে চাইল। রাজা আনন্দে ভাগ্যধরের সঙ্গে ললিতার বিবাহ দিল।

ললিতার সঙ্গে যেই ভাগ্যধরের বিবাহ হলো, সেই সঙ্গে রাজপুত্রের মনে আশঙ্কা হলো সে আর রাজ্য পাবে না। তাই সে ঠিক করল যে করেই হোক ভাগ্যধরকে সে বধ করবে। আর সেই সঙ্গে তিন সুন্দরীকে সে বিবাহ করবে। রাজপুত্র এক ভোজ সভার আয়োজন করল। সুকৌশলে ভাগ্যধরের খাদ্যে বিষ মাখিয়ে দিল। ভাগ্যধর ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে এক গ্রাস বিষ মাখান খাবার খেতে খেতে ফেলে দিল ও ভাল করে মুখ ধুয়ে লোহার ও তামার আংটিতে ঘষা দিল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে ডাকাত দল ও হাতীর দল চলে এলো। তারা সব শুনল এবং সর্দ্দার হাতী শুঁড় দিয়ে রাজপুত্রকে তুলে ধরল। ভয় পেয়ে রাজপুত্র ভাগ্যধরের নিকট ক্ষমা চেয়ে কাকুতি মিনতি করল।

ভাগ্যধর তাকে ক্ষমা করে দিল।

তারপর ভাগ্যধর রাজার নিকট অনুমতি নিয়ে চার স্ত্রীর সঙ্গে পিতার রাজ্যে ফিরে গেল। এসে দেখে পিতার রাজ্য দেউলগড় অন্ধকার। অন্য এক রাজা তাদের রাজ্য অধিকার করে ফেলেছে। বন্দী হয়ে আছে রাজা-রাণী ও দাদা শশধর। লোহা ও তামার আংটিতে ঘষা দিতেই ডাকাত ও হাতীর পাল চলে এলো। তাদের সাহায্যে ঐ রাজাকে পরাজিত করল ভাগ্যধর। তারপর পিতা-মাতা ও দাদাকে সে উদ্ধার করল। দেউলগড়ের বৃদ্ধ রাজা বলল, কে বাবা তুমি! আমাকে বন্দীত্ব হতে মুক্ত করলে? তোমার মঙ্গল হোক? ভাগ্যধর বলল, পিতা আমি ভাগ্যধর। ভাগ্যের বলে আমি এই চার স্ত্রী পেয়েছি ও রাজ্য উদ্ধার করেছি। রাজা পুত্রকে জড়িয়ে ধরল বুকে। আর তার মাথায় পরিয়ে দিল রাজমুকুট।

—০—

[মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার কাগ্রাম নিবাসী শ্রী অসীম কুমার ব্যানার্জ্জীর নিকট হ'তে সংগৃহীত]।

সাদ ও সাইদ

এক গাঁয়ে বসির নামে এক গরীব লোক ছিল। এক গরীবের সুন্দরী মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তার ছিল দুই ছেলে। সাদ ও সাইদ তাদের নাম। বসির একদিন সমুদ্রের ধারে শুক্‌টি মাছ কিনতে গিয়ে একটা পাখীর বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়ে, বাচ্চাটিকে যত্ন করে বাড়ী নিয়ে এলো। পাখীর বাচ্চাটি উড়তে পারে না। বাড়ীতে থাকে ও চরাট করে। ক্রমে পাখীটি বিরাট বড় হলো। পাখীটি ছিল সি মোরগ। পাখীটি মোটা মোটা ডিম পাড়তো। সেই ডিম নিকটবর্তী হাটে বসির বিক্রী করতো। বসির দুই ছেলে সাদ ও সাইদকে পাঠশালায় পড়াতো। এই ভাবে দিন যায়।

সেখানে ছিল এক বড় লোক, সে রাজার মত বসবাস করতো। এই হাটটি তার। একদিন সে হাটে বসিরকে ডিম বিক্রী করতে দেখল। সেই বড় লোকটি সি মোরগ চিনতো। ডিম দেখে সে বুঝতে পারল, এটা সি মোরগের ডিম। বসিরকে সে শুধাল, এই ডিম সে কোথায় পেয়েছে। বসির বলল, তার বাড়ীতে একটা বড় মুরগী আছে, তার ডিম। লোকটি বুঝল, মুরগীটি সি মোরগ। লোকটি শুনেছিল সি মোরগের মাথা রান্না করে যে খাবে, সে প্রতি রাত্রে তার সিথানে পাবে এক তোড়া টাকা। আর সি মোরগের মাংস যে খাবে সে কিছু দিনের মধ্যে রাজা হবে। ঐ বড় লোকটি আরও বড় লোক ও রাজা হবার মানসে ঐ সি মোরগের মাথা ও মাংস খাবার ইচ্ছা মনে মনে ঠিক করল। একটি কুটনী মেয়ে ঠিক করে তাকে পাঠাল বসিরের বিবির কাছে। বসিরের বিবিকে কুটনী মেয়েটি বলল, ঐ বড়লোক তোমাকে বিয়ে করতে চায়। ঐ

বড় লোক তোকে ভালবাসে। এই ভাবে পাঁচ ছাঁচ কথা বলে বসিরের বিবির হাতে সে বড় লোকটির-দেওয়া এক'শ টাকা দিল। বসিরের বিবি টাকা পেয়ে রাজী হয়ে গেল। বসিরের বিবি ভাল মেয়ে ছিল না। ঐ বড় লোকটি রাতে গোপনে বসিরের বিবির কাছে আসে ও প্রতি দিন এক'শ টাকা দেয়। দিন দশেক পর ঐ লোকটি আর আসে না। একদিন দু'দিন, তিনদিন পার হবার পর, বসিরের বিবি সেই কুট্‌নী মেয়েটিকে ডেকে পাঠাল। কুট্‌নী মেয়েটি এলে বসিরের বিবি শুধাল কেন তার ভাবের লোক আসে না। কুট্‌নী মেয়েটি বলল, ঐ বড় লোকটি মুরগীর মাংস ও কল্লা খেতে চায়। তুই মুরগীর মাংস খাওয়াস নাই, তাই আসে না। এই কথা শুনে বসিরের বিবি বলল, আমার একটা বড় মুরগী আছে, তার মাংস ও কল্লা রান্না করে রেখে দিব। কুট্‌নী চলে গেল। বড় লোকটিকে সব কথা বলল। বসিরের বিবি সি মোরগ জবাই করে একটা বাটি কল্লা ও মাংস আলাদা করে রেখে হাঁড়ির সারের একটি ভাল হাঁড়িতে লুকিয়ে রাখল। তারপর সাবান মেখে স্নান করতে গেল। কারণ রাতে তার সেই ভাবের বড়লোক আসবে; আর এলেই এক'শ টাকা পাবে। বসিরের বিবি যখন স্নানে ব্যস্ত তখন তার দুই পুত্র সাদ ও সাইদ পাঠশালা হ'তে জল খাবার খেতে এসেছে। মাকে খাবার দিবার জন্য তারা ডাকল। মা তখন নিজের সুখের স্বপ্নে বিভোর। তাই সে বলল, ঘরে খাবার আছে নিয়ে সব খাগা। ছেলে দুটি ঘরে খেতে গেল। তারা ঘরে গিয়ে মুরগীর মাংসের গন্ধ পেল। গন্ধ শুঁকে তারা লুকান হাঁড়ি হ'তে সি মোরগের রান্না-করা মাংসের বাটি বার করল। সাইদ কল্লাটি খেল আর সাদ চেটেপুটে সব মাংস খেয়ে নিল। রাতে বসিরের বিবির ভাবের লোক সি মোরগের কল্লা মাংস খেতে পেল না। রাগ করে চলে গেল। সি মোরগের কল্লা বা মাংস হজম হয় না। কুট্‌নী মারফৎ লোকটি বলে পাঠাল তার দুই ছেলের পেটে কল্লা ও মাংস আছে। তাদের মেরে পেট চিরে কল্লা-মাংস বার করে

খাওয়াতে হবে, তবেই তাকে বিয়ে করবে। বসিরের বিবি মোহে পড়ে ছেলেদের মেরে তাদের পেট চিরে কলজা ও মাংস খাওয়ার বলে কথা দিল। বসির একথা শুনল। সে একটা চিঠিতে সব কথা লিখে, গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলল। লিখনটি বসির বাড়ীর দরজার উপর টাঙিয়ে দিল। সাদ আর সাইদ বাড়ীতে ঢোকার আগে লিখন পড়ে সব জানতে পারল। দুই ভাই মায়ের ব্যবহার দেখে অভিমানে দূর দেশে পালিয়ে গেল। দুই ভাই চলতে চলতে রাত হলে এক গাছতলায় শুয়ে পড়ল।

এই দেশে ছিল এক অপুত্রক রাজা। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তার শেষকার্য শেষ হলে, কে রাজা হবে এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে লাগল। বৃদ্ধ মন্ত্রী বলল, তর্ক-বিতর্ক ঝগড়ায় কাজ নাই। রাজবাড়ীর সাদা হাতীকে ছেড়ে দাও। তার পিঠে বেঁধে দাও রাজ সিংহাসন, সে যাকে সিংহাসনে চাপিয়ে আনবে সেই হবে এদেশের রাজা। সাদা হাতী ছাড়া পেয়ে ছুটে চলে গেল সেই গাছতলায়, যেখানে শুয়ে আছে সাদ ও সাইদ। হাতী সাদকে শুঁড় দিয়ে তুলে সিংহাসনে চাপিয়ে রাজপুরী নিয়ে এলো। সাদ সে দেশের রাজা হলো। সকাল হলে সাইদ দেখল সে একা, আর তার শিথানে একতোড়া টাকা। সাইদ ভাবল, কেহ বোধ হয়, ভুল করে টাকাটা ফেলে গেছে। তাই সে টাকার তোড়াটা আগলে বসে থাকল। সকাল থেকে দুপুর গড়াল। তার ভাই বা কেউ ফিরে এলো না। তখন সে টাকার তোড়াটা মাথার পাগড়ীতে লুকিয়ে পথ হাঁটিতে লাগল। অনেকদূর এসে সে একটা বাগান বাড়ী দেখতে পেল। বাড়ীর গেটের মুখে ঝুলছে একটা ডঙ্কা। পাশে লেখা আছেঃ "যে বাপের বেটা, সেই ডঙ্কায় ঘা মারুক।" এই লিখন দেখে সাইদ ডঙ্কায় ঘা দিল। একটা চাকর ডঙ্কার ঘা শুনে বেরিয়ে এসে সাইদকে ভিতরে নিয়ে গেল। এই বাগান বাড়ীতে থাকে এক বাদশার মেয়ে। বাদশার মেয়ের ইচ্ছা ছিল সুপুরুষ, সাহসী ও বেপরোয়া যুবককে বিয়ে করা। তাই সে বাগান বাড়ী

করে বসবার্স করছে। 'এই কথা শুনে সাইদ বলল, আমি তোমাকে প্রতিদিন একতোড়া করে টাকা দিব। বাদশাজাদী বলল, বেশ। প্রতিদিন সাইদ বাদশাজাদীকে একতোড়া করে টাকা দেয়। বাদশাজাদী ভাবল, এ চুরি করে না, কোথাও যায় না, তবে টাকা কিভাবে পায়! একদিন রাতে বাদশাজাদী সাইদকে শুধাল, কিভাবে তুমি প্রতিদিন একতোড়া টাকা পাও? সাইদ বলল, সি-মোরগের মাথা আমার পেটে আছে, তাই প্রতিদিন টাকা পাই। বাদশাজাদী একথা শোনার পর, একদিন সন্ধ্যায় মদ আর মাংস নিয়ে বসল। নিজে মদ খাবার ভান করল, আর সাইদকে খাওয়াতে লাগল। সাইদ মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে বমি করতে লাগল। বমি করতে করতে সি মোরগের কল্লা উগ্‌রিয়ে ফেল্‌ল। বাদশাজাদী সেটি বেশ করে ধুয়ে বাক্‌সে লুকিয়ে রাখল। আর সাইদ বাদশা-জাদীকে টাকা দিতে পারে না। বাদশাজাদী বলে, টাকা দাও? সাইদ বলে, কাল দিব। এইভাবে দশ বার দিন কাটলো। টাকা দিতে না পারায় বাদশাজাদী সাইদকে খেদিয়ে দিল।

সাইদ চলেছে পথ দিয়ে। অনেক দূর গিয়ে সে দেখতে পেল, তিন ভাই ঝগড়া করছে। সাইদ শুধাল, তোমরা ঝগড়া করছ কেন? তারা বলল, আমাদের বাপ রেখে গেছে একটি জালা, একটি গদি ও একটি চাবুক। কে কোনটা নেবে তাই নিয়ে চলছে ঝগড়া। সাইদ শুধাল এগুলোর কি এমন গুণ আছে যার জন্য তোমরা ঝগড়া করছ? তারা বলল, এই জালাটার গুণ হলো, এর মধ্যে হাত রেখে যে কেউ, যা খেতে চাইবে, জালা সঙ্গে সঙ্গে সেই খাবার দেবে। আর গদির গুণ হচ্ছে, গদির উপর চেপে যে কোন জিনিস রেখে যদি এই চাবুকটা হাতে নিয়ে গদিতে এক ঘা মারা হয়, তাহলে যেখানে মন করবে গদি সেইখানে নিমিষে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। গুণের কথা বলে তারা তিনজন সাইদকে বলল, তুমি আমাদের বিচার করে দাও কে, কী, পাবে। সাইদ বলল, এই দ্রব্যগুলি তোমাদের মধ্যে যে কোন একজনের পাওয়া উচিৎ। এখন ঠিক

করতে হবে কে সেই 'ভাগ্যবান।' তারা বলল, তুমি ঠিক করে দাও, আমরা তা মেনে নেব। সাইদ বলল, তোমরা আমাকে একটা তীর ধনুক এনে দাও। তারা সেখানে একটা বাঁশঝাড় হ'তে বাঁশ কেটে ধনুক ও শরকাঠির তীর তৈরী করে তার হাতে দিল। সাইদ বলল, এই ধনুকে তীর জুড়ে আমি নিক্ষেপ করবো, তোমাদের তিন জনের যে কেউ তীরটি প্রথমে পাবে এবং ছুটে সর্বাগ্রে এখানে আসতে পারবে সেই এসব পাবে। তিনজনে বলল, বেশ তাই হোক। সাইদ জোরে তীর ছুড়ল। তীর অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। তিন-ভাইও তীর সংগ্রহ করার জন্য ছুটল, সেই সময় জালাটি গদির উপর চাপিয়ে, গদিতে চাবুকের ঘা মেরে সে সোজা বাদশাজাদীর বাগান বাড়ীতে চলে এলো। বাদশাজাদী বলল, কি আবার এনেছ? সাইদ সব বলল, জালা হ'তে ভাল ভাল খাবার বের করে তারা খেল। দিন দশেক পর বাদশাজাদী বলল, তের নদী, সাত সমুদ্র পারে এক পীরের দরগায়ে আমার মানত আছে, কিন্তু কি করে যাব? সাইদ বলল, কেন এই গদিতে চেপে যাব, আর চলে আসব। বাদশাজাদী সেদিন জালায় হাত দিয়ে এমন সব খাবার চেয়ে নিল, যা খেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে পায়খানা চাপবে। এই সব খাবার সাইদকে খাওয়াল। তারপর গদিতে চেপে মানত শোধ দিতে গেল। কিন্তু এ সব ছিল বাদশাজাদীর চালাকি। তার মানত ছিল না, কিছুই ছিলনা। যাইহোক সে মিছামিছি সিন্নিগুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে ফিরে এলো। এদিকে সাইদের তখন খুব পায়খানা চেপেছে। সাইদ বলল, তুমি একটু দাঁড়াও আমি মলত্যাগ করে আসি। সাইদ যেই একটু আড়ালে মল ত্যাগ করতে গিয়েছে বমনি বাদশাজাদী গদিতে চেপে চলে এলো নিজের বাগান বাড়ীতে। সাইদ এসে দেখে কোথায় বাদশাজাদী, আর কোথায় তার গদি, চাবুক? মনের দুঃখে সে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে সমুদ্রের পীর খাজাখিজির উঠে এসে তাকে একটি পাখী করে দিয়ে বলল, তুই উড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে চলে যা।

তারপর তুই মুক্তি পাবি। সাইদ পাখী হয়ে উড়তে উড়তে লোকালয়ে চলে এলো, তারপর এক রাজার বাড়ীর চিলে কোঠায় গিয়ে বসল। সেখানে ছিল রাজার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা। সুন্দর একটি পাখী দেখতে পেয়ে পাখীটি সে ধরতে গেল; পাখীও ধরা দিল। পাখীর গায়ে মাথায় যেমনি কন্যা হাত বুলিয়েছে অমনি পীরের দেওয়া ঔষধটি পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাইদ আবার সাইদ হলো। রাজকন্যা বলল, তুমি কে? সাইদ তার দুঃখের কথা বলল। সবশুনে রাজ কন্যা বলল, আমি অবিবাহিতা, তোমাকে যদি সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে দিই তা'হলে আমার দুর্নাম হবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আজ আমাদের বাড়ীতে ভোজ, বহু লোক খেতে আসবে, খাওয়া শেষ হলে এঁটো পাতা এই দালানের পাশের গলিতে ফেলবে, তুমি রাতে পাতার উপর লাফিয়ে পড়বে তা'হলে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। কন্যার সঙ্গে সাইদ বোন পাতাল। কন্যা তাকে খাওয়ালো। তারপর রাতে পাতার উপর লাফ দিয়ে রাজবাড়ী হ'তে চলে এলো। চলতে চলতে সাইদ এলো এক গভীর বনে। আত্মরক্ষার জন্য রাজকন্যার নিকট সে একটা ধারাল বড় ছুরি চেয়ে নিয়েছিল। বনের মাঝ দিয়ে পথ। বনে ঢুকতেই সন্ধ্যা নামল। পথের পাশে একটা গাছতলায় সাইদ শুয়ে পড়ল। প্রথম প্রহর শেষ হ'তে এক বিরাট সাপ গাছের গোড়া বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। গাছের ডালে ছিল বেঙ্গমা বেঙ্গমী পাখীর দুইটি ছা। তাদের মা বাবা চরাট করে এখনও ফেরে নাই। ছা দুটো ভয়ে কাঁদতে লাগল। সাইদ উঠে দেখে পাখীর ছা খাবার জন্য সাপটা উঠছে। ছা দুটি বাঁচানোর জন্য সাইদ একটা ডাল ভেঙে, সাপটাকে মেরে ফেলল। তারপর ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে ছা দুটোকে খাওয়ালো; তারপর গাছ তলায় শুয়ে পড়ল। দ্বিতীয় প্রহর রাতে বেঙ্গমা বেঙ্গমী দুটো মুখে আহার নিয়ে উড়ে আসছে। ছা তাদের একদম বাঁচেনা। কে এসে খেয়ে নেয়। নদী পার হতে বেঙ্গমীর মুখ হ'তে আহার পড়ে গেল। বেঙ্গমা বলল, ওরে বেঙ্গমী আমাদের

ছা আর নাই,মুখের আহার যখন নদীতে পড়ে গেল, তখন লক্ষণ খারাপ, ফিরে চল, আর ঐ বনে যাব না, অন্য বনে যাব। বেঙ্গমী বলল, একবার বাসাটা দেখে আসি চল, ছা না থাকলে অন্য বনে যাব। বাসায় গিয়ে দেখে ছাদুটো জেগে আছে। ছা দুটি সবকথা বলে, গাছতলায় শায়িত বন্ধু সাইদের কিছু ভাল করতে বলল। বেঙ্গমা বেঙ্গমী বলল, এই লোকটি খুব ভাল। তবে এর দুটো মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে। তবে তাড়াতাড়ি সে তা ফিরে পাবে। আমরা যে গাছে আছি এই গাছের পাতা যদি কোন মানুষ মানুষীকে শোঁখান হয়, তা'হলে সে গাধা হয়ে যাবে, আর আমরা যে গাছে আছি তার বাম দিকের গাছের পাতা শোঁখালে গাধা হয়েই কোথায় কি আছে সব বলে দেবে। আর এই গাছের ডান দিকে যে গাছ আছে তার পাতা শোঁখালে আবার গাধা মানুষ হবে। সাইদ সকালে উঠে তিন রকম গাছের পাতা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার বাদশাজাদীর বাগান বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। বাদশাজাদী তাকে দেখে বলল, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি ফেলে রেখে এসেছিলাম, তবে সত্যিই তুমি বাপের বেটা। সাইদ বলল, আমার সি মোরগের মাথা ও জালা-গদি-চাবুক দাও। কিন্তু সে দিতে চায় না। সাইদ তখন তাকে একটা পাতা শুঁকিয়ে দিল, অমনি মেয়েটি গাধা হয়ে গেল। তারপর একটা লাঠি দিয়ে গাধাটাকে মারতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় পাতাটি শুঁখাল। অমনি গাধারূপ বাদশাজাদীর সি মোরগের কল্লা ও জালা-গদি-চাবুক কোথা আছে জেনে নিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করল। সি মোরগের কল্লা সে আবার গিলে নিল। জালা-গদি-চাবুক নিজের কাছে রাখল। তারপর তৃতীয় পাতাটি শুঁকিয়ে আবার বাদশাজাদীকে মানুষ করে দিল। তারপর বাদশাজাদীকে বলল, তুমি এখানে থাক, আমি আর তোমার নিকট থাকবো না। বাদশাজাদী বলল, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম মাত্র। তুমিই বাপের বেটা। তুমি আমাকে ক্ষমা করে বিয়ে কর। সাইদ

বলল, আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। বাদশাজাদী বলল, তোমাকে করতেই হবে। তবে শোন একটা গল্প :

[দুই]

একদেশে ছিল এক ধার্মিক ব্যক্তি। তার ছিল তিনজন বুদ্ধিমান পুত্র। তিন পুত্রের জন্য তিনটি লাল একটা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। তার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা একটি করে লাল ভাগ করে নেবে। কিছুদিন পর ধার্মিক লোকটি মরে গেল। ছেলে তিনজন বাক্সটি নিয়ে এসে খুলে দেখল দুই লাল আছে, একটি লাল নাই। বাড়ীতে অন্য কোন লোক ছিল না, তা'হলে ভাইদের মধ্যে কোন'ও একজন একটি লাল নিয়েছে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি! তা ঠিক করার জন্য তারা তিনজনে কাজীর দরবারে যেতে লাগল। তিন ভাই সদর পথ দিয়ে যাচ্ছে। কয়েক ক্রোশ যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা। বড় ভাই দেখল লোকটি কিছু খুঁজছে। বড় ভাই শুধাল, "আচ্ছা ভাই, তোমার কি কোন গাধা হারিয়েছে?" লোকটি বলল, হ্যাঁ। বড় ভাই বলল, "গাধাটার কি বাঁ চোখ কানা?" লোকটি বলল হ্যাঁ। দ্বিতীয় ভাই বলল, "গাধার পিঠের ছালার মধ্যে কি সির্‌কার টিন আছে? লোকটি বলল হ্যাঁ। ছোট ভাই বলল, "আচ্ছা, গাধাটির লেজের চুল দুই একদিন আগে ছাঁটা হয়েছে?. লোকটি বলল, হ্যাঁ। তারপর লোকটি ঐ তিনজনকে বলল, তোমরা নিশ্চয় আমার গাধা দেখেছ, কোথায় আছে বলে দাও। তারা বলল, "এসব আমরা অনুমান করে বললাম।" সে তখন বলল, তা'হলে তোমরাই আমার গাধা চুরি করেছ। এই বলে বিচারের জন্য সেই লোকটি ঐ তিন ভাই-এর সঙ্গে কাজীর দরবারে গেল। কাজী লোকটি আলাদা করে রাখল, আর ভাই তিনজনকে আলাদা করে রেখে তাদের কিছু খেতে দিল। কাজী তাদের খেতে দিল গমের রুটি আর খাসীর মাংস। গাধাওয়ালা মনের আনন্দে রুটি ও মাংস খেতে লাগল।

বড় ভাই রুটির টুকরা মুখে দিয়ে বলল, "আরে ছি ছি। রুটির মধ্যে মরা পোড়া মরা পোড়া গন্ধ।" মধ্যম ভাই বলল, "আরে এই মাংসটা হারাম", আর ছোট ভাই বলল, "কাজীওতো হারামী।" কাজী সব কথা শুনে প্রথমে একটা তলোয়ার নিয়ে নিজের মায়ের কাছে গেল ও জন্ম বৃত্তান্ত শুধাল। আর বলল সত্য কথা না বললে কেটে ফেলবে। কাজীর মা বলল, ঋতু স্নানের পর তোমার বাপ অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিল। আমি তখন বাড়ীর চাকরের সঙ্গে উপগত হয়েছিলাম। এইভাবে তোমার জন্ম। তারপর সেই তলোয়ার হাতে নিয়ে কসাই-এর নিকট গিয়ে হাজির, কসাইকে বলল, যে মাংস দিয়াছ তা খাসীর কিনা সঠিক বলবে। কসাই বলল, "হুজুর, আমি-মাংসের জন্য বাড়ীতেই ছাগল পুষি। যে খাসীটার মাংস দিয়েছে ছোটতে তার মা মবে যায়। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একটা কুকুর বিয়ে ছিল। ছাগলের ছাটাঐ কুকুরের দুধ খেতো। এই কথা শোনার পর তলোয়ার হাতে আটা বিক্রেতার নিকট গিয়ে বলল, তুমি খারাপ আটা দিয়েছ, কোথাকার আটা। আটা বিক্রেতা বলল, ঐ আটা আমার নিজের জমির। তবে জমির পাশে একটা শ্মশান আছে। সব শুনে কাজী নিজের বাড়ীতে ফিরে এলো। এসে বড় ভাইকে শুধাল, তুমি কিভাবে বুঝলে যে আটাতে মরা পোড়া গন্ধ। বড় ভাই বলল, খেলেই বুঝতে পারা যাবে। মধ্যম ভাইকে শুধাল, তুমি কিভাবে জানলে মাংস হারাম। মধ্যম ভাই জবাব দিল, "হারাম মাংসের উপর পাত্‌লা পর্দা থাকে, আর মাংসটার ভিতর পরদার পর পর্দা। এমন কি হাড়ের উপরেও পর্দা। তাই বুঝলাম, এ মাংস হারাম। ছোট ভাইকে কাজী শুধাল, তুমি কিভাবে জানলে যে, আমি জারজ? ছোট ভাই বলল, "যারা কানাছি লাগিয়ে কথা শোনে তারা হারামী।" কাজী বুঝল এরা তিন ভাই বুদ্ধিমান। কাজী বলল, গাধাওয়ালার কি ব্যাপার? বড় ভাই বলল, পথে আসতে আসতে দেখলাম একটা গাধার পায়ের টাটকা ছাপ। আরও দেখলাম

পথের ডানধারে ফসলগুলো খাওয়া কিন্তু বাঁ দিকের ফসলগুলি অক্ষত। তাই বুঝলাম গাধাটির বাম চোখ কানা। মধ্যম ভাই বলল, সিরকার টিনটা একটু ফুটো ছিল, তাই পথের উপর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা সিরকা পড়তে পড়তে গিয়েছে, সিরকা আরক যুক্ত তার জন্য মাটি ফেঁপে উঠেছে। তাই শুধালাম ছালায় সিরকা আছে কিনা? ছোট ভাইকে কাজী শুধাল, গাধার যে লেজ ছাঁটা তুমি কি করে জানলে? ছোট ভাই বলল, "এদেশের গাধার লেজ বেশ বড়, লেজের মাথার চুল ছাঁটা না থাকলে তা মাটি ছুঁতে ছুঁতে যায়। কিন্তু পায়ের ছাপের পাশে চুলের ছোঁয়ার দাগ নাই, তাই বুঝলাম দু' একদিনের মধ্যে লেজের চুল ছাটা হয়েছে। কথা শুনে কাজী গাধাওয়ালাকে ঐ পথের মধ্যেই গাধা খুঁজতে পাঠাল ও গাধা পেলে খবর দিতে বলল। লোকটা দ্রুতবেগে গাধা খুঁজতে গেল।

তারপর কাজী তাদের সব খবর শুনে লালের বিচার করতে বসল। কাজী বলল, তোমরা তিন ভাই বুদ্ধিমান, তোমাদের একজন যখন লাল নিয়েছ তখন সেটা দিয়ে দাও। তিন ভাই শুধাল, 'কোন ভাই লাল নিয়েছে?'

কাজী বলল, তাহলে একটা গল্প বলে তোমাদের প্রশ্ন করবো। উত্তর শুনে বলে দিব কে লাল নিয়েছে। এই বলে কাজী গল্প শুরু করল:

একগ্রামে এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে এক গরীবের ছেলের খুব ভাব ভালবাসা হয়েছিল। তারা উভয় ছিল ধর্মপ্রাণ। তারা উভয়ে কোনদিন খারাপ কাজ করেনি। গরীব বলে শেষ পর্য্যন্ত ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে হলো না। বিয়ের ঠিক হলো এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। এই ছেলেটিও উদার প্রকৃতির। গরীবের ছেলেটি মেয়েটিকে বলল, তুমি তোমার বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ পারবো।" এইভাবে তিন সত্য করল। বিয়ের

দিয়ে গরীবের ছেলেটি নিজের ঘরে থাকল, আর মেয়েটি স্বামীকে সব বলে সেখানে যাবার জন্য স্বামীর নিকট অনুমতি নিল। স্বামী অনুমতি দিল। মেয়েটি গহনা ও ভাল কাপড় খুলে সাধারণ কাপড় পরে যেতে চাইল। স্বামী বলল ঐ কাপড় গহনা পরেই যাও। মেয়েটি ঐ ভাবে যেতে লাগল। পথে এক ডাকাত তাকে ধরে গহনা পত্র নিতে চাইল। মেয়েটি ডাকাতকে সব বলে ঐ খানে অপেক্ষা করতে বলল, ফিরে এসে তাকে গহনা দিবে বলে সত্য করল। ডাকাত তাকে ছেড়ে দিল ও সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি সেই তার গরীব বন্ধুর নিকট এলো ও ডাকলো। তার ডাক শুনে ও তার মুখে সব শুনে, গরীবের ছেলেটি বলল, আজ হতে তুমি আমার মা ও তোমার স্বামী আমার বাপ। এই বলে সে আর উঠে এলো না, মেয়েটিকে ফিরে যেতে বলল। মেয়েটি ডাকাতের নিকট এসে তাকে গহনা দিতে চাইল। ডাকাত সব শুনে তাকে মা বলে ডাকল ও চলে গেল। মেয়েটি তারপর স্বামীর নিকট ফিরে এসে সব জানাল, এরপর কাজী তিন ভাইদের সকলকে পরপর জিজ্ঞাসা করল, কোন লোকটা ভাল? মেয়েটির স্বামী, না ডাকাত, না গরীবের ছেলেটি?

বড় ভাই বলল, স্বামী ভাল লোক। কাজী তাকে ছেড়ে দিল, বলল তুমি লাল নাও নাই। তারপর মধ্যমকে জিজ্ঞাসা করল, মধ্যম বলল, ডাকাত ভাল লোক। কাজী তাকেও ছেড়ে দিল। তারপর কাজী ছোট ভাইকে ডেকে শুধাল। ছোট ভাই বলল, গরীবের ছেলেটি ভাল লোক। কারণ সে ইচ্ছা করলে গোটাকতক গহনা নিতে পারতো। কাজী তখন ছোট ভাইকে বলল, তুমিই লাল নিয়েছ। ওটা তুমি নাও, আর বাকী দুটো বড় ও মধ্যমকে ভাগ করে দিল। কাজী একেএকে ঘরের মধ্যে ডেকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিল প্রশ্নের উত্তর। তিন ভাই খুশী হয়ে চলে গেল।

এই বলে বাদশাজাদী বলল, কাজী তার মা, মাংস বিক্রেতা

কসাই ও আটাওয়ালাকে মাফ করে দিল। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না? সাইদ তখন বাদশাজাদীকে ক্ষমা করে বিয়ে করল।

তারপর গদিতে চেপে বাদশাজাদীকে নিয়ে বড় ভাই সাদ যেথা আছে সেখানে এসে হাজির হলো।

[তিন]

স্বামী স্ত্রী সেখানে এসে দেখল, সাদ রাজা হয়ে তার দুই পুত্রের বিচার করছে। কোন পরিচয় না দিয়ে তারা বিচার দেখতে লাগল। মহারাজা সওদাগরকে শুধাল কি তোমার অভিযোগ? সওদাগর বলল, মহারাজ গতকাল আমি আপনার রাজ্যে এসেছি। এই দেশের পূর্বতন রাজা ছিলেন আমার বন্ধু। এসে আপনার দেখা পেলাম। শুনলাম পূর্বতন রাজা মারা গেছে, আপনি রাজা হয়েছেন। আপনি আমার কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে আপনি আমার বন্ধু। আপনি আমাকে বললেন পাশা খেলতে জান কি না। আমি বললাম জানি, তখন আপনি বললেন আজ আমার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করুন, রাতে দু'জনে পাশা খেলব। আমি বললাম, দরিয়ার উপর আমার যে জাহাজ আছে, তাতে নানা রকম দ্রব্য ও আমার বাগদত্তা রমনী আছে। আপনি বললেন, ঠিক আছে আমার দুই পুত্রকে সেখানে পাহারা দিতে পাঠাব। সকালে গিয়ে আমি আমার বাগদত্তার মুখে শুনলাম ঐ ছেলে দু'টি আমার বাগদত্তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। এখন হুজুর, আপনি বিচার করুন।

রাজা তখন বাগদত্তা মহিলাটিকে বললেন, 'বলুন' আপনার অভিযোগ। মহিলাটি কাপড়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল। সে বলল, মহারাজ ছেলে দু'টিকে শুধান ওরা কী করেছে। রাজা তার ছেলে দু'টিকে বলল, তোমাদের কিছু বলার থাকলে বল। ছেলে-দুটো বলল, মহারাজ, আমরা জাহাজে পাহারা দিতে গিয়ে, যে ঘরে এই মহিলাটি ছিলেন তার দরজায় পাহারা দিচ্ছিলাম। ছোট

ভাই বলল, শুধু শুধু ভাল লাগছেনা একটা কিচ্ছা বল। আমি বললাম, আরে কিচ্ছা আমাদের নিজেদেরই আছে। ছোট ভাই শুধাল কি? তখন আমি বললাম, আমার বাবাকে শ্বেত হস্তী শুঁড়ে করে এনে রাজা করে দিয়েছে। উজিরের কন্যার সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়েছে। সেই কন্যার আমরা সন্তান। আমাদের মা প্রতিদিন দরিয়ায় স্নান করতেন ও কলসীতে করে জল আনতেন। রাণী হয়েও প্রতিদিন তিনি এই কাজ করতেন! আজ বার বৎসর হলো দরিয়ায় স্নান করতে এসে মা কোথায় চলে গেল তার খোঁজ নাই। বড় বড় জাল এনে দরিয়া তোলপাড় করা হলো, মায়ের দেহ পাওয়া গেল না। এই কথা বলে আমরা দুঃখ করছিলাম, মহারাজ।

মহিলাটি বলল, মহারাজ এর পর এই কিচ্ছা আরও আছে, আমি জানি, যদি অনুমতি দেন তা'হলে বলি। রাজা বললেন, বলুন।

মহিলাটি বলল, মহারাজ এরপর এই কিচ্ছা আরও আছে, আমি জানি যদি অনুমতি দেন তা'হলে বলি। রাজা বললেন, বলুন।

মহিলাটি বলল, তারপর মহারাজ, ঐ ছেলেদুটির মা প্রতি-দিনের মত বার বৎসর আগে এই দরিয়ার ঘাটে স্নান করতে আসে, এক সওদাগর জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল, সে সেই মেয়েটিকে তুলে নেয়, মেয়েটি কিছুতেই যাবে না, কিন্তু সেই সময় ঘাটে বা তার ধারে কাছে কোন লোক ছিলনা। তাই সওদাগর তাকে তুলে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দেয়। রাণী সওদাগরকে বলে এখন তুমি আমাকে বিয়ে কবতে পাবে না। বার বৎসর বাপ বিটি পাতান থাকবে, তারপর বিয়ে হবে। আর এখন যদি আমাকে বিয়ে কর, তা'হলে আমি বিষ খেয়ে মরব, আমাকে পাবে না। সওদাগর বলল, বেশ তাই হবে। বার বৎসর পার হতে আর তিনদিন বাকী। জাহাজ এই ঘাটে লাগল। রাতে ছেলে দুটি পাহারা দিতে এলো। ছেলে দুটির কথা শুনে বুঝলাম এরা আমার ছেলে। এখন মহারাজ

বিচার করুন। তাছাড়া, আমি যে ঘরে বন্দী ছিলাম, তার পাশের ঘরে এক বুড়ো বন্দী হয়ে আছে। তাকেও আনুন মহারাজ। রাজার লোক গিয়ে সেই বুড়োকে জাহাজের বন্দীশালা হ'তে নিয়ে এলো। এমন সময় সাইদ বলল, মহারাজ কিচ্ছা এখনও শেষ হয় নাই, আরও আছে। সাইদ তখন সি মোরগের মাংস খাওয়া হ'তে আরম্ভ করে, দরজায় বাপের চিঠি, পলায়ন ও নিজের কাহিনী বলল। এই কথা শুনে বুড়ো বলল, মহারাজ, এই কিচ্ছা এখনও আছে। এই বলে বুড়ো সি মোরগ কাহিনীর গোড়াকার কথা হ'তে দরজায় চিঠি দেওয়া পর্যন্ত কাহিনী বলে বলল, মহারাজ, এই সওদাগর সেই ব্যক্তি, আমাকে বন্দী করে রেখেছে, যদি কোনদিন ছেলে দুটির দেখা পায়, তাহলে তাদের পেট চিরে সি মোরগের কল্লা ও মাংস বার করে খাবে। এই কথা শুনে রাজা সওদাগরকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিল ও ডালকুত্তা লাগিয়ে দিল। রাজা তার বাপ ভাই ও স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে রাজত্ব করতে লাগল। রাজা তার ছোটভাই সাইদকে খাজাঞ্চীখানার কর্তা করে দিল। আর বাপ বসিরকে রাজ পোশাক পরিয়ে সিংহাসনের পাশে স্থান দিল।

[বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার একাইহাট নিবাসিনী জমিলা খাতুনের নিকট হ'তে সংগৃহীত]

।। ঠাকুর ও তার ভৃত্য মধুসূদন ।।

এক গ্রামে ছিল এক পুরুত ঠাকুর। তার গ্রামের আসে পাশের অনেক গ্রামে তার অনেক যজমান ছিল। বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে ঠাকুর এইসব গ্রামে যেত ও যজমানের বাড়ীতে ও গ্রামে পূজা করতো। এই সব গ্রামের মধ্যস্থলে ঠাকুর পুকুর নামে ছিল একটা বড় গ্রাম। সেই গ্রামের ষষ্ঠী খুব বিখ্যাত। সাত আটটা গ্রামের মানুষেরা এই গ্রামের ষষ্ঠীতলায় পূজা দিতে আসে। এই উপলক্ষে একটা ছোটখাটো মেলা বসে। ঠাকুর মহাশয় একদিন আগে এখানে এসেছেন। পরদিন পূজা। মেয়েদের ভীড়। পূজা শেষ হ'তে সন্ধ্যা। আতপচাল, কলা, আম, মিষ্টি ইত্যাদিতে হয়েছে অনেক। একটা বড় বস্তায় বেঁধে রেখে ঠাকুর তার শিষ্যদের একটা জোয়ান মুনিষ দেখে দিতে বলল। সেই গ্রামে মধুসূদন নামে এক আধপাগল জোয়ান ছিল। তার গায়ে খুব বল। তাকেই সকলে ঠিক করে দিল; সে-ই ঠাকুর মশায়ের মালগুলো বাড়ীতে দিয়ে আসবে। ঠাকুর শুধাল কী মজুরী লাগবে। মধুসূদন বললে, মজুরী নোবনা। তবে পথে যা দেখবে তার মানে বলে দিতে হবে। ঠাকুর বললে, বেশ তাই হবে। ঠাকুর ছাতা ছড়ি নিয়ে চল্‌ল আগু আগু। মধুসূদন মাথায় মোট নিয়ে চলল তার পিছু পিছু। ঠাকুরপুকুর গ্রাম ছাড়িয়ে তারা এসেছে প্রায় দুই ক্রোশ রাস্তা। দুইজনে একটু ক্লান্ত হয়েছে। ঠাকুর বললে, মধু মোদকের দোকান হতে একপোয়া কদমা নিয়ে আয়। দু'জনে জলখেয়ে আবার হাঁটা দেব। ঠাকুরের নিকট হতে পয়সা নিয়ে মধুসূদন কদমা কিনতে গেল। মোদকের দোকান হতে কদমা কিনে ফেরার পথে মধুসূদন দেখল একদল লোক একটা যুবককে ঘিরে ধরে

খুব তারিফ করে বলছে "বাপকা বেটা, বাপকা বেটা।" মধুসূদন ঠাকুরের হাতে কদমার ঠোঙ্গা দিয়ে বললে, "ঠাকুর ঐ যুবকটাকে সবাই বাপকা বেটা বলছে কেন ?" ঠাকুর বললে, ও খুব বলবান মরদ, বোধ হয় কোন কঠিন কাজ করেছে তাতেই লোকে এই কথা বলছে। মধুসূদন বললে, না ঠাকুর মানে বলতে হবে। নইলে থাকল তোমার মোট। ঠাকুর বললে, আচ্ছা কদমা দিয়ে জল খা, যেতে যেতে সব বলবো। দু'জনে জলখেয়ে পথ চলতে লাগল। আম, জাম, কাঁঠাল আর বট পাকুড়ের ছায়া ঢাকা পথ। ঠাকুর বলছে, শোন্ বেটা কেনে ঐ যুবকটাকে বাপকা বেটা বলছে।

এক গ্রামে ছিল এক রাজমিস্ত্রি। সে লোকের দালান বাড়ী তৈরী করে দিত। এই রাজমিস্ত্রির ছিল একটি পুত্র। ছেলে লেখাপড়া ও হাতের কাজে বেশ ভাল ছিল। শৈশব-কৈশোর-যৌবনে যেমন সে লেখাপড়া শিখেছিল, তেমনি শিখেছিল ছুতার মিস্ত্রির কাজ। ছেলেটা লেখাপড়া শিখে চাকরী করতে চাইল। বাপ ছেলেকে বললে, তুই চলে গেলে আমি খুব কষ্ট পাবো। তুই বাড়ীতেই থাক, বাপ। ছেলেটি বলল, বেশ বাবা তাই হবে। ছেলেটা ভাবল, তাইতো বাপ বুড়ো আর আমি জোয়ান। একটা কিছু না করলে কাঁহাতক বসে খাওয়া যায়। তাদের গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ীতে ছিল বহুদিনের পুরাতন একটা জামগাছ। লোকে বলে এই জামগাছে নাকি বেহ্মদত্যি ছিল। তবে এখন আর ঐ দত্যি নাই। ছেলেটি ঐ জাম গাছটা কিনে তার কাঠ দিয়ে একটা ভাল খাট তৈরী করল। খাটটা ভারী সুন্দর! বেহ্মদত্যি চার পরীকে ধরে এনে জামগাছের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল। এরা রাতের চার পহরের খবর এনে দত্যিকে দিত। গাছটা কেটে যখন খাট তৈরী হলো, তখন পরী চারটেও চারটে খাটের পায়ার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকল। ছেলেটা খাট তৈরী করে একরাত ঐ খাটের উপর শুয়েছিল। সেই সময় সে ঐ চার পরীর কথাবার্তা শুনল। আর পরীরা তাকে বলল, ঐ খাট তুমি দেশের রাজাকে বিক্রী করে

এসো অনেক টাকা পাবে। ছেলেটা রাজার নিকট খাট বিক্রী করতে গেল। রাজা খাট্‌টা দেখল ও পছন্দ হলো। রাজা শুধাল এর দাম কত? ছেলেটি বলল, এর দাম আট হাজার টাকা। রাজা বলল, দাম খুব বেশী। ছেলেটি বলল, রাজা বাহাদুর একরাত এই খাটে শয্যা গ্রহণ করুন তারপর দাম দিবেন। রাজা বলল, বেশ তাই হবে। রাজা রাজপুরীতে নিজের ঘরে খাট্‌টা পেতে রাখল। রাতে তার উপর একাকী শুয়ে পড়ল। রাজা শুয়ে আছে, আর দামের কথা ভাবছে। এমন সময় বন্দী চার পরী খাটের পায়ার মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। পরীরা বলল, রাজাতো ঘুমিয়ে পড়ল, রাজ্যে কি হচ্ছে দেখতে হবে। এই বলে প্রথম পায়াটা বললে, তোরা রাজাকে ভাল ভাবে ধরে রাখিস, আমি প্রথম প্রহরটা দেখে আসি। কিছুক্ষণ পর প্রথম পায়া ফিরে খাটে লেগে গেল। অন্য তিনজন বললে, কী দেখলি? প্রথম পায়া বললে, এক দুষ্ট পরী রাজাকে মারতে আসছিল। রাজপুরীর দ্বারেই তাকে ধরলাম। তাকে মেরে সিংহদ্বারের উপর রেখে এসেছি। তা'নাহলে আজ রাজা মারা যেত।

এরপর দ্বিতীয় পায়া বললে, তোরা তিনজনে খাটটা ধর, আমি একবার দেখে আসি। এই বলে দ্বিতীয় পায়াটা উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় পায়াটা ফিরে এলো। অন্য তিনজন শুধাল, তুই কী দেখে এলি? দ্বিতীয় পায়াটা বলল, এক আজদাহা সাপ রাজাকে খেতে আসছিল। আমরা না থাকলে আজ রাজাকে ঠিক খেয়ে নিত। আমি তাকে সাত টুকরো করে কেটে রাজ পথের উপর রেখে এসেছি।

এরপর তৃতীয় পায়া বললে, আমি একটু যাই। এই বলে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এলো। অন্য তিনজন শুধাল, কী দেখে এলি? তৃতীয় পায়া বলল, এই রাজার কর্মচারীরা খুব খারাপ ও অসাধু। যে লোকটা নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছিল সে খুব দুষ্ট। একজন প্রজা তার স্ত্রী ও দুটো ছেলে নিয়ে নদী পার

হচ্ছিল। পাহারাদারটা তাদের মেরে নদীর বালীতে পুঁতে দিল আর তাদের গহনা-গাঁটি টাকা-কড়ি সব নিয়ে বাড়ীতে রেখে এসে আবার পাহারা দিতে গেল। এরপর চতুর্থ পায়া বললে, ভাই তোরা সব খাট্‌টা ভাল করে ধর রাজা যেন পড়ে না যায়। আমি একবার দেখে আসি। এই বলে চতুর্থ পায়াটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর চতুর্থ পায়াটা ঘুরে এলো। এরা শুধাল তুই কী দেখলি? চতুর্থ পায়া বলল, আমি যা দেখলাম তা বলা যাবে না। এই রাজার বিবি খুব খারাপ। সে রাজার ঘেষেড়ার সঙ্গে আছে। রোজ রাতে একবার সে ঘেষেড়ার ঘরে যায়। আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন সে ঘেষেড়ার ঘরে ঢুকল। আমি ঘেষেড়ার সঙ্গে একই ঘরে তাকে শিকল দিয়ে রেখে এসেছি।

রাজা ঘুমায় নি। সে সব শুনল ও খাট বিক্রেতাকে তারিফ ক'রল। পরদিন উঠে রাজা দেখে, সিংহদ্বারে একটা পরী মরে পড়ে আছে। রাজ পথের উপর মরে পড়ে আছে এক আজদাহা সাপ। তারপর রাজা গেল নদীর ধারে সেই পাহারাদারকে নিয়ে, যে রাতে নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছিল। তাকে সামনে রেখে অন্য লোক দিয়ে নদীর বালু খুঁড়ে তিনজনের লাশ পাওয়া গেল। তার বাড়ীতে পাওয়া গেল টাকাকড়ি গহনা। রাজা পাহারাদারের প্রাণদণ্ড দিল। এরপর রাজা জল্লাদকে নিয়ে গেল ঘেষেড়ার ঘরে। ঘেষেড়া ও রাণী তখন ভয়ে কাঁদছে। রাজা তাদের ডালকুত্তা লাগিয়ে খাওয়াল। তারপর রাজা খাটওয়ালাকে ডেকে যে দাম চেয়েছিল তার দ্বিগুণ দাম দিল। ছেলেটি সেই টাকা নিয়ে বাপের হাতে দিল।

ঠাকুর গল্প শেষ করে মধুসূদনকে বললে, এইজন্য ঐ ছেলেটি ঘিরে লোকে বলছে, "বাপকা বেটা।" ঠাকুর ও মধুসূদন পথ চলতে লাগল।

কিছুদূর যাবার পর ঠাকুর মধুসূদনকে মোট নামাতে বলল। মোট নামিয়ে দুইজনে বিশ্রাম করতে লাগল। ঠাকুর বললে,

মধুসূদন এই ভাঁড়টা ধুয়ে গ্রামের ভিতর থেকে একটু জল নিয়ে আয়। খুব জল পিপাসা লেগেছে। মধুসূদন গ্রামের মধ্যে গিয়ে একটা ইন্দারা হ'তে এক ভাঁড় জল নিয়ে আসছে। পথের পাশে সেই দেশের রাজার বাড়ী। সাত মহলা বিরাট বাড়ী। রাস্তার ধারে ফুলের বাগান ঘেরা। রাজ বাড়ীর একটা ঘরে একটি সুন্দর যুবক ও একটি সুন্দরী যুবতী বলাবলি করছে, "গাল মে চুমা গলমে হার", আর মেয়েটি বলছে, "কান মে মোড়া পোঁদ মে ঘোড়া।" মধুসূদন জল নিয়ে ঠাকুরের কাছে ফিরে এলো। ঠাকুর জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বললে, হাঁটা দে বেটা। মধুসূদন বললে, ঠাকুর মশায়, রাজ বাড়ীর মধ্যে একটি যুবক যুবতীকে বলছে, "গাল মে চুমা, গলমে হার", আব যুবতী যুবককে বলছে, "কান মে মোড়া পোঁদমে ঘোড়া।" ছেলেটা বলছে একথা তুমি কি করে জানলে? মেয়েটা বলছে, একথা তুমি কী করে জানলে? একথার ভেদ কি? ঠাকুর বললে, দুর বেটা। ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে মশকরা করছে। মধুসূদন বলল, তা হবে না ঠাকুর, থাকলো তোমার মোট আমি চল্লাম বাড়ী।

ঠাকুর বলল, তবে শোন, গল্প বলতে বলতে হাঁটা দেওয়া যাক। এই দেশে আছে এক রাজা। রাজার একমাত্র ছেলে। ছেলেটি লেখাপড়া, অস্ত্র শিক্ষা সব কিছুতেই পারদর্শী। ছেলেটি ক্রমে যুবক হয়ে উঠল। সুন্দর সুঠাম চেহারা। ছেলেটির বন্ধুদের একে একে বিয়ে হলো। রাজপুত্রের কিন্তু বিয়ে হয় না। রাজপুত্রের বন্ধুরা বলল, এবার বিয়ে কর আমরা বরযাত্রি যাব ভাল খাওয়া হবে। এই সব শুনে ছেলে একদিন গোঁসা ঘরে খিল দিল। ছেলের বাবা মা গোঁসা ঘবের দরজায় গিয়ে শুধাল কেন গোঁসা? ছেলে বলল, আমার বন্ধুদের সবার বিয়ে হয়ে গেল, আর আমার কেন বিয়ে হচ্ছে না? রাজা রাণী বললে, তোমার বিয়ে শৈশবে হয়ে গেছে অন্য দেশের এক কন্যাব সঙ্গে। এই কথা শুনে রাজপুত্র গোঁসা ঘর হ'তে বেরিয়ে এলো। বন্ধুদের বলল, তার বিয়ে হয়েছে তবে অনেক শৈশবে। তার সে কথা মনে নাই।

বন্ধুরা বল্‌ল, একবার ছদ্মবেশে বৌকে দেখে এসো কেমন বৌ। রাজপুত্র স্বর্ণকারের ছদ্মবেশে রাজকন্যার দেশে গেল যেখানে তার বিয়ে হয়েছিল। সঙ্গে নিল ভাল ভাল সোনা ও হীরের হার। রাজা তার সঙ্গে অনেক লোক দিল। রাজপুত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে সেই দেশে এলো। ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজ্যে প্রবেশ করল ও তার লোকদের বিদায় দিল। ছদ্মবেশী স্বর্ণকার রাজার নিকট গিয়ে বলল, মহারাজ আমি কিছু দামী টাকার হার এনেছি আপনার বাগান বাড়ীতে গিয়ে সেখানে বিক্রয় করতে চাই। রাজা বললেন বেশ তাই হোক। রাজ্যের মেয়েরা খবর পেয়ে হার কিনতে আসে। কিন্তু রাজকন্যা কোনদিন আসে না। একদিন রাজকন্যার এক সহচরী হার দেখতে এলো বাগানে। রাজপুত্র তাকে বলল, সে যদি রাজকন্যাকে একবার এখানে আনতে পারে, তা'হলে একটা ভাল হার তাকে পুরস্কার দিবে। সহচরী একদিন রাজকন্যাকে বলল, কন্যা বাগান বাড়ীতে একটা স্বর্ণকার এসেছে সে বেশ ভাল ভাল হার এনেছে চল দেখে আসি। রাজকন্যা বলল ও-রকম হার আমার অনেক আছে। সহচরী রোজ বলে, চল বাগানে হার দেখে আসি। অবশেষে রাজকন্যা একদিন সহচরীকে নিয়ে তাদের বাগানে এলো। দেখল এক সুন্দর যুবক হার নিয়ে বসে আছে। ছদ্মবেশী রাজপুত্র তার স্ত্রীকে দেখে খুব মুগ্ধ হলো। তারপর সহচরীকে চোখ ইশারা করল। সহচরী একটু দূরে সরে গেল। রাজপুত্র সেই অবসরে একটি ভাল গজমতির হার রাজকন্যার গলায় পরিয়ে দুই গালে চুমা খেল। এ সব কেহ দেখল না। রাজকন্যা নিজে অপমানিত বোধ করল কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। সহচরীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। রাজপুত্র তারপর দেশে ফিরে গেল ও বন্ধুদের নিকট নিজ স্ত্রীর প্রশংসা করতে লাগল।

পরপুরুষে গলায় হার দিয়ে গালে চুমা খেয়েছে তাই রাজকন্যা মন মরা হয়ে থাকে। এমনি করে কন্যা অসুখে পড়ল। একদিন এক সাধু এসে রাজাকে বলল, আমি তার কন্যার অসুখ ভাল করে

দিব। রাজকন্যার সঙ্গে সাধুর দেখা হলো। সাধু বলল, কন্যা এক সুনার তোমাদের বাগানে হার বেচতে এসেছিল? রাজকন্যা বললে, হ্যাঁ। সাধু শুধাল, সে তোমার গলায় একটা হার পরিয়ে দিয়ে তুই গালে চুমা খেয়েছে? কন্যা বলল হ্যাঁ। সাধু বলল, সেই সুনার তোমার স্বামী। সে রাজার ছেলে ছদ্মবেশে তোমাকে দেখতে এখানে এসেছিল। তার সঙ্গে শৈশবে তোমার বিয়ে হয়েছে। তুমি কি হার আর চুমার প্রতিশোধ নিতে চাও। রাজকন্যা বলল, প্রতিশোধ নিতে চাই। সন্ন্যাসী বলল, তুমি এক কাজ কর, ভাল ভাল ১০টা আরবা ঘোড়া কিনে পুরুষের ছদ্মবেশে ঐ রাজার দেশে যাও। সেই রাজাব বাগানে তুমি ঘোড়া বিক্রেতার ছদ্মবেশে থাকবে। ঘোড়া বেচবে তবে তুটি ভাল ঘোড়া বেচবে না, একটি রাখবে নিজের জন্য অন্যটি তোমাব স্বামীব জন্য। সে খুব ঘোড়া পছন্দ করে। তাকে একটা ভাল ঘোড়া দিয়ে সময় বুঝে কান দু'টি মলে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসবে।

এই সব শুনে দশটা ভাল আরবা ঘোড়া নিয়ে রাজপুত্রেব ছদ্মবেশে রাজকন্যা স্বামীর দেশে গেল। একটা ভাল ঘোড়ায় চড়ে চড়ে সে অভ্যাস করে রেখে ছিল। রাজাব নিকট গিয়ে তার বাগান বাড়ী চাইল ঘোড়া বেচার জন্য। বাজাকে একটা ভাল ঘোড়া দিল। বাগানে রোজ ঘোড়া বিক্রি হয়। ভাল দুটি সে বিক্রি করে না। শেষে দুইটি রইল। রাজপুত্র তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া বিক্রির জন্য ঘোড়াটি নিল। ঘোড়া বিক্রেতা বলল, আগে ঘোড়ায় চেপে ঘোড়া পরখ করুন, তারপর দাম হবে, যদি ঘোড়া পছন্দ হয়। রাজার ছেলে একটা ঘোড়ায় চাপল, আর বিক্রেতা একটা ঘোড়ায় চাপল। দু'জনে চেপে সদর পথের ধারে এলো। ঘোড়া বিক্রেতা সদর পথে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে চট্‌জলদি রাজপুত্রের দুই কান মলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজ দেশে ফিরে এলো। রাজপুত্র হতভম্ব হয়ে গেল। তবে এ ঘটনা ঘোড়া বিক্রেতা ও রাজপুত্র ছাড়া কেহ জানল না। তারপর দুই রাজা

মহাসমারোহে বরবরাত সহ ধুমধাম করল। রাজপুত্র নিজ স্ত্রীকে বাড়ীতে নিয়ে এলো। এখন তারা হাস্য পরিহাস ছলে প্রথমে রাজপুত্র রাজকন্যাকে বলছে, 'গালমে চুমা গলমে হার'। এই কথা শুনে রাজকন্যা বলছে, একথা তুমি কি করে জানলে বল। তারপর রাজকন্যা বলছে, 'কানমে মোড়া পোঁদমে ঘোড়া'। এই কথা শুনে রাজপুত্র বলছে, তুমি একথা কিভাবে জানলে বল। এই বলে দু' জনে খুব হাসছে।

ঠাকুর মধুসূদনকে বলল, শুনলি বেটা? চ, তাড়াতাড়ী চ। দু'জনে চলতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর আর এক রাজার রাজ্য। রাজপুরীর পাশ দিয়ে পথ। তারা দুই জনে যখন রাজপুরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখল রাজার একটা বার/তের বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ঘিরে রাজ্যের বহু লোক বলছে, "ধন্য তুমি রাজপুত্র, বাপের আঁটকুড়ো নাম ঘুচালে।" মধুসূদন একথা শুনে ঠাকুরকে বলল, ঠাকুর ঐ ছেলেটাকে ঘিরে লোকে এ কথা বলছে কেন? ঠাকুর বলল, ও কিছু নয়, না, এ কথার ভেদ বলতে হবে নইলে থাকলো তোমার মোট, আমি চল্লাম বাড়ী। ঠাকুর বলল, না রে না, যাস না। আমি তো বাড়ী চলে এসেছি, চ বাবা। যেতে যেতে গল্পটা বলছি। কথা বলতে বলতে তারা পুরী পার হয়ে এলো। ঠাকুর মধুসূদনকে বললে, যা বেটা মণ্ডা কিনে আন জল খাই। জল খেয়ে দু'জনে পথ চলতে লাগল। রাস্তার দু'ধারে আম, জাম, কাঁঠাল, বট, পাকুড় আর নিমের গাছ। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। ঠাকুর মধুসূদনকে গল্প বলতে লাগল।

এই যে রাজ বাড়ী। এই রাজার কোন সন্তান ছিল না। রাজা ছিল আঁটকুড়ো। সকাল হলে আঁটকুড়ো রাজার নাম কেহ করতো না বা মুখ দেখতো না। যদি কেহ দেখতো তার দিন ভাল যেত না। রাজার সন্তানাদি নাই, রাজা আছেন মনোদুঃখে। রাজা একদিন তার রাজ্যের বড় বড় গণৎকার ডেকে পাঠাল। গণৎকার রাজ দরবারে এলো। রাজা তাদের বলল, গণনা করে দেখুন

আমার কয়টি সন্তান আছে এবং কখন হবে। গণৎকারগণ রাজা-রাণীর জন্মদিন, বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি বিচার করল। খড়ি পাতল। সকল গণৎকারই গণনা করে আর মাথা নাড়ে। অবশেষে বলল, মহারাজ আপনার কোন সন্তানাদি হবে না। আপনি এবং আপনার স্ত্রী বাঁঝা। এই কথা শুনে রাজা খুব রেগে গেল। শহর কোতোয়ালকে হুকুম দিল, সব বেটা গণৎকারকে কারাগারে বন্দী কর। গণৎকারগণ কারাগারে চলে গেল। তারা যখন কারাগারে যাচ্ছে তখন দেখল কাদা মাখা গায়ে নেংটি পরে এক সন্ন্যাসী রাজ-বাড়ীর সিংহদ্বারের পাশে বসে আছে। সে গণৎকারদের শুধাল তোমাদের কী হয়েছে? তারা সবকথা বলল। এই কথা শুনে সন্ন্যাসী বলল, আমি একবার গুণে দেখতাম। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিলনা। তারা বলল, বড় বড় সন্ন্যাসী কিছু পারল না, বেটা কাদামাখা নেংটি-পরা সন্ন্যাসী কি করবে? ইতিমধ্যে রাজা স্বয়ং সেখানে এসে হাজির। সন্ন্যাসী রাজার পাদুটো চেপে ধরল। রাজা বলল, কি চাই? সন্ন্যাসী বলল, আপনার সন্তান হবে কি হবে না, আমি একবার দেখতে চাই। রাজা বলল, ঠিক আছে আসুন।

সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গে রাজ দরবারে এলো। সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ, আপনার সন্তান নাই। আমি আপনাকে বর দিচ্ছি। এই বরে আপনার স্ত্রীর গর্ভে যমজ সন্তান হবে। বড়টি আমাকে দিতে হবে আর ছোটটি আপনার থাকবে। আমার সঙ্গে আপনাকে এই সত্য বন্দী করতে হবে। রাজা বলল ঠিক আছে, আমি সত্য-বন্দী করলাম। সন্ন্যাসী বলল, সন্তানের বয়স যখন বার বৎসর হবে তার মধ্যে আমি নিয়ে যাব। এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেল। এক বৎসর পর রাজার স্ত্রী যমজ পুত্র সন্তান প্রসব করল। রাজা মনের আনন্দে গণৎকারদের মুক্তি দিল। বড় ছেলেটি হলো বেশ চালাক চতুর, আর ছোট ছেলেটি হলো আধক্ষেপা। বার বৎসর ঠিক পূর্ণ হবার আগে সন্ন্যাসী এলো। রাজা আধক্ষেপাটাকে দিতে চাইল।

সন্ন্যাসী বলল, মহারাজ সত্যবন্দী খেলাপ করবেন না, তা'হলে আপনার অমঙ্গল হবে। রাজা কি আর করে, বড় ছেলেটিকে সন্ন্যাসীর হাতে দিল। সন্ন্যাসী ছেলেটিকে নিয়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে দেখল, সামনে দুইদিকে দুটো পথ। একটা বার দিনের, অন্যটা বার বৎসরের। সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে শুধাল কোন্ পথে যাবে? রাজপুত্র বলল, চলুন বার বৎসরের পথে। আস্তানা নাই, পথে পথে ঘোরা হবে দেশাদি দেখা হবে। এই কথা যেই বলল, অমনি শাঁ করে সন্ন্যাসী আর রাজপুত্র সেখান হ'তে উড়ে আকাশ পথে চলে গেল। সন্ন্যাসী তার সাধনবলে রাজপুত্রকে নিয়ে এলো এক গভীর অরণ্যে। এই অরণ্যের মধ্যস্থলে একটা সরোবর। সরোবরের দক্ষিণ পাড়ে সন্ন্যাসীর আশ্রম। পশ্চিম পাড়ে এক ফুলের বাগান, তবে সেখানে জবা ফুলের গাছ বেশী। উত্তর দিকের পাড়ে একটা কালী ঠাকুরের মন্দির। সন্ন্যাসী রাজ পুত্রকে বলল, বাবা সব দিক যাবে, কিন্তু ঐ পূর্বদিকে যাবে না। সন্ন্যাসী ও রাজপুত্র থাকে এক সঙ্গে, সন্ন্যাসী সকাল হলেই রাজপুত্রকে চালডাল সব দিয়ে যায়। রাজপুত্র রান্না করে রাখে। সন্ন্যাসী এসে খায়। রাজপুত্র একটা জিনিস লক্ষ্য করল, সন্ন্যাসী যেদিন বলে কাছে কাছে থাকবো, সেদিন আসে অনেক রাতে। আর যেদিন বলে অনেক দূরে যাব, সেদিন ফিরে আসে দুপুর বেলায়। রাজপুত্র কৌতূহলী হয়ে একে একে দেখল ফুলের বাগান ও দেবীর মন্দির। কিন্তু পূর্বদিকে কী আছে? সন্ন্যাসী যেতে বারণ-ই বা করল কেন? মনে কৌতূহল জেগে উঠল। অনেকদিন পর সন্ন্যাসী বলল, আজ বাবা তাড়াতাড়ি রান্না কর দেখি, আমি আজ কাছাকাছি থাকবো। সন্ন্যাসী চলে গেল।

রাজপুত্র ধীরে ধীরে পূর্বদিকের পাড়ে গিয়ে হাজির হলো। দেখল একটা বড় বেলগাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ডালে ডালে ঝুলছে অনেকগুলি মড়ার কঙ্কাল। রাজপুত্র গুণে দেখল ৯৯টি কঙ্কাল ডালে ডালে ঝুলছে। গাছের

তলায় পড়ে অছে মড়ার মাথা। ছেলেটা চিন্তা করছে গাছে নিরানব্বইটি কঙ্কালই বা কেন ঝুলছে, আর গাছের নিচে মড়ার মাথাই বা কেন পড়ে আছে! ঠিক এমন সময় শাঁ করে একটা মড়ার কঙ্কাল নিচে নামল। বলল, রাজপুত্র ভয় খেয়ো না। আমার নাম গোপাল। এই যে সন্ন্যাসীকে দেখছো, এ খুব দুষ্ট। বৈতালিক সিদ্ধির জন্য কালীদেবীর মন্দিরে নিরানব্বইটি নরবলি দিয়েছে। আগামী শ্রাবণ মাসের মধ্যে যে অমাবস্যা তিথি আসছে সেই তিথিতে ঐ কালী মন্দিরে সন্ন্যাসী তোমাকে বলি দিয়ে বৈতালিক সিদ্ধি লাভ করবে। তোমাকে এই সরোবরে স্নান করাবে। পরাবে লালপাড় কাপড়; কপালে দিবে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় পরাবে জবা ফুলের মালা। হাতে ও পায়ে লাল আলতা পরাবে। এই কথা শুনে রাজপুত্র ভয় খেয়ে গিয়ে গোপাল কঙ্কালের পা দুটো চেপে ধরে বলল, গোপাল আমাকে বাঁচার উপায় করে দাও। গোপাল বলল, আমাকে ঐ সন্ন্যাসী প্রলোভন দিয়ে ভুলিয়ে এনে বলি দিয়েছে। আমি ওর সর্বনাশ করতে চাই। তুমি স্নান ও সিঁদুর মালা কাপড় সব পরবে। সন্ন্যাসী তারপর তোমাকে এই বেলতলায় পাঠাবে, তুমি এসে তিনবার গোপাল বলে ডাকবে। তারপর আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। যাও, এখন আশ্রমে যাও। রাজপুত্র সব শুনে আশ্রমে চলে এলো। রাতে সন্ন্যাসী ফিরে এলো। এইভাবে দিন যায়। তারপর এলো সেই শ্রাবণী অমাবস্যা।

সন্ন্যাসী সেদিন আর কোথাও গেল না। জবাফুল তুলে মালা গাঁথল। দেবী পূজার আয়োজন করতে লাগল। সন্ধ্যা হলে রাজপুত্রকে সরোবরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। রাজপুত্র বলল, রাত্রে স্নান করলে শরীর খারাপ করবে। সন্ন্যাসী বলল, আজ মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে যাব, স্নান করতে হয়। রাজপুত্র তো সব জানে, সে স্নান করল। তারপর লালপাড় কাপড় পরাল। গলায় জবাফুলের মালা দিল। কপালে দিল সিঁদুরের ফোঁটা।

হাতে ও পায়ে লাল আলতা পরাল। তারপর সন্ন্যাসী তাকে মন্দিরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সন্ন্যাসী বলল, যাও আজ পূর্বপাড়ে। সেখানে দেখবে বেল গাছে অনেক মড়া ঝুলছে, একটাকে কাঁধে করে নিয়ে এসো। রাজপুত্র পূর্বদিকে চলে গেল। তারপর বেলতলাতে গিয়ে 'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকল তিনবার। গোপাল নেমে এলো। রাজপুত্র তাকে কাঁধে নিল। গোপাল বলল, আমাকে দেবীর সামনে লম্বালম্বি রাখা হবে। এরপর সন্ন্যাসী তোমাকে বলবে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। তুমি বলবে প্রণাম জানি না। আমি রাজপুত্র, কোনদিন প্রণাম করি নাই। কেমন করে প্রণাম করতে হবে একবার দেখিয়ে দিন। সন্ন্যাসী যেমনি দেবীকে প্রণাম করে দেখাতে যাবে, থাকবে সেখানে একটা খাঁড়া; তাই দিয়ে সন্ন্যাসীকে এক কোপে কেটে ফেলবে। তারপর বলবে বৈতালিক এখন তুমি আমার। রাজপুত্র বলল, বেশ তাই হবে। রাজপুত্র গোপালকে মন্দিরে নিয়ে এলো। কঙ্কালটা লম্বালম্বি রাখা হলো দেবীর সামনে। সন্ন্যাসী বলল, রাজপুত্র দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। রাজপুত্র বলল, প্রণাম কী জানি না। আমি রাজপুত্র, কোনদিন এভাবে প্রণাম করি নি। তুমি একবার দেখিয়ে দাও। সন্নাসী বলল, এই ভাবে। সন্ন্যাসী যেমন দেবীকে প্রণাম করতে গিয়েছে অমনি রাজপুত্র এককোপে খাঁড়া দিয়ে তার মস্তক দেহচ্যুত করল, আর বলল, বৈতালিক তুমি আজ হ'তে আমার। এই কথা তিনবার বলল। গোপাল আর সন্ন্যাসী হলো রাজপুত্রের বৈতালিক। তার বৈতালিকদের আদেশ দিল, চল আমায় আমার বাড়ী নিয়ে চল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রকে তারা তার পিতার রাজ্যে এনে দিল। এসে শুনল তার ছোট ভাইটি মারা গেছে।

ঠাকুর মধুসূদনকে বলল, এই ছেলে ফিরে এসে রাজাকে সব কথা বলল; তাই প্রজারা বলছে, বাপের আঁটকুড়া নাম তুমি ঘুচিয়েছ।

—০—

[বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার চরখী গ্রাম নিবাসী মহবুবা খানের নিকট হ'তে সংগৃহীত।]

॥ চার নাগরচাঁদা ॥

এক গাঁয়ে ছিল এক সজ্জন যুবক। তার মা বাপ মারা গিয়েছিল। তার অন্য কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তার একটি ভাল বাড়ী ও কিছু জমি জায়গা ছিল। পাশের গ্রামের এক গরীবের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলো। সুন্দরী বৌ পেয়ে যুবক খুব খুশী। যুবক মাঠে নিজের জমিতে খুব কাজ করে। জমিতে সব রকম ফসল বেশ ভালই হয়। বছর দুই তিন পর যুবক দেখল তার সেই সুন্দরী বৌ অন্য এক অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে পীরিতে মজে গিয়েছে। এই দেখে সে মনে খুব আঘাত পেল। তারপর একদিন নিশিভোর রাতে বৌ, ঘর বাড়ী ছেড়ে কোথায় বিবাগী হয়ে চলে গেল।

পাগোলের বেশে এই যুবক ঘুরে বেড়ায়। একজন যুবক ডাক্তার তাকে দেখে বাড়ীতে নিয়ে এলো। বলল, আমার বাড়ীতে খাও-দাও, থাক। এই যুবক ডাক্তারের ছিল এক সুন্দরী যুবতী বৌ। ডাক্তারের ডাক্তারিতে যেমন পশার ছিল, তেমনি ছিল জমি-জমা। বাড়ীর মধ্যে চার পাঁচটি গোলায় ধান থাকতো। এই ডাক্তারের যুবতী বৌ তাদের গাঁয়ের একজন যুবককে ভাল-বাসতো। সেই যুবককে গোপনে এনে একটা বড় ফাঁকা গোলার মধ্যে লুকিয়ে রাখত। ডাক্তার খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ী হ'তে চলে গেলে খাবার নিয়ে সে গোলায় ঢুকে তার উপপতিকে খাওয়াতো। প্রতিদিনই গোলায় খাবার নিয়ে আসতে দেরী হতো, তাই মেয়েটির উপপতি প্রথমে তাকে দশ ঘা জুতো মারতো, তারপর খেতো। এই জুতোর মার খেতে মেয়েটি ভালবাসতো। একদিন ডাক্তারের এক বন্ধু ডাক্তারকে একটি গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার

দিল। ডাক্তার ফুলের তোড়া নিয়ে বাড়ী এলো ও নিজের বৌকে একটি ফুল ছুঁড়ে মারল। ফুলটি তার বৌ-এর মুখে লাগল। আর বৌ মুর্চ্ছা গেল, এমনি ভাব দেখাল। এদিকে পাগোল সবকিছু দেখছে। ফুলের ঘায়ে মেয়েটিকে মুর্চ্ছা যেতে দেখে আপন মনে একটা গান গাইতে লাগল :

মনের দুঃখ বলি কারে
বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল
পাগোল হয়ে লাগালাম গোল
ডাক্তারের সঙ্গে পথে হলো যোগাযোগ
তার ঘরে এসে দেখি সেই এমনি রোগ
চাক চাঁদার ভিতর থাকে নাগর চাঁদ।
বিবি গুণে দশ ঘা জুতো খায়
বিবি ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যায়।

ডাক্তার এই কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারল না। তাকে অনেক ডাক্তারী পরীক্ষা করল, কোন রোগ পেল না। তখন ডাক্তার ভাবল, লোকটি পাগোল হয়ে গেছে। ছোট এক শহরে ডাক্তারের এক কবিরাজ বন্ধু ছিল। সে পাগোলের চিকিৎসা করতো। ডাক্তার লোকটিকে তার কাছে নিয়ে গেল। কবিরাজ সব দেখে শুনে বলল, কিছুদিন আমার বাড়ীতে থাকুক। আমি একে ভাল করে দেখবো। পাগোলবেশী লোকটি কবিরাজের বাড়ীতে খায় দায় থাকে। কবিরাজ বাড়ী হ'তে চলে যায় তার ডাক্তার খানায়। আর কবিরাজের বৌ, কবিরাজের যে লোক ওষুধের বক্কেল আনে তার সঙ্গে নটঘট করে। তাদের এই প্রেম দীর্ঘদিনের। পাগোল সব দেখলো, দেখে গান ধরল :

মনের দুঃখ বলি কারে
বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল
পাগোল হয়ে লাগালাম গোল
ডাক্তারের সঙ্গে হলো পথে যোগাযোগ

তার ঘরে এসে দেখি একই যে রোগ
চাক চাঁদার ভিতর নাগর চাঁদা
বিবি গুণে দশ ঘা জুতো খায়
বিবি ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যায়
কবিরাজের নিকট নিয়ে গেল চিকিৎসার তরে
ঐ একই রোগ দেখি কবিরাজের ঘরে।

কবিরাজ সব শুনে কিছুই বুঝতে পারল না। পাগোলের অসুখ ধরতে পারল না। পাগোল তখন এই গান গায় ও পথে পথে বেড়ায়। এক শিক্ষক পথ বেয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষক সাধু প্রকৃতির লোক। পথে পথে গান গাওয়া পাগোল লোকটিকে দেখে তার মায়া হলো। সে পাগোলকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর লোকটি দেখল, শিক্ষকের সুন্দরী বৌ, তার বাড়ীর চাকরের সঙ্গে নটঘট করছে, যখন শিক্ষক স্কুলে চলে যায়। কয়েক দিন ধরে পাগোল এ সব দেখল। দেখে পাগোল আবার পথে পথে গান গেয়ে বেড়াতে লাগল। পাগোল গান গায়ঃ

মনের দুঃখ বলি কারে
বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল
পাগোল হয়ে লাগালাম গোল
ডাক্তারের সঙ্গে হলো পথে যোগাযোগ
তার ঘরে এসে দেখি একই যে রোগ
চাক চাঁদার ভিতর নাগর চাঁদা
বিবি গুণে দশ ঘা জুতো খায়
বিবি ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যায়
কবিরাজের নিকট নিয়ে গেল চিকিৎসার তরে
ঐ একই রোগ দেখি কবিরাজের ঘরে
সেখান হ'তে এসে পথে পথে বেড়ায়
পথে খায় পথেই ঘুমায়
পথ বেয়ে যায় এক সাধু জন

বলে পাগলামি কর কি কারণ !
চল আমার ঘরে দিব ঠাঁই
ঐ একই রোগ তার ঘরে দেখতে পাই ।

এইভাবে গান গেয়ে গেয়ে পাগোল পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেশের রাজা একদিন ভ্রমণকালে তাকে দেখতে পেল। তাকে দেখে রাজার খুব দয়া হলো, আর তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলো। পাগোল রাজবাড়ীতে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। একদিন রাজা রাজ দরবারে গিয়েছে, আব রাণী একটি বড় সিন্দুক হ'তে এক যুবককে বার করে তাকে স্নান করিয়ে ভাল ভাল খাবার খাওয়াচ্ছে, আর সেই খাবারের অবশিষ্ট রেখে দিচ্ছে। তারপর রাণী তাকে আবার বড় সিন্দুকে ভরে দিল। রাজা যখন রাণীব নিকট ফিরে এলো, রাণী তখন সেই উচ্ছিষ্ট খাবার রাজাকে খেতে দিল। রাজা বিছু জানে না, তাই খেল। পাগোল সব দেখল। —
এই যুবকটির সঙ্গে রাণী বিবাহের আগেই ভালবাসাবাসি করেছিল, তাই তাকে সিন্দুকে ভরে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর আবার সেই একই ব্যাপার। রাজা যখন খেতে যাবে পাগোল তখন রাজাকে বল্ল ঃ

মনের দুঃখ বলি কারে
বিবির কাণ্ড দেখে হলাম পাগোল
পাগোল হয়ে লাগালাম গোল
ডাক্তারের সঙ্গে হলো পথে যোগাযোগ
তার ঘরে এসে দেখি একই রোগ
চাকচাঁদার ভিতর নাগর চাঁদা
বিবি গুণে দশ ঘা জুতো খায়
বিবি ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা যায়
কবিরাজের নিকট গিয়ে চিকিৎসার তরে
ঐ একই রোগ দেখি কবিরাজের ঘরে
সেখান হ'তে এসে পথে পথে বেড়ায়

পথে খায় পথেই ঘুমায়
পথ বয়ে যায় এক সাধুজন
বলে পাগলামি কর কি কারণ ?
চল আমার ঘরে দিব ঠাঁই,
ঐ একই রোগ তার ঘরে দেখতে পাই ।
দেশের রাজার সাথে পথে হলো দেখা
পাগোলে দেখে বলে পথে পথে কেন একা,
এস রাজবাড়ীতে রাখবো আদরে
ঐ একই রোগ দেখি রাজার ঘরে
অন্ন ভক্ষিতে রাজা ঘরে যায়
পাগোল রাজার পিছু পিছু ধায়
শুনুন শুনুন রাজন্,
ঐ অন্ন উচ্ছিষ্ট করোনা ভক্ষণ
তুমি দেশের রাজা
বিচার করে পাপীদের দাও সাজা ।

রাজা শুনে আর অন্ন ভক্ষণ করলেন না। পাগোলকে শুধালেন কি ব্যাপার ? পাগোল এক এক করে ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক ও রাজার স্ত্রীর উপপতিদের কথা বলল। রাজা প্রথমে রাণীর, তারপর শিক্ষক, কবিরাজ ও ডাক্তারের ঘর হ'তে চার নাগরচাঁদকে বার করে বিচার করেন ; পাকা দেওয়ালে জীবন্ত গেঁথে দিতে বললেন, আর চার রমনীকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন।

—০—

[বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার একাইহাট নিবাসী আব্দুল কাদের সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত]

॥ পুন্‌কাবতী ॥

এক দেশে ছিল এক বিরাট দরিয়া। দরিয়ার এক কূল হ'তে অন্য কূল দেখা যায় না। দরিয়ার কূল যে কত দূর তা কে-ও জানে না। এই দরিয়ার ধারে ছিল এক দেশ। সেই দেশে বাস করতো এক সওদাগর। সওদাগরের ছিল বহু নৌকা, জাহাজ, লোক-লস্কর, মাঝি-মাল্লা। বহু নৌকা-জাহাজ সাজিয়ে পাঁচ বৎসর অন্তর সওদাগর দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেতো। সওদাগর ছিল বিরাট ধনী, তার ধনাগারে সোনাদানা, হীরামতি বহুত মজুত ছিল। সওদাগরের পাঁচ ছেলে চার মেয়ে। এছাড়া সওদাগরের খুড়তুতো, মাসতুতো ভাই-ভগ্নি সব একসাথে এক গ্রামে বসবাস করতো, সওদাগরের একটি ছোট মেয়ে ছিল, তার নাম পুন্‌কাবতী। ক্রমে ক্রমে তার ছেলে মেয়েরা বড় হলো। অন্য দেশের চার সওদাগরের মেয়ের সঙ্গে চার ছেলের বিয়ে দিল। ছোট ছেলের বিয়ে তখনও হয় নাই। মেয়েদেরও বিয়ে হয় নাই।

তার ছোট ছেলে ছিল যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি স্বাস্থ্যবান। আর ছোট মেয়ে পুন্‌কাবতী যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। বাড়ীতে অনেক আনবিহালা (কুমারী) মেয়ে। ছোট ছেলে ঠিক করল, এই সব আনবিহালা মেয়েদের একজনকে কৌশলে বিয়ে করবে, তবে নিজের বোনকে নয়। দরিয়ার ধারে ছিল নানা ফলের বাগান। তখন আমের সময়। গাছে গাছে কাঁচা, ডাঁশানো আর আধপাকা আম। ছোট ছেলেটা একদিন এক আমগাছে উঠে একটা ডাঁশান আম পাড়্‌ল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এই আমটা আমি আমাদের বাড়ীর তাকে রেখে দিব। যে মেয়ে এই আমটা খাবে তাকে আমি বিয়ে করবো। তারপর চুপি চুপি

আমটা নিয়ে বাড়ীর মধ্যে উদারার দেওয়ালের উপর একটা তাকে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর, তার ছোট বোন পুন্‌কাবতী সেই দিকে যাচ্ছিল। তাকের মধ্যে সে একটা আম দেখতে পেল। তাছাড়া আমটা বেশ খশ্‌বুও ছড়াচ্ছিল। পুন্‌কাবতী আমটা তাক হ'তে পেড়ে বেশ আরাম করে খেয়ে নিল। বৈকালের দিকে এসে ছোটছেলে আমটা দেখতে গেল, কিন্তু আমটা দেখতে পেল না। আমটা কে খেয়েছে, তা সে খোঁজ নিতে লাগল। প্রথমে সে তার বাপের খুড়তুতো, মাসতুতো মেয়েদের শুধাল। তারা বলল, না আম খাই নি। পুন্‌কাবতী বলল, আমটা আমি খেয়েছি। কি সুন্দর আম! খেতে খুব ভাল লেগেছে। তরিয়ে তরিয়ে আমটা খেয়েছি। এই কথা শুনে ছোট ছেলেটার মন খারাপ হয়ে গেল। তার নিজের ছোটবোন পুন্‌কাবতী আমটা খেয়েছে। তাকেই বিয়ে করতে হবে। ছোটছেলে তার মাকে আম ও প্রতিজ্ঞার কথা বলল। তাদের বংশে নিয়ম ছিল, যে যা প্রতিজ্ঞা করবে তা পালন করতে হবে, নাহলে বংশের অমঙ্গল। একে একে মা, বাবা দাদা, বৌদি সবাই একথা শুনল. আর পুন্‌কাবতীও শুনল। ঠিক হলো পুন্‌কাবতীর সঙ্গে তার ছোটদাদার বিয়ে দেওয়া হবে তারপর নৌকায় চাপিয়ে পুন্‌কাবতীকে দরিয়ায় বিসর্জন দেওয়া হবে। তারপর একদিন শুভদিন দেখে পুন্‌কাবতীর সঙ্গে তার ছোটদাদার বিয়ে হলো। মালাবদল, মুখ দেখাদেখি হলো। তার ছোট দাদা ও স্বামীর অন্তরে পুন্‌কাবতীর বধূবেশী মুখ চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গেল। এরপর পুন্‌কাকে বিসর্জন দেওয়ার পালা। দামীদামী শাড়ী, ওড়না, সোনা-রূপা, হীরামতির গহনা ইত্যাদিতে সাজিয়ে একটা নৌকায় চাপান হলো। মাঝি-মাল্লাবিহীন নৌকা দরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো। দরিয়ার ধারে পুন্‌কার মা, বাবা, দাদা, বৌদি, দিদি ইত্যাদি চোখের জলে দাঁড়িয়ে থাকলো। পুন্‌কার নৌকা মাঝ দরিয়া দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। রূপবতী পুন্‌কা দরিয়ার উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। এই দেখে

পুন্‌কার দাদা বলল ঃ

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, বোন আমার ঘরে ফিরে আয়।
পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, বোন আমার ঘরে ফিরে আয়।
পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, বোন আমার ঘরে ফিরে আয়।

এই কথা শুনে পুন্‌কাবতী বলল ঃ

ছিলে দাদা হলে ভাসুর, আর কি আমার ঘরে ফেরা যায়।
ছোটদাদার, আম খেয়ে, তার বৌ হলাম, হায়রে মরি হায়।
পুন্‌কাবতীর ঘরে ফেরার আরতো উপায় নাই।

দাদারা ঃ পুন্‌কাবতীর লা খানি দূরে দিয়ে যা। (তিনবার) পুন্‌কার নৌকা আরো দূর দরিয়ার দিকে ভেসে যেতে লাগল।

এরপর পুন্‌কাবতীর দিদিরা বলল ঃ

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী বোন আমার ঘরে ফিরে আয়।
পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী বোন আমার ঘরে ফিরে আয়।
পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, বোন আমার ঘরে ফিরে আয়।

এই কথা শুনে পুন্‌কাবতী উত্তর দিল ঃ

ছিলে দিদি হলে ননদ আর কি আমার ঘরে ফেরা যায়।
ছোটদাদার আম খেয়ে তার বৌ হলাম হায়রে মরি হায়।
পুন্‌কাবতীর ঘরে ফেরার আরতো উপায় নাই।

দিদিরা ঃ পুন্‌কাবতীর লা খানি দূর দিয়ে যা।
পুন্‌কাবতীর নৌকা দূর দিয়ে চলে গেল।

বৌদিরা এরপর বলল ঃ

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, ননদ আমার ঘরে ফিরে আয়।
পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, ননদ আমার ঘরে ফিরে আয়।
পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, ননদ আমার ঘরে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী উত্তর দিল ঃ

ছিলে ভাজ, হলে জা, আর কি আমার ঘরে ফেরা যায়।
ছোটদাদার আম খেয়ে তার বৌ হলাম হায়রে মরি হায়।
পুন্‌কাবতীর ঘরে ফেরার আর তো উপায় নাই।

বৌদিরা ঃ পুন্‌কার না খানি দুর দিয়ে যা।

এরপর পুন্‌কার নৌকা আরো দূর দিয়ে চলে গেল।

বাপ ও মা এরপর পুন্‌কাকে বলল ঃ

পুন্‌কারতী, পুন্‌কাবতী, মা আমার ঘরে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, মা আমার ঘরে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, মা আমার ঘরে ফিবে আয়।

পুন্‌কাবতী উত্তর দিল ঃ

ছিলে বাপ, ছিলে মা, হলে শ্বশুর শাশুড়ী আর কি আমাব ঘবে ফেরা যায়।

ছোটদাদার আম খেয়ে তার বৌ হলাম হায়রে মরি হায।

পুন্‌কাবতীব ঘবে ফেবা আবতো উপায় নাই।

বাপ ও মা ঃ পুন্‌কাবতীর না খানি দূর দিয়ে যা।

আর পুন্‌কার নৌকা অনেক দূরে চলে গেল।

ছোটদাদা ও স্বামী ঃ

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, বোন আমাব ঘরে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, বোন আমার ঘবে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবর্তী, বোন আমাব ঘবে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী উত্তর দিল ঃ

ছিলে দাদা হলে স্বামী আর কি আমার ঘবে ফেবা যায়।

তোমাব বাখা আম খেয়ে, বৌ হলাম হায়রে মবি হায়।

পুন্‌কাবতীর ঘরে ফেরাব আবতো উপায় নাই।

ছোটদাদা ও স্বামী আবার ডাকল ঃ

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, পুন্‌কারতী, ঘরে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, পুন্‌কারতী, ঘরে ফিরে আয়।

পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবতী, পুন্‌কাবর্তী, ঘরে ফিরে আয়।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল পুন্‌কাবতীর বধূবেশী মুখ। পুন্‌কাবতী একথার কোন উত্তর নাদিয়ে নৌকা হ'তে হাত ইশারা করে স্বামীকে জানাল সে ফিরবে না।

স্বামী তখন বলল : পুন্‌কাবতীর লা খানি ডুব দিয়ে যা।
এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুন্‌কার নৌকাটি মাঝ দরিয়ায় ডুবে গেল। তীরে দাঁড়িয়ে পুন্‌কার মা, বাবা, দিদিরা ও স্বামী কাঁদতে লাগল। পুন্‌কাবতী যখন ডুবে গেল তখন সেখানে একটা শঙ্খ চিল চক্রাকারে উড়তে লাগল।

নৌকাডুবির পর পুন্‌কাবতী দরিয়ার নীচের দিকে নামতে লাগল। সেখানে ছিল একটা বড় ঝিনুক। ঝিনুকটার ভিতরে কোন মাংস ছিলনা। তার একটা ডালা মাটি কাদার উপরে ছিল, আর একটা ডালা খোলা ছিল। পুন্‌কা সেই ঝিনুকের নীচের ডালায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উপরের ডালাটা নীচে নেমে গেল। পুন্‌কা নিরাপদে সেই ঝিনুকের মধ্যে রইল। এরপর পুন্‌কার ঝিনুক দরিয়ার নীচে দিয়ে চলতে লাগল। দিন গেল, মাস গেল, বছর ফিরে এলো। পুন্‌কার ঝিনুক দরিয়া ছেড়ে একটা নদীর মোহনা দিয়ে নদীতে ঢুকল। এই নদীটা এসে দরিয়ায় পড়েছিল। পুন্‌কার ঝিনুক এলো এক ঘাটের কাছে। এ দিকটা ছিল পুন্‌কার বাপের বাড়ীর উল্টো দিকে। অর্থাৎ দরিয়ার উত্তর তীরে ছিল পুন্‌কার বাপের ও স্বামীর বাড়ী। দরিয়ার দক্ষিণ দিকে নদীর মধ্যে পুন্‌কার ঝিনুক রইল নদীর জলের নীচে।

এক গয়লার পো। তার একশোটা গাই গরু আছে। সারাদিন গরু চরায় বাথানে, তারপর ঝুজকি থাকতে দুধ দুইয়ে মাথায় করে নদীপারের এক শহরে বিক্রি করতে যায়। দুধ নিয়ে নদী পার হ'তে গিয়ে তার পায়ে পুন্‌কার ঝিনুকটা ঠেক্‌ল। গয়লার পো, ঝিনুকটা পায়ে করে একটু দূরে সরিয়ে দিল। এইভাবে পরপর দু'দিন ঝিনুকটা পায়ে লাগল। আর সে পায়ে করে দূরে সরিয়ে দিল। ঝিনুকটা ঠিক সেই জলপথের নীচে আবার চলে এলো। তৃতীয় দিন আবার গয়লার পো-এর পায়ে ঝিনুকটা লাগল। এবার সে পায়ে, কি লাগল? কৌতুহল হ'লে হাতে করে তুলে দেখল, একটা বড় ঝিনুক। আর ঝিনুকটা দেখতে খুব সুন্দর। তখন

সে ঝিনুকটা বাড়ী নিয়ে গেল আর, ধানের ধাখারের নীচে রেখে দিল।

গয়লার পো রোজ দুধ বেচতে যায়। তারপর বাড়ী এসে কিছু খেয়ে গরু নিয়ে বাথানে যায়। গয়লার পো'র বাড়ীতে মা, বাপ কেউ ছিল না। তারা মারা গেছে। সেও বিয়ে করে নি। তাই সে সব কাজ নিজে করে। ঘর, দোর, উঠান, গোয়াল ঘর পরিষ্কার, তারপর রান্না-বান্না করে। গোয়ালা একদিন সন্ধ্যায় গরু নিয়ে বাড়ী এসে দেখলো, ঘর-বাড়ী ঝক্‌ঝক্ করছে, সব কিছু কাজ কে যেন করে দিয়েছে। এমন কি ভাত তরকারীও রান্না করা আছে। গয়লার পো ভেবে পায় না, কে একাজ করে? এদিকে গয়লার পো চলে গেলে পুন্‌কা ঝিনুকের পেট হ'তে বার হয়ে সব কাজ করে, আর গয়লার পো'র আসার সময় হলে ঝিনুকের মধ্যে ঢোকে। গোয়ালার পো কিছুই জানতে পারে না। পাশের বাড়ী এক বুড়ী আছে, তার কেউ নাই। সে ব্যাপারটা কয়দিন দেখছে। গোয়ালার পো, সেদিন দুধ দুইয়ে অন্য এক জনকে দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গোয়াল ঘরের মাচানে লুকিয়ে রইল। পুন্‌কাবতী ঝিনুকের ভিতর হ'তে বেরিয়ে সব কাজ করতে লাগল। গোয়ালার পো মাচা হ'তে সব দেখতে লাগল। এরপর পুন্‌কা গোয়াল কাড়তে গোয়ালে ঢুকল। আর গোয়াল কাড়া শেষ হলে যেই বেরুতে যাবে অমনি গোয়ালার পো তার শাড়ীর আঁচল চেপে ধরল। দু'জনের সঙ্গে দু'জনার দেখা হ'লো। গোয়ালার পো বলল, আমার কেউ নাই, তুমি আমাকে বিবাহ কর। পুন্‌কা বলল: আমার একবার বিয়ে হয়েছে, আর তারা আমাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর আমার জীবন খুব দুঃখের, সব শুনে যদি বিবাহ করতে চাও তো কর, আমার কোন আপত্তি নাই। এই বলে পুন্‌কা তার জীবনী গোড়া হ'তে সব বলতে লাগল। গোয়ালার পো ছাড়া এই কথা শুনতে লাগল আর দু'জন। একজন পাশের বাড়ীর বুড়ী। অন্য জন বাড়ীর মধ্যে নিমগাছের ডালে বসে থাকা

একটা শঙ্খ চিল। পুনকাবতী বলল গোয়ালার পো'র বাড়ী আসা পর্য্যন্ত সব ঘটনা। এই কথা শুনে গোয়ালার পো বলল : আমার জীবনের ঘটনা শোন।

আমি তোমার ছোটদাদা ও স্বামী, তোমাকে নৌকায় চাপানোর পর সবশেষে তোমাকে বোন বলে ডাকার পর স্ত্রীরূপে ডেকেছিলাম। তারপর তোমার নৌকা ডুবে গেল। মনে খুব ব্যথা পেলাম। মনে মনে দুঃখ হলো এই ভেবে যে, কেন, আম দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে তাকে আম রাখলাম। কেনই বা পুনকা খেল, কেনই বা বিয়ে হলো, আর কেনই বা তাকে বিসর্জন দেওয়া হলো। এই সব ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম আর বাড়ীতে থাকবো না। তারপর একদিন গভীর রাতে দরিয়ার ধারে এলাম। আমি নিজে নৌকা চালান জানতাম। একটা ভাল নৌকা নিয়ে পাড়ি দিলাম অনিশ্চিতের পথে। যেই নৌকা ছেড়েছি, অমনি এক শঙ্খ চিল উড়ে এসে নৌকার মাস্তুলে বসল। নৌকা চালাতে লাগলাম নীচের দিকে, দশ বারো দিন নৌকা চালানোর পর দেখলাম একটা নদী এসে পড়েছে দরিয়াতে। নৌকা ঢুকিয়ে দিলাম মোহনার ভিতর দিয়ে। নদী পথে অনেক দূরে এসেছি। নৌকার মধ্যে যে খাবার রেখেছিলাম তা শেষ হয়ে গেছে। নদীর তীরে দেখলাম এক গোয়ালা অনেকগুলি গাভী চরাচ্ছে। নৌকা নদীর ধারে লাগিয়ে সেই গোয়ালার নিকট এসে কিছু খাবার চাইলাম। সে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেল, আর দুধ, ভাত খাওয়ালো। গোয়ালার কেহ ছিল না। আমি তার নিকট তার পুত্রের মত থাকলাম। সেও আমাকে তার পোষ্য পুত্র নিল। শঙ্খ চিলটাও এসে পাশে উড়তে লাগল। শঙ্খ চিলটা সব সময় নৌকাতে থাকতো, আর আমি মাঠে থাকলে মাথার উপর উড়তো। তারপর কয়েক মাস বাদ গোয়ালা আর তার স্ত্রী মারা গেল। আমি আর দেশে না ফিরে এখানেই থেকে গেলাম। তারপর এই তোমার সাথে দেখা। যাক আমরা ভাই বোন হয়ে এখানেই থাকবো।

এই কথা যেই বলা হলো তখন পাশের বাড়ীর বুড়ী বলতে লাগল, তোমাদের গল্প এখনও শেষ হয় নাই। তোমাদের কথা আমিও কিছু জানি। এই বলে সেই বুড়ী বলতে লাগল :

আমি ছিলাম দাইমা। থাকতাম তোমাদের দেশে। আমার মা এবং আমি তোমাদের ভাই বোনদের প্রসব করিয়েছি। পুন্‌কা ছিল সবার ছোট। পুন্‌কা যখন প্রসব হয় তখন সেই রাতে সব সময় তোমার মায়ের নিকট আমি ছিলাম। দুপুর রাতে তোমার মায়ের বেদনা উঠল। একটা মরা কন্যা প্রসব করল তোমার মা। আমি তখন মরা সন্তানটা আর রক্ত মাখা কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি হাঁড়িতে ভরে নিকটবর্তী আঁতুর আড়ায় ঝুল বাড়াতে গিয়েছি, এমন সময় দেখি পাশের পুন্‌কাশাকের জমিতে একটা সুন্দরী সদ্যোজাত কন্যা পড়ে আছে। হাতে নিয়ে দেখলাম সে বেঁচে আছে। তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত চলে এলাম তোমার মায়ের নিকটে। তোমার মা তখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। মেয়েটি রেখে দিলাম তোমার মায়ের পাশে। তোমার মা জ্ঞান ফিরে পেল পুন্‌কাকে পেয়ে। আমি পুন্‌কার ক্ষেতে ওকে পেয়েছিলাম তাই পুন্‌কাবতী বলে ডাকতাম। এইভাবে পুন্‌কা বড় হ'তে লাগল। কয়েক বৎসর পর এক সওদাগর এলো অনেক নৌকা নিয়ে তোমাদের বাড়ী। সেখানে আমাদের জাতের একটা লোক ছিল। আমার শরীরের গঠন ছিল ভাল। তার সঙ্গে নৌকায় চেপে এই দেশে এলাম। সেই লোকটার এই গাঁয়ে বাড়ী। সে অনেকদিন মরে গেছে। তোমাদের কথা শুনে তাই সত্যি কথা এতদিনে প্রকাশ করলাম। তোমরা সংসারী হও। তোমাদের তো বিয়ে হয়েই গেছে। পুন্‌কা তোমার সহদরা নয়।

বুড়ীর কথা যেই শেষ হলো তখন নিমগাছ হ'তে আধখানা মানুষ আধখানা শঙ্খচিল একজন বলতে লাগল, পুন্‌কাবতীর গল্প এখানেই শেষ নয় আরও আছে। তিনজনে গাছের দিকে তাকিয়ে আধা মানুষ, আধা শঙ্খচিল দেখে গোয়ালার পো তাকে গাছ হ'তে

নামিয়ে আনল। সে বলল ঃ

আমি এই দেশের রাজার খাস চাকর ছিলাম। সব সময় রাজার পাশে থাকতাম। রাজা আমাকে ভালবাসতেন। রাজা আর রাণী। তাদের কোন সন্তান হয় নি। রাজার ছিল এক ছোট ভাই। রাজা তাকে খুব ভাল বাসতেন। সে ছিল রাজার ধনাগারের কর্তা। রাজা মারা গেলে সেই রাজা হবে। কারণ রাজার কোন সন্তান হয় নি, কিন্তু কয়েক বৎসর পর রাণী গর্ভবতী হলো। তখন ধনপতির খুব দুঃখ হলো। তার ভাগ্যে আর রাজা হওয়া হবে না। সে এক জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখেছিল। জাদুবিদ্যার বলে সে মানুষকে শঙ্খচিল করতে পারতো, কিন্তু ফিরিয়ে মানুষ করতে পারতো না। তাছাড়া তার গুরুর আদেশ ছিল, নিজ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই জাদু প্রয়োগ করলে তা খাটবে না। এদিকে রাণী এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করল কিছুদিন পর। সেদিন অন্য একজনের একটি মরা কন্যা হয়েছিল। সেটা কুড়িয়ে এনে গোপনে রাণীর ঘরে মরা কন্যা রেখে রাণীর কন্যাকে নিয়ে গেল। রাণী ঘুমিয়ে ছিল। কিছুই জানতে পারলো না। তারপর মন্ত্রবলে আমাকে শঙ্খচিল করে দিল ও আমার পায়ে মেয়েটিকে বেঁধে আমাকে অনেক দূরে ছেড়ে দিল। আমি মেয়েটিকে উড়িয়ে এনে দরিয়া পার করে পুন্‌কাঙ্ক্ষেতে রেখে দিলাম ও গাছের ডালে বসে থাকলাম। রাতেই এই দাই মা মেয়েটিকে নিয়ে গেল। যাক এই ভাল কাজ করার জন্য বনের বৃক্ষ দেবতা আমাকে শুনিয়ে বলল, যে মেয়েকে তুই বাঁচালি তার জীবন কথা শুনলে তুই মানুষ হবি। তাই আমি শঙ্খচিল হয়ে ঐ দেশে থাকতাম। তারপর মেয়েটির বিয়ে হলো, নৌকা করে বিসর্জন দিল। মনে মনে দুঃখ পেলাম। চক্রাকারে উড়লাম। ভাসমান পেলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেতাম। কিন্তু দেখলাম মেয়েটি ডুবে গেছে। ভাবলাম মেয়েটির স্বামীই আমার ভরসা। যদি কোনদিন সে এইসব কথা বলে, তাই তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতাম।

এক রাতে সে নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে দেখলাম। আমি উড়ে এসে নৌকার মাস্তুলে বসলাম। কারণ এই লোকটি আমার শেষ আশ্রয়। এই ভাবে এসে এখানে থামল। এক গোয়ালার আশ্রয়ে থাকল। তারপর ঝিনুক নিয়ে এলো বাড়ীতে, তারপর দেখলাম বাড়ীতে সেই মেয়েটি কাজ করছে। তারপর আজ সব কথা এই গাছে বসে শুনতে শুনতে আমি আবার পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছি। পুন্‌কাবতী বলল : তা'হলে আমি এই দেশের রাজার মেয়ে?

যখন শঙ্খচিলের গল্প শেষ হলো তখন নদীর ঘাটে শোনা গেল নানা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি ও গান। শোনা গেল, দেশের রাজা প্রমোদ ভ্রমণে এসেছেন নদীপথে। রাজা এখানে নেমে আহারাদি করবেন। শঙ্খচিল ছুটে নদীর ঘাটে গেল। রাজা অনেকদিন পর তার বিশ্বাসী চাকরকে দেখে খুশী হলো। রাজাকে শঙ্খচিল সব কথা বলল। রাজা শঙ্খচিলকে বলল যে, তার ছোট ভাই ধনপতি মারা গিয়েছে। তার শোক ভোলার জন্য তিনি নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। রাজা সব শুনে মেয়ে জামাইকে নিয়ে এলো নদীর ঘাটে। ইতিমধ্যে পুন্‌কার পালক পিতা বণিক বাণিজ্য করে ফিরে আসছিল। রাজার সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। সে পুন্‌কাবতী ও তার পুত্রকে দেখ্‌ল। সব শুনল। এইভাবে ঘটল মিলন। দাই মা নবজাত কন্যাকে বাঁচিয়েছিল, তাই দাইমাকে একটা গ্রাম দান করলেন রাজা। এই গ্রামটা সেই গোয়ালা যেখানে বাস করতো সেই গ্রাম। দাইমার নামে গ্রামটার নাম হলো দাইমার গ্রাম — দাইগ্রাম।

—•—

[কথক : নজিরণ বিবি, গ্রাম—চরখী, থানা—কেতুগ্রাম, জেলা—বর্ধমান। সংগ্রহ করেছেন—মহবুবা খাতুন, গ্রাম—চরখী, থানা—কেতুগ্রাম, জেলা—বর্ধমান। নজিরণ বিবি নিরক্ষরা। গল্পটি শুনে আমার নিজের ভাষায় লিখিত।

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন তাং—২৫-১২-১৯৮৬]

॥ সিঁদুর ॥

এক গাঁয়ে ছিল এক চাষী পরিবার। সেই গাঁয়ের পশ্চিম দিকে ছিল এক পীরের দরগা। পীরের দরগায় হিন্দু মুসলমান সকলেই ভক্তি করে সিন্নি দিত। এই চাষীর ছিল বড় পাঁচ ছেলে ও একটি ছোট ছেলে। এই চাষী এবং তার বৌ বড় পাঁচ ছেলের বিয়ে দিয়ে দিল। চাষীর ছোট ছেলেটা ছিল্ রোগা পট্‌কা। চাষী দেখলো তার এই ছোট ছেলেটা বাঁচবে না। তাই সে ছেলেটাকে নিয়ে গেল পীরের দরগায়। তারপর দরগার চাতালে ছেলেটাকে শুয়ে দিয়ে পীরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "পীরবাবা, এই ছেলেটিকে তোমাকে দিলাম। মারতে হয় মার, রাখতে হয় রাখ।" এই বলে ছেলেটিকে দরগার চাতালে রেখে চাষী চলে এলো। রাত্রিতে পীর সাহেব ফকিরের বেশ ধরে এসে, ছেলেটির কপালে একটিপ সিঁদুর দিয়ে দিল। আর রাতের মধ্যে ছেলেটার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল। পীর সাহেব স্বপ্নে দর্শন দিয়ে চাষীকে বলল, তোর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে মানুষ কর। ছেলেটাকে তোকে ফেরৎ দিলাম। এছেলে এখন থেকে আমার, কোন বিপদ হ'লে আমাকে বল্‌বি। কিছুদিন পর চাষী আর তার বৌ ছোট ছেলেটাকে বড় বৌ-এর হাতে তুলে দিয়ে বলল, "বৌমা এই সিঁদুরকে (চাষী ছেলেটির নাম রেখেছিল সিঁদুর, কারণ পীর সাহেব তার কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়েছিল তাই) তোমাকে দিলাম। একে তুমি ছেলের মত মানুষ কর। আমরা তীর্থ করতে যাব। কখন ফিরব জানি না। তাছাড়া পথিমধ্যে মৃত্যুও হ'তে পারে। (তখন তীর্থযাত্রা ছিল দুর্গম পথে, পথিমধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটত)। চাষী আরও বলল, সিঁদুরের কোন বিপদ হলে পীরের কাছে গিয়ে সব কথা বলে

পীরের সাহায্য চেয়ো। এই কথা বলে চাষী আর তার বৌ তীর্থ করতে চলে গেল।

বড় বৌ সিঁদুরকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগল। বড় বৌ-এর কোন ছেলেপিলে ছিল না। সিঁদুর বড় বৌকে মা বলতো। বড় বৌ ছাড়া চাষীর বাকী চার ছেলের বৌ ছিল খুব বদ। এই গাঁয়ের উত্তর দিকে, একেবারে গাঁয়ের শেষে বাস করতো এক মালিনী। সে জানতো যাদুবিদ্যা। তার বাড়ীর লাগোয়া ছিল একটা নানা ফল ফুলের গাছ-ঘেরা একটা বাগান ও একটি পুকুর। এই পুকুরে গা ধোয়ার ছলে আসতো নষ্ট চরিত্রের মেয়েরা। তারা তাদের উপপতিদের সঙ্গে বাগানে বসে হাসি আমোদ করতো। চাষীর বাকী চারটি বৌ মালিনীর বাগানে চান করার ছলে এসে তাদের উপপতিদের সাথে হাসি আমোদ করতো। এমনিভাবে দিন যায়। দৈব গতিতে সিঁদুর একদিন খেলা করতে করতে এসে পড়ল মালিনীর বাগানে। আর দেখতে পেল বৌদিদের কাজকর্ম। বৌদিরা দেখল সিঁদুর সব দেখেছে, আর তাদের রেহাই নাই। সিঁদুর বাড়ী গিয়ে সব বলে দেবে। বড় বৌ এই সময় বাড়ীতে ছিল না। এই বৌ চারটে বাড়ী এসে ঢেঁকিতে ধান কুটতে গেল আর সিঁদুরকে বলল গড়ে সেঁকে দিতে। তারপর ছেলেটিকে ঢেঁকিতে কুটে একটা বোড়ায় ভরে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এলো। শকুন নেমে এসে বোরার মধ্যে মুখ ভরে খেতে লাগল কোটা মাংস। বড় বৌ বাড়ী এসে অনেক খোঁজ করে সিঁদুরের দেখা না পেয়ে শ্বশুর শাশুড়ীর কথামত বড় বৌ পীরের দরগায় গিয়ে বলল, "বাবা পীর সাহেব, তোমার সিঁদুরকে পাচ্ছি না। পীর সাহেব ধ্যান-যোগে সব জেনে ফকিরের বেশ ধরে ভাগাড়ে গিয়ে শকুনকে বলল, আমাকে বোরার ভিতর থেকে একটা হাড় বার করে দে। হাড় সব প্রায় গুড়ো হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে একটা হাড় বোরার ভিতর হ'তে বার করে ফকীরের হাতে দিল। পীর সাহেব সেই হাড় হাতে নিয়ে দোয়া পড়ে ফুঁ দিল। দেখল সিঁদুর সামনে

দাঁড়িয়ে, তার দুই হাতে দুটো সোনার ভাঁটা। দুই হাতে দুই সোনার ভাঁটা নিয়ে হাসতে হাসতে সিঁদুর বাড়ী গেল্। বড় বৌদি তাকে দেখে খুব খুশী। এদিকে ঐ চার বৌদি নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছে একি হলো! যাই হোক এমনি করে দিন যায়। ক্রমে ক্রমে সিঁদুর আরো বড় হলো।

এদিকে ঐ দুষ্ট চার বৌদি মালিনীর বাড়ীতে চান করার ছলে রোজই যায়। খেলতে খেলতে কিশোর সিঁদুর আবার ঐ মালিনীর বাড়ীতে গিয়েছে। চার বৌদি তখন তাদের চার উপপতির সঙ্গে হাসি মস্করা করছে। বৌদিরা ভাবল, সিঁদুর সব বলে দেবে, আমাদেরও জাত-মান দুই যাবে। তাই সিঁদুরকে চার জায়ে চান করাতে পুকুরে নিয়ে গেল। আর চান করবার ছলে জলে ডুবিয়ে মেরে দিয়ে জলের নীচে শাপলাদলের গোঁড়ায় পুঁতে দিল। এদিকে বড় বৌদি ছেলে পায় না। একদিন পর সে আবার গেল পীরের দরগায়। জোড় হাতে বলল, "বাবা পীর সাহেব! তোমার সিঁদুরকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও। তুমি এর আগেতো একবার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছো। এই বলে বড় বৌ চলে গেল। পীর সাহেব ধ্যানযোগে সব জানতে পারল। তারপর তিনি মালিনীর পুকুরে গিয়ে সিঁদুরকে বাঁচিয়ে দিল। মালিনীর বাড়ার পাশে ছিল এক বন, সেই বনে থাকতো এক বনদেবী। সে যেমন রূপসী তেমনি সুন্দরা। তখনও তার বিয়ে হয় নি। পীর সাহেব তাকে নিজের মেয়ের মত দেখতো। বনদেবীও পীর সাহেবকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। পীর সাহেব ধ্যানযোগে দেখলো সিঁদুরের কপালে এখনও বিপদ আছে। আর সেই বিপদটা বড়। তার জন্য চাই একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাই পীর সাহেব বনদেবীকে বলল, তুমি সিঁদুরকে বিয়ে কর। তুমি পারবে সিঁদুরকে বিপদ থেকে বাঁচাতে। সেই বনে পীর সাহেবের সামনে কিশোর সিঁদুরের সাথে বনদেবীর বিয়ে হয়ে গেল। বৌ নিয়ে সিঁদুর বাড়া এলো। বড় বৌ সিঁদুরকে পেয়ে খুব খুসী। বৌকেও বরণ করে নিল।

নূতন বৌ সংসারে আসতে সংসার উন্নতি হ'তে লাগল।

ঐ দুষ্ট চার বৌ মালিনীকে গিয়ে সব কথা বলল, কেমন করে প্রথম বারে ও দ্বিতীয় বারে সিঁদুরকে মেরে পথের কাঁটা দূর করেছিল। মালিনী সব শুনে বলল, আমি জাদুবিদ্যা জানি। সেই জাদুবলে আমি সিঁদুরকে পাখী করে কোন মুলুকদিয়ে উড়িয়ে দিব। সে উড়ে চলে যাবে, তোদের পথের কাঁটা দূর হবে। এই কথা বলে মালিনী (মেলেনী) তার পুকুর হ'তে একটা কালো পোকা ধরে আনল। সেই পোকার ডানা দিয়ে একটা টিপ তৈরী করল। অমাবস্যা রাতে উলঙ্গ হয়ে সেই টিপ নিয়ে পুকুরের চারি পাশে ঘুরল মেলেনী। তার টিপটা সে তুলে রাখল একটা নিমগাছের কোঠরে। কয়েকদিন পর বেড়াতে বেড়াতে সিঁদুর আবার এলো মেলেনীর বাড়ী। মেলেনী আর তার চার বৌদি ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিয়ে গেল সেই নিমগাছের কাছে। তারপর মেলেনী চটপট টিপটা কোঠর হ'তে তুলে নিয়ে চটচটে আঁটা দিয়ে লাগিয়ে দিল সিঁদুরের কপালে। সঙ্গে সঙ্গে হলুদ, সবুজ, কালো রং-এর পাখী হয়ে সিঁদুর উড়ে গেল। কেমন পাখী হয়ে সিঁদুর উড়ে গেল সেটা তার বৌদিরা বা মেলেনী জানতে পারল না। পাখী হয়েও সিঁদুরের জ্ঞান ছিল। সে উড়ে গিয়ে বসল তার বৌ বনদেবীর কাঁধে। সুন্দর পাখীটা পেয়ে বনদেবী খুব খুশী। একটা খাঁচা এনে পাখীটাকে সে রেখে দিল খাঁচার মধ্যে। রাত্রে বনদেবী পাখীর কপালের টিঁপটা খুলে দেয়, সিঁদুর তখন মানুষ হয়ে যায়, খাওয়া-দাওয়া করে। ভোর হলে সিঁদুরের কপালে টিঁপটা লাগিয়ে দেয়, সিঁদুর হলুদমণি পাখী হয়ে খাঁচায় থাকে। এমনি করে দিন যায়।

বেশ কয়েক বৎসর পর সিঁদুরের মা, বাবা তীর্থ সেরে বাড়ী ফিরে এলো, আর সিঁদুরের খোঁজ করল। বড় বৌ সব কথা বলল, আর সিঁদুরের বৌকে দেখাল। সিঁদুরের দাদারা সিঁদুরের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু সিঁদুরের খোঁজ পেল না। সিঁদুরের

বৌ তখন বলল, "আমি যদি সতি কন্যা হই তা'হলে আমার স্বামী ফিরে আসবে। তবে যারা অপরাধী তাদের বিচার করতে হবে। সিঁদুরের দাদা বলল, অপরাধীর বিচার হবেই। তখন মা, বাবা চার দাদা ও বড় বৌকে সিঁদুরের বৌ সব কথা বলল। দোষী হলো সেই মেলেনী। গ্রামের ছেলে-মেয়ে চরিত্র নষ্ট করে পয়সা উপার্জ্জন করছে। তাকে শাস্তি দিলেই সব শান্তি। সে অনেক ব্রত জানতো। সিঁদুরদের বাড়ীর উত্তরে যে চটান জায়গা পড়েছিল — সেই চটানের মধ্যস্থলে একটা কুয়ো খোঁড়া হলো। তারপর তার উপর পাটের কাঠি বিছিয়ে দিয়ে একটি ভাল আসন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। আগের দিন তাকে সিঁদুরের বড় বৌদি বলে এসেছিল, যে তাদের একটা ব্রত করে দিতে হবে। সকালে মেলেনী ব্রত করতে এসে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। আর মাটি চাপা দেওয়া হলো তাকে। দুষ্ট চরিত্রের চার বৌ-এর মাথা নেড়া করে এক কাপড়ে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর চার ভাই-এর জন্য ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দেওয়া হলো। তারপর পীর সাহেব আর বনদেবীর শুভেচ্ছা নিয়ে তারা বসবাস করতে লাগল। বনদেবীতো বৌ হয়ে তাদের বাড়ীতেই থেকে গেল।

—০—

[বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার চুরপুনী গ্রামের নিরক্ষর চাষী শ্রীমদন মাঝির নিকট হ'তে সংগৃহীত। শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডল সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।]

॥ চুনী ॥

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার একমাত্র পুত্র, রূপবান যুবক। কিন্তু একটু বোকা বোকা। সেই রাজ্যের গ্রামে ছিল এক বুড়ী। বুড়ীর না ছিল পুত্র, না ছিল কন্যা। অনেকদিন হলো তার বুড়ো মরে গেছে। একদিন সকালে বুড়ী হাঁস, মুরগীকে দানা খাওয়াচ্ছিল, সেই সময় একটা কাক একটা ইন্দুর ছানা মুখে করে নিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল। বুড়ী কাকের মুখ হ'তে ইন্দুর ছানাটি ছাড়িয়ে ছেঁড়া জায়গাগুলোর উপর হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিল। ইন্দুর ছানাটির নাম রাখল চুনী। ছানাটি ছিল মাদী। চুনী ধীরে ধীরে বেশ বড় হলো। বুড়ী ঠিক করল চুনীর বিয়ে দিয়ে তাকে ইন্দুরের গর্ত্তে ছেড়ে দেবে। তাই চুনীকে হলুদ মাখিয়ে স্নান করাল। হলুদ মাখা জল নালা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। ঐ রাজার ছেলে কি একটা কাজে বুড়ীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হলুদ মাখা জল দেখে সে ভাবল, কোন রূপবতী স্নান করছে, আর তার রূপ ধুয়ে জল বেয়ে আসছে। রাজপুত্র বুড়ীর বাড়ী গিয়ে হাজির। বুড়ী রাজপুত্রকে একটা শীতল পাটি বিছিয়ে দিল। রাজপুত্র বলল, তোমার বাড়ীতে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে; তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। বুড়ী বলল, বাবা আমার কোন মেয়ে নাই, তবে চুনী নামে আমার নিকট ইন্দুর কন্যা আছে, তাকেই হলুদ মাখিয়ে স্নান করাচ্ছিলাম। তুমি সেই জল দেখেছ। রাজপুত্র ছিল জেদী। সে বলল, ঐ ইন্দুর কন্যা চুনীকেই সে বিয়ে করবে। চুনীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হলো। রাজপুত্র বুড়ীকে বলে গেল চুনীকে খুব সাবধানে রেখে দিতে।

রাজপুত্র বাড়ী চলে এলো। পুত্র বড় হয়েছে দেখে রাজা-রাণী

পুত্রের বিয়ে দিতে চাইল। রাজপুত্র বলল, চুনী নামে একটি মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। অতএব আর বিয়ের প্রয়োজন নাই। রাজা-রাণী বৌ আনতে বলল। রাজপুত্র বলল, সময় হলেই আসবে। অবশেষে মা, বাপের পীড়া-পীড়িতে রাজপুত্র চুনীকে নিয়ে এসে একটা বাগান বাড়ীতে চাবি দিয়ে রেখে দিল। চুনী সেখানেই থাকে। একদিন রাণী এক হাঁড়ি কলাই দিল খোসা ছাড়াতে। রাজপুত্র সেই কলাই নিয়ে চুনীকে দিয়ে এলো ও খোসা ছাড়াতে বলল। চুনী দাঁত দিয়ে সুন্দর করে খোসা ছাড়িয়ে দিল। রাণী খোসা ছাড়ানো দেখে খুব খুশী। ছেলেকে বলল, বৌমায়ের কাজ তো খুব ভাল।

একদিন রাণী খৈ ভাজল। গুড়ে মাখিয়ে খৈ-এর মোয়া করবে। খৈ ভাজা হলে ধান ছাড়ানোর জন্য চুনীর নিকট পাঠিয়ে দিল। রাজপুত্র চুনীকে খৈ দিয়ে ধান ছাড়াতে বলল। চুনী সুন্দর করে ধান ছাড়িয়ে দিল। খৈ-এর ধান ছাড়ানো দেখে রাণী আরও খুশী হলো এবং বৌ দেখতে চাইল। রাজপুত্র বলল, চুনীর এখন একটা ব্রত চলছে, কোন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে না।

রাজার একদিন পাকান ও আঁদসা খাবার ইচ্ছা হলো। রাণী বলল, চুনীকে পাঠিয়ে দিই। তার হাতের কাজ খুব ভাল। সে খুব ভাল পাকান, আঁদসা তুলে দেবে। রাজপুত্র বলল, সব কিছু দাও, চুনীকে দিয়ে আসি। আতাপ চালের আটা, আখ ও খেজুর গুড়, সরিষার তেল, লোহার ও মাটির খোলা এবং ছাকনী পাঠিয়ে দিল। রাজপুত্র ভাবছে চুনী কিভাবে পাকান আঁদসা তুলবে? যাইহোক, সব দিয়ে এলো। চুনী আর কি করে, একবার আটার উপর, একবার গুড়ের উপর, একবার তেলের উপর লাফালাফি করছে। চারজন পরী আকাশপথে উড়ে যাচ্ছিল। চুনীর লাফা-লাফি দেখে কৌতূহলী হয়ে তারা নেমে এলো। আর চুনীর নিকট সব কথা আগা গোড়া শুনল। পরীরা তখন চুনীকে রূপবতী, সুশ্রী

যুবতী করে দিল। সোনার কাজ করা শাড়ী, জামা, সোনা, হীরে, জহরতের অলঙ্কার দিয়ে সাজাল। আর মন্ত্রবলে সবচেয়ে ভাল পাকান আর আঁদসা করে দিয়ে গেল। চুনী সেগুলি একটা কাঠের খাব্বায় সাজিয়ে রেখে দিল। সকাল হলে সে তক্তাপোশের নীচে লুকিয়ে রইল। রাজপুত্র তো এ সব জানে না! পাকানের খাব্বা নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে সে চলে গেল। রাজা-রাণী পাকান, আঁদসা দেখে অবাক। 'এত সুন্দর যার হাতের কাজ, সে মেয়ে না জানি কি সুন্দরী! তাই জোর করে পুত্রের নিকট হ'তে ঘরের চাবি নিয়ে রাজা-রাণী বাগান বাড়ী চলে এলো। রাজপুত্রও এলো। সে বুঝল, আজতো সব জানাজানি হয়ে যাবে।

রাণী চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘর খুলল। দেখল এক রূপসী রাজকন্যা বসে আছে। রাজা-রাণী চুমা খেয়ে পুত্রবধূকে ঘরে আনল। এতদিন তাকে বন্দী কবে রাখার জন্য পুত্রকে খুব বকল। কিন্তু পুত্র বুঝতে পারল না কিভাবে চুনী মেয়ে হলো।

চুনী সন্ধ্যার সময় স্বামীকে সব কথা বলল। আর সুখে সংসার করতে লাগল।

—০—

[বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অজয় তীরবর্তী চরখী গ্রাম নিবাসিনী বেগম মহবুবা খানের নিকট হ'তে সংগৃহীত।]

॥ রত্নমালা ॥

একদেশে ছিল এক রাজা। রাজার একমাত্র পুত্র। সে খুব বুদ্ধিমান। রাজার কোন কিছুর অভাব নাই। ধনদৌলত, সোনা-দানায় রাজকোষ ভরপুর। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক-লস্করে রাজপুরী সদা-সর্বদা ভরপুর। এই রাজ্যে ছিল এক মধ্যবয়স্ক শিক্ষক। সর্বশাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত। রাজকুমার মণিমালা তার নিকট পড়তে গেল। পণ্ডিত অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাকে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষা দিল। বারো বৎসর শিক্ষালাভের পর রাজপুত্র শুধাল, গুরুদেব, আপনি কি চান? পণ্ডিত বললে, "বাবা, আমি তোমাদের রাজ্যে থাকি, রাজা আমাকে বহু বিঘা সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর দিয়েছেন, রাজকোষ হ'তে নিয়মিত বৃত্তি পাই, আর কিছু চাই না।" রাজ-কুমার বলল, "না গুরুদেব, আপনাকে কিছু নিতে হবে,।" তখন পণ্ডিত বললেন, "বাবা তোমরা রাজা, তোমাদের ঘরে নানা রকম মণি মুক্তা আছে, আমাকে একটা মাণিক দাও, আমি সেটা যত্ন করে রেখে দিব।" রাজকুমার বললে. "বেশ গুরুদেব, তাই দিব।"

রাজপুত্র তার পিতার নিকট এসে বললে, "বাবা, আমার বিদ্যা শিক্ষা শেষ হয়েছে। পণ্ডিত মহাশয়কে আমি একটা মাণিক দিব বলেছি, তা একটা মাণিক আমাকে দাও, আমি গুরুদেবকে দিব।" রাজা বললে, সাত রাজার ধন এক মাণিক। আমার রাজ্যের মত এমনি সাতটা রাজ্য বিক্রী করলে তবে একটা মাণিক পাওয়া যাবে। আমি কোথায় মাণিক পাবো? বরং পণ্ডিতকে বল, টাকা-কড়ি সোনা, রূপা, কিংবা জমি যা খুশী তা গ্রহণ করুক। রাজপুত্র বললে, না বাবা তা হবে না, মাণিকই দিতে হবে, আমি তার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি। পণ্ডিত মশাই কিছুই নিতে চান নি। তাই, যে

করে হোক পণ্ডিত মশাইকে মাণিক দিতেই হবে। তখন রাজা বললে, "বাবা, শুনেছি তোমার মায়ের নিকট একটি মাণিক আছে, তোমার নানা এই মাণিকটা তোমার মাকে দিয়েছিল বিয়ের সময়। যদি সেটা থাকে তা'হলে সেটা তুমি তোমার গুরুদেবকে দাও গা।" রাজপুত্র তখন তার মায়ের নিকট গিয়ে বললে, "মা, আমার পাঠ শেষ হয়েছে, গুরুদেবকে আমি একটা মাণিক দিব বলেছি, কিন্তু আমাদের রাজ ভাণ্ডারে কোন মাণিক নাই, তোমাকে তোমার বাবা একটা মাণিক দিয়েছে, সেই মাণিকটা দাও, গুরুদেবকে দিব। এই কথা শুনে মা, ছেলেকে বললে বাবা, সে মাণিক তো আমার নিকট নাই। বাপের বাড়ী হ'তে নৌকায় চেপে সমুদ্রের উপর দিয়ে আসছিলাম। একদিন নৌকার ছাদের উপর বসে ভাবলাম মাণিকটা বাবা আমাকে দিয়েছে, কেমন মাণিক একবার দেখি। যেমন হাতে নিয়ে দেখছি অমনি আকাশ থেকে একটা শঙ্খচিল এসে ছোঁ মেরে মাণিকটা নিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর মাণিকটা টুব করে চিলের পা হ'তে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। মাণিক সেই সমুদ্রের মধ্যে আছে। তখন রাজপুত্র মণিমালা বললে, "মা, সাগর ছেঁচে সেই মাণিক আমি নিয়ে আসব, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।" মা বললে, "ক্ষেপা ছেলে, সাগরে কত জল, তা কি কখন ছেঁচা যায়, আর সাগরের কোন তলায় মাণিক পড়ে আছে তা পাবি বা কেমন করে?" ছেলে জেদ ধরল, সে যাবেই, আর মাণিক এনে তার গুরুদেবকে দেবেই।

শুভদিন দেখে মণিমালা মাণিক উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের দিকে যাত্রা করল। সমুদ্রের নিকটে এসে সে সমুদ্রের একটি কোণ কাদা দিয়ে বাঁধল, তারপর জলটুকু সেচল। তারপর আবার খাণিকটা বাঁধল ও সেচতে লাগল। রাজপুত্রের জল ছেঁচা দেখে, সমুদ্র তার আশ্রিতদের সকলকে ডাকল ও বললে, কে এই রাজপুত্রের মাণিক নিয়েছ, তা ফেরৎ দিয়ে এসো। এই কথা শুনে দেবী গঙ্গা বললে, মাণিক আমিই নিয়েছি। সমুদ্র বললে যাও,সতী মায়ের সত্যনিষ্ঠা

পুত্র, মাণিক তাকে ফেরৎ দিয়ে এসো। গঙ্গাদেবী এক বুড়ীর বেশ ধরে রাজপুত্রের নিকট এসে হাজির হলো। বুড়ী রাজপুত্রকে বলল, তুমি সাগর চেঁচ্‌চ কেন? রাজপুত্র বললে, মাণিকের জন্যে। আমার মায়ের মাণিক শঙ্খচিলে ছোঁ মেরে নিয়ে এই সাগরে ফেলে দিয়েছে। বুড়ী বললে, সাগর ছেঁচে কি মাণিক পাওয়া যায় বাবা? তুমি বাড়ী যাও। রাজপুত্র সবকথা শুনে বললে, মরব সে-ও স্বীকার, তবু মাণিক না নিয়ে বাড়ী যাব না। বুড়ী তখন নিজ মূর্তি ধরে বললে, বাবা আমি গঙ্গা, আমিই শঙ্খচিল হয়ে তোমার মায়ের হাত হ'তে মাণিকটা নিয়েছিলাম। তা তোমাদের মাণিক তুমি নিয়ে যাও। তবে, এমনি হাতে হাতে মাণিক নিয়ে যেও না, বিপদ হ'তে পারে। তুমি জয় মা গঙ্গাদেবী বলে মাণিকটা জানুর মধ্যে রাখ, মাণিক জানুর মধ্যে চলে যাবে। আবার জয় মা গঙ্গা বলে জানুতে হাত দিলেই মাণিক হাতে চলে আসবে। রাজপুত্র জয় মা গঙ্গা বলে মাণিকটা যেমন জানুতে ঠেকিয়েছে, অমনি মাণিকটা জানুর মধ্যে চলে গেল। ছেলেটা তখন বললে, "ঐ যাঃ মাণিকটা হারিয়ে গেল।" কিন্তু পরক্ষণে "জয় মা গঙ্গাদেবী বলে যেই জানুতে হাত দিয়েছে, অমনি মাণিকটা পেয়ে গেল।

মাণিক পেয়ে আবার জয় মা গঙ্গা বলে মাণিকটা জানুর মধ্যে লুকিয়ে রেখে পথ চলতে লাগল। চলে যায়, চলে যায়। এমনি করে বহুদূর এসে সে পেল একটি মাঠ। সেই মাঠে এক বুড়ী গোবর কুড়ুচ্ছে ঝুড়িতে করে। বুড়ী জাদু জানে। তার সাত বেটা ডাকাত। বুড়ী জাদুবলে জানতে পারল এই ছেলেটার কাছে সাত রাজার ধন মাণিক আছে।

বুড়ী তখন রাজপুত্র মণিমালাকে দেখে দাঁত কিটমিট করে পড়ে গেল। গোবরের ঝুড়ি হ'তে গোবরগুলো পড়ে গেল। বুড়ী হাত পা ছুড়তে লাগল। রাজপুত্র দেখল বুড়ীটা মারা যাবে, তাই সে তাড়াতাড়ি পুকুরে গিয়ে গামছা ভিজিয়ে জল এনে বুড়ীর মুখে দিল। কিন্তু বুড়ীর দাঁত খোলে না। ছেলেটি তখন ডান হাতের

আঙ্গুলগুলো বুড়ীর মুখে পুরে দিয়ে দাঁত খুলাতে গেল। বুড়ী ছেলেটার আঙ্গুলগুলো দাঁত দিয়ে চেপে ধরে থাকল। ছেলেটা আঙ্গুল ছাড়াতে পারে না। বুড়ী ভাবল, এই ভাবে ধরে থাকলে ও বাড়ী না ফিরলে তার ছেলেরা তাকে খুঁজতে আসবে। আর মাণিকটা পেয়ে যাবে তার ছেলেরা। রাজপুত্র বললে, "দেখ বুড়ী, আমি তোমার বুকে পা দিয়ে মেরে ফেলে আমার আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিতে পারি। তবে আমি তা করবো না, আমি এসেছি একটা ব্রত নিয়ে, আমি মানুষ, বিশেষ করে বুড়ী নারী মারতে চাই না। তবে একটা গল্প শোন:

এক গাঁয়ে ছিল এক ধোপা আর ধোপানী। ধোপা সকালে উঠে লোকের বাড়ী বাড়ী কাচার জন্যে ময়লা কাপড় নিয়ে আসতো, আর ধোপানী সকালে উঠে ধোবা পুকুরে কাপড় কাচতে যেতো। তাদের ছিল একটা দামাল ছেলে। ছেলেটাকে উদারার উপর একটা ছোট্ট তালাই বিছিয়ে বসিয়ে বা শুইয়ে দিত। সামনে একটা কাঁসার থালায় জল রেখে দিত, ছেলেটা কখন শুতো, কখন জল নিয়ে খেলা করতো। ছেলেটার দু'পাশে বাঁশের খুঁটিতে থাকতো এক পাশে একটা কুকুর, আর অন্য পাশে একটা বেজী। তারা ছেলেটিকে পাহারা দিত। একদিন একটা ঢেমনা সাপ খুব পিপাসিত হয়ে কোথাও পানি পায় নি। থালার উপর পানি দেখে সাপটা পানি খেতে লাগল। পিপাসা মিটে গেল, সে চলে গেল। যখন ঢেমনা সাপটা পানি খাচ্ছিল, তখন ছেলেটা সাপটার গায়ে হাত দিয়ে কিল মারছিল। ঢেমনা তাকে কিছুই বলে নি। পথিমধ্যে ঢেমনার দেখা হলো এক কেলে সাপের সঙ্গে। সে সাতদিন পানি পায় নি। ঢেমনাকে দেখে সে বললে, তোমার মুখ হেরো হয়ে আছে, তুমি নিশ্চয় পানি খেয়েছো। আমি ভাই সাতদিন পানি পাই নি। আমাকে পানির খবর দাও। ঢেমনা বললে, হাঁ বলি, তুমি শালা খল আর ধূর্ত, পানি খেতে গিয়ে সর্বনাশ করে আসবে। কেলে সাপ বললে, না ভাই কিছু বলবো না, কিছু করবো না,

খবরটা আমাকে দে।' ঢেমনা বললে, ঠিক বলছিস্ তো? কেলে বললে, হ্যাঁ। ঢেমনা তখন তাকে পানির সন্ধান দিল। কেলে পানি খেতে গেল। প্রাণভরে পানি খেল। ছেলেটা তার গায়ে হাত দিল, কিল মারল, প্রথমে কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর সে ছেলেটাকে এক ছোবল মারল ও গলি দিয়ে পালাল। এই দেখে বেজী দড়ি ছিঁড়ে সাপকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করলো, তারপর ছুটে ওষুধ আনতে বনের দিকে গেল। কুকুরটা দড়ি ছিঁড়ে একবার ধোপানীর, আর একবার বাড়ীর দিকে যায়। ধোপানী এ দেখে বাড়ীর দিকে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখল ছেলেটা মরে পড়ে আছে, বেজীটা নাই। ধোপানী ভাবল বেজী ছেলেটাকে কামড়ে মেরে দিয়েছে। তাই সে একটা ঝাঁটা নিয়ে তার ডগাটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। যেমনি বেজী এসেছে অমনি ঝাটার বাড়ী মেরে তাকে মেরে ফেলল। এমন সময় দেখল বেজীর মুখে কি লেগে আছে। দেখল গাছের শিকড়। তখন গলির মুখে দেখল একটা সাপ কাটা পড়ে আছে। তখন শিকড়টা বেটে ছেলেকে খাওয়ালো, আর ছেলে ভাল হয়ে গেল। ধোপানী তখন বেজীর জন্য কাঁদতে লাগল, হায় আমি কি করলাম!

গল্প শুনে বুড়ীটা বললে, বেজী কি দোষ করেছে, যে তাকে ধোপানী না জেনে মারল? রাজপুত্র বললে. আমি কি দোষ করেছি, যে দাঁত দিয়ে আমার আঙ্গুল ধরে রাখলে? এদিকে বুড়ী যখন কথা বলছে তখন রাজপুত্র তার আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিয়েছে। বুড়ী বললে, হ্যাঁ বাবা দোষ আমার, আমি ইচ্ছা করেই এমন করেছিলাম। যাক বাবা, তোর মঙ্গল হোক! তবে এই মাণিক নিয়ে বাড়ী ফিরতে তোমার এখনও কষ্ট হবে। তবে আমি তোমাকে কয়টা উপদেশ দিচ্ছি। এগুলো সব সময় মনে রাখবে :

(১) অতি ভক্তি দেখলেই বুঝবে বিপদ। অতি ভক্তিতে ভুলবে না।

(২) যদি কেউ কিছু খেতে দেয়, যারা খেতে দেবে তাদের সেই খাবার আগে খেতে দিয়ে শেষে খাবে ।

(৩) কোন জায়গায় বসবার আগে জায়গাটা দেখে তারপর বসবে ।

এই কথাগুলো সব সময় মনে রাখবে । তারপর মণিমালা বুড়ীর নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে বাড়ীর পথ ধরল ।

চলে যায়, চলে যায় । এমনি করে সে একদিন একরাত হেঁটে এক মাঠে গিয়ে পড়ল । মাঠের উপর দিয়ে পায়ে চলার পথ । একটু দূরে কয়েক ঘর বসতি । পথের পাশে এক বুড়ো আর এক বুড়ী বসে গরু চরাচ্ছে । একটা ষাঁড়া আর একটা গাই বা ষাঁড়ী । দুটো গরুর চেহারা খুব ভাল । এই বুড়ো-বুড়ী জাদু জানে । জাদুবলে জানল, যে যুবকটা আসছে সে রাজার ছেলে । তার নিকট একটা মাণিক আছে । মাণিক সাত রাজার ধন । যেমন করেই হোক মাণিকটা নিতে হবে । বুড়ো-বুড়ীর সাত বেটা আর রত্নমালা নামে এক বিটি । রত্নমালা খুব সুন্দরী রূপসী । তাদের বাড়ীর মধ্যে একটা ঘর আছে, সেই ঘরে আছে অকটা নীচু খাট । খাটের চার পাশে আছে চারটে গোঁজ পোঁতা । গোঁজে বাঁধা আছে চারটে মজবুত দড়ি । এই ঘরটার উদারার উপর আছে একটা কুয়ো । বুড়ো-বুড়ী জাদু জানে । পথিক দেখলেই জাদুবলে তারা বুঝতো তার নিকট কী আছে । তারপর ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যায় । রত্নমালাকে ভাল ভাবে সাজিয়ে দেখায় ; বলে তার সাথে বিয়ে দেবে । তারপর বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে নীচু খাটে শুতে দেয় । ঘুমিয়ে গেলে দঁড়ি দিয়ে বেঁধে কেটে ফেলে তারপর ফেলে দেয় কুয়োর মধ্যে । বুড়ো-বুড়ী জাদুবলে জানতে পেরে মণিমালাকে খুব আদর করতে লাগল । মণিমালা প্রথম বুড়ীর কথা মত আদর দেখে বুঝল বিপদ । কিন্তু সন্ধ্যা হয়, হয় । রাতে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে । তাই সে খুব সাবধানে বুড়ীদের সাথে তাদের বাড়ী

এলো। দেখলো রত্নমালাকে। রূপসী সুন্দরী কন্যা। বুড়ো-বুড়ী আর তার সাত বেটা বললে, তুমি রাজার ছেলে আমাদের বাড়ীতে থাক। এই সুন্দরী আমার বোন রত্নমালা। এর সঙ্গে আগামী কাল তোমার বিয়ে দিব। এই বলে মারা ঘরের দাওয়ায় কুয়োর উপর পূর্ব হ'তে যে শীতল পাটি পাড়া ছিল, তার উপর বসতে দিল। ছেলেটা প্রথম বুড়ীর কথামত বসার পূর্বে শীতল পাটিটা তুলে দেখল, আর কুয়ো দেখতে পেলো। সে অন্যস্থানে বসল। রাতে রত্নমালা তার জন্যে রুটি আনল। এই রুটিতে ঘুমের ওষুধ মিশান ছিল। মণিমালা বললে, আমাদের দেশের রীতি আমি যা খাব তার অর্ধেক সকলকে দিয়ে খাব। এই বলে সব রুটি আধখানা করে ছিঁড়ে দিতে গেল। রত্নমালা সঙ্গে সঙ্গে বললে ভুল্ হয়ে গেছে, এটা বাবার খাবার, ভুল করে আনা হয়েছে। এরপর ভাল খাবার আনা হলো। মণিমালা তা ছিঁড়ে সবাইকে দিয়ে অর্ধেকটা নিজে খেল। সাত ভাই আর বুড়ো-বুড়ী বললে, আগামী কাল তো তোমার সঙ্গে রত্নমালার বিয়ে হবে তা আজ রাতে তোমরা এক ঘরে থাক। এই বলে মারা ঘরের নীচু খাটে মণিমালাকে শুতে দিল। কিছুক্ষণ পর মণিমালা ঘুমিয়ে পড়ল। রত্নমালা তখন খাটের চারি পাশের শক্ত দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বেশ মজবুত করে মণি-মালাকে বেঁধে ফেলল। তারপর এক ধারাল খাঁড়া নিয়ে মণিমালাকে কাটতে গেল। এদিকে মণিমালার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। সে দেখল চার হাত পা দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা। তাকে কাটার জন্য রত্নমালা খাঁড়া তুলেছে। মণিমালা বললে, "রত্নমালা, আগামী কাল তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, আর এই রাতে তুমি আমাকে কাটার জন্য খাঁড়া তুলেছ, আবার আমাকে বেঁধেও রেখেছ! রত্নমালা, আমি রাজার ছেলে, তুমি আমাকে বাঁচাও। রত্নমালা বললে, "তোমার মতন অনেক রাজা আমাদের উদারার কুঁয়োতে শুয়ে আছে। তোমাকে আমি কাটবই, কি বলতে চাও তাড়াতাড়ি বল। মণিমালা বললে, আমার একটা গল্প আছে শোন, শুনে তুমি

যা করবার করবে। রত্নমালা বললে, বেশ তোমাকে গল্প বলার সময় দিলাম। গল্প শেষ হলেই তোমাকে কাটবো। মণিমালা গল্প শুরু করল :

এক দেশে ছিল এক সদাগর। তার ছিল একটা তোতা পাখী। পাখীটা মানুষের মত কথা বলতে পারতো। একদিন সদাগর বললে, আমি বাণিজ্যে যাব। যতদিন ফিরে না আসবো ততদিন এই তোতা পাখী হবে সদাগর। এই পাখী যা বলবে, তাই শুনবে। আর যখন যা কিছু করবে এই পাখীকে শুনিয়ে তা করবে। এই বলে সদাগর বাণিজ্যে চলে গেল। কিছুদিন পর পাখীটা বললে, এখন কুমড়ো, খেঁড়ো, কাঁকুড় লাগাবার সময়। জমিতে চাষ দিয়ে এই সব ফসল লাগিয়ে দাও, দক্ষিণ মাঠের কুড়ি বিঘে বাকুরীটাতে। কুড়ি বিঘে বাকুরীতে যত্ন করে খেঁড়ো কাঁকুড় ইত্যাদি লাগান হলো। জমিতে এত খেঁড়ো, কাঁকুড়, কুম্‌ড়ো হলো যে একটা হাট চলবে। তোতা বললে, কোন সব্জী তুলবে না। ফলে সব খেঁড়ো, কাঁকুড় ও কুমড়ো জমিতে পচে গেল। লোকে বলতে লাগল, পেকের বুদ্ধি। এ সব খেঁড়ো, কাঁকুড় ও কুমড়ো বেচে একটা মাহাল কেনা হতো। কিন্তু উপায় নাই, তোতা যা বলবে তাই শুনতে হবে।

তারপর পাখী কর্মচারীদের ডেকে বললে, ঐ জমিতে ভাল করে লাঙ্গল লাগিয়ে শ্যামসাড়া আখের ডগা এনে বসিয়ে দাও। জমিতে ভাল ভাবে পাট করে শ্যামসাড়া আখ লাগান হলো। জমিতে মাতব্বর আখ হলো। আখ যখন বেশ ভাল হলো আর পিড়াবার সময় কাছাকাছি হলো, তখন পাখী হুকুম দিল আখের সেচ বন্ধ করে দিতে। এরফলে আখ শুখুতে লাগল। আখ যেই আধশুকনো হলো, আর অমনি পাখী বললে, আখের জমির চার-কোণে আগুন লাগিয়ে দাও, যেন চৌরুস হয়ে আখ পোড়ে। লোকে দেখে হায় হায় করতে লাগল। বললে, যা আখ হয়েছিল, গুড় বেচলে একটা মাহাল কেনা হতো। এদিকে আখ যেই পুড়তে

লাগল, আর মিষ্টি ধোঁয়া উড়তে লাগল। সেই মিষ্টি ধোঁয়া খেতে ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালী পাখী উড়ে এলো। তার ধোঁয়া খায় আর সোনা লাদে। ধোঁয়া খেতে লাখ লাখ পাখ এলো। ছাইয়ের মধ্যে লাদা সোনা পড়ে রইল।

এরপর মণিমালা বলে আমার গায়ে মশা লাগছে, তাড়াতে পারছি না। একটা হাতের বাঁধন খুলে দাও। রত্নমালা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। দয়া দেখিয়ে সে ডান হাতের বাঁধনটা খুলে দিল। তারপর রত্নমালা মণিমালাকে শুধাল, তারপর কি হলো? মণিমালা আবার বলতে লাগল গল্প।

তোতা পাখী কর্মচারীদের বললে, ঐ জমিতে যত ছাই আছে, সব বস্তাবন্দী করে গোলা জাত্ কর। এমনি করে আখের ছাই দিয়ে সাতটা বড় বড় গোলা ভর্তি হ'য়ে গেল।

তারপর মণিমালা বললে, রত্নমালা আমার বাম হাতের বাঁধন খুলে দাও। পা দুটোতো বাঁধা আছে। রত্নমালা তখন তার বাম হাতের বাঁধন খুলে দিল। তারপর বললে, তারপর কি হলো বল। মণিমালা আবার শুরু করল:

গোলা ভর্তি হলেও দশ বস্তা ছাই উঠানে পড়ে রইল। এদিকে সদাগর নদীর ঘাটে এসেছে। গাঁয়ের লোক বলতে লাগল, আচ্ছা বুদ্ধি মশাই আপনার। একটা পাখীকে সংসারের ভার দিয়ে গেলেন। আপনার কুড়ি বিঘেতে যে খেঁড়ো, কাঁকুড় ও কুমড়ো হয়েছিল, তা বিক্রী করলে একটা মাহাল কেনা হতো। ঐ পাখীটা তুলে বিক্রি করতে দিল না সব পচিয়ে দিলে। আবার ঐ জমিতে লাগালে শ্যামসাড়া আখ। কি বলবো মশায় মাতব্বর আখ হয়েছিল। পিড়াবার আগেই পাখীটা আখের জমিতে আগুন লাগিয়ে আখগুলো পুড়িয়ে দিলে। যে আখ হয়েছিল, গুড় বিক্রী করলে একটা মাহাল কেনা হতো। যান এখন পাখীটা আপনার জন্যে সাতগোলা আর দশ বস্তা ছাই রেখে দিয়েছে।

এই বলে মণিমালা বললে, রত্নমালা আমি পালাব না। আমার

পা দুটো খুলে দাও, খুব বেদনা করছে। রত্নমালা দয়া পারবশ হ'য়ে তার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, তারপর কি হলো বল। মণিমালা আবার গল্প শুরু করলো :

এই কথা শুনে সদাগর খুব রেগে গেল। বললে বেটা তোতা, তোকে দিয়ে গেলাম রাজ্য, আর তুই আমার জন্যে ছাই রেখে দিয়েছিস্। এই বলে ছুটে বাড়ী এলো। পাখীটা বললে, বাবা কেমন আছ? সদাগর সে কথা না শুনে পাখীটাকে ধরে এক আছাড় মারল। মরবার আগে পাখীটা বলে গেল, বাবা ছাইটা ঝেড়ে দেখো। সদাগর বললে, এক বস্তা ছাই কুলো দিয়ে পাছুড়ে দেখতো। দেখলো এক বস্তা ছাইয়ের মধ্যে পাঁচ সের সোনা। তখন সে হায় পাখী, হায় পাখী করতে লাগল।

এই কথা শুনে রত্নমালা বললে, সদাগরটা বোকা, পাখীটার কথা না শুনে বোকার মত পাখীটাকে মেরে এখন কাঁদছে। মণিমালা বললে, রত্নমালা ঐ সদাগরের মত তুমিও বোকা, একদিন কাঁদবে। রূপ-যৌবন চিরদিন থাকবে না। তোমার ভাইরা তোমাকে দেখিয়ে, তোমাকে দিয়ে মানুষ মারিয়ে ধনরত্ন নিজেরা নিয়ে নিচ্ছে। তারা বিয়ে করে জীবন ভোগ করছে অথচ তোমার যৌবন দেখে ভুলেও বিয়ে দিচ্ছে না। যেদিন তুমি রূপ-যৌবন হারাবে সেদিন তোমার ভাইরা তোমাকে ত্যাগ করবে। তুমি তখন ঐ সদাগরের মত কাঁদবে, কেনে মানুষ মেরেছিলাম। কেনে রাজপুত্রকে বিবাহ করে নি। তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। আমি তিন সত্য করছি, তোমাকে বিয়ে করে রাণী করবো। এই কথা শুনে রত্নমালা বললে, এখন অনেক রাত, চল আমরা পালিয়ে যাই। আমাদের গড়ায় ষাঁড়া আর ষাঁড়ী বাঁধা আছে, ষাঁড়ীটা খুলে আনবে। একবারে ষাঁড়ী যায় ষোল ক্রোশ, আর ষাঁড়া যায় বারো ক্রোশ। রাজপুত্র বুঝতে না পেরে ষাঁড়াটা খুলে আনলে। আর তার উপর চেপে তারা বারো ক্রোশ গিয়ে এক বটতলায় থামলো।

এদিকে সাত ভাই ডাকাত ষাঁড়ীটা নিয়ে তাদের ধরে ফেললো। রত্নমালা বললে, তুমি ঐ বটগাছের নীচু ডালে বসে থাক, কোন কথা বলবে না। আমি ষাঁড়ী নিয়ে তোমার ওখানে যেই যাব আর তুমি অমনি টুক্ করে ষাঁড়ীর পিঠে চেপে পড়বে। তারপর যা করার আমি করবো। ঐ আমার দাদারা এসে গেল। রত্নমালা বললে, দাদা, ঐ লোকটা খুব বলোয়ার। রাতে দড়ি ছিঁড়ে ষাঁড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমি বহু কষ্টে ষাঁড়ার লেজ ধরে এতদূর এসেছি। তোমরা বটগাছের সাতদিক ঘিরে ধর, আমি ঐ দিকে নীচে থাকি তাহলেই ধরতে পারবো। এই বলে সাত ভাইয়ের পুঙ্গা ঠেলে বটগাছে চাপিয়ে দিলে। তারপর ষাঁড়ীটা নিয়ে নীচু ডালের নিকটে গেল। মণিমালা ঝুপ করে ঝাঁপ দিয়ে ষাঁড়ীর পিঠে চাপলো আর এক নিঃশ্বাসে ষোল ক্রোশ চলে গেল। তার সাত ভাই নেমে ষাঁড়াটা নিয়ে তাদের পিছু নিল। রত্নমালা তার মায়ের কাছে কিছু জাদুবিদ্যা শিখেছিল। জাদু বলে সে তার ভাইদের সামনে একটা নদী সৃষ্টি করল। তার ভাইরাও জাদু জানতো। তারা নদী উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। রত্নমালা তখন তার ভাইদের সামনে জাদু বলে এক বন সৃষ্টি করল। বনের সামনে পড়ে তারা কিছু বুঝতে পারলো না। এই অবসরে ষাঁড়া বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘাস খেতে লাগল। ডাকাত সাতজন সত্যিকারের বন মনে করে সেই বনে বনে রত্নমালা আর মণিমালাকে খুঁজতে লাগলো। এই অবসরে ষাঁড়ীর পিঠে চেপে চার নিঃশ্বাসে তারা চৌষট্টি ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে অন্য এক রাজ্যে পড়লো। এই রাজ্যের রাজার সঙ্গে রত্নমালার মাসীর বিয়ে হয়েছিল। রত্নমালা তার ভাবী স্বামী নিয়ে মাসীর বাড়ী ঢুকল। মাসী তাদের দু'জনার বিয়ে পড়িয়ে দিল।

রত্নমালার মা ছিল রাজার মেয়ে। নিজের খেয়ালবশত যৌবন কালে জাদুবিদ্যা শিখতে গিয়ে এক যাদুকরকে বিয়ে করে চলে এসেছিল। আর পিতৃরাজ্যে ফিরে যায় নি। রত্নমালা মা

বাবার কাছে জাদুবিদ্যা শিখে বুঝতে পারতো অনেক কিছু। সেই বিদ্যাবলে সে তার মাসীর খবর জানতে পেরেছিল। তার মাসীও জানতো যে তার দিদি এক যাদুকরকে বিয়ে করে কোথায় চলে গিয়েছে। রত্নমালার মাসী বললে, বাছা খুব কষ্ট ভোগ করেছিস্ কিছুদিন এখানে বেড়া, তারপর জামাইকে নিয়ে নিজের দেশে যাবি। জামাইকে ডেকে বললে বাবা, এই রাজ্যের রাজা আমার স্বামী। আমি এই রাজ্যের রাণী। তুমি যেখানে খুশী বেড়াও কিন্তু দক্ষিণদিকে যাবেনা। ঐ দিকটায় কিছু কিছু খারাপ ঠগ্ ও গুণ্ডারা থাকে। মণিমালা বললে, বেশ মাসী তাই হবে।

মণিমালা বিভিন্নস্থানে বেড়িয়ে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন তার খেয়াল হলো মাসী দক্ষিণদিকটা বারণ করল কেনে। নিশ্চয় কিছু আছে ঐ দিকে, তাছাড়া সবাইতো মানুষ! দেখিই না কি হয়। এই কথা ভেবে একদিন মণিমালা দক্ষিণ দিক ধরে বেড়াতে গেল। গোটা পাড়াটা ঘুরল। ঐ পাড়ায় বাস করতো ঠগা বেনে। বেটা খুব ঠগ। কারো কোন ভাল জিনিস পেলেই ঠকিয়ে নিতে ওস্তাদ। ঠগা বেনে মণিমালাকে দেখে বুঝল ওর নিকট বেশ ভাল মাল আছে। ডেকে এনে তার দোকানে বসাল। ঠগা বেনের দোকানে চাল, ডাল, মশলা সবকিছু পাওয়া যায়। কেনার সময় মাল ঝুঁকিয়ে কেনে, পয়সা দেয় কম। বিক্রি করার সময় ওজনে কম দিয়ে বেশী পয়সা নেয়। ঠগা বেনের সঙ্গে মণিমালার খুব ভাব হয়ে গেল। রোজ একবার মণিমালা ঠগাবেনের দোকানে যাবেই। এই ঠগাবেনের কাছে দুইটি তামার মাণিক ছিল। দেখতে ঠিক আসল মত। একদিন ঠগাবেনে তামার মাণিক দুটো মণিমালাকে দিয়ে বললে, বন্ধু তুমি এই মাণিক দুটো রাখ। মণিমালা মাণিক দুটো নিয়ে বেনের খুব তারিফ করতে লাগল। তারপর জয় মা গঙ্গা বলে নিজের মাণিকটা বার করলো, করে বললে দেখ বন্ধু, আমারও একটা মাণিক আছে। এই বলে ঠগাবেনের হাতে মাণিক তিনটে দিয়ে দিল। ঠগাবেনে কৌশলে ভাল মাণিকটা লুকিয়ে রেখে

একটা তামার মাণিক মণিমালাকে দিল। পথে আসতে আসতে মণিমালা যেই জয় মা গঙ্গা বলে মাণিকটা জানুর মধ্যে রাখতে গেল, তা জানুর মধ্যে ঢুকল না। তখন মণিমালা বুঝল ঠগাবেনে নিশ্চয় তার আসল মাণিকটা লুকিয়ে এই নকল মাণিকটা দিয়েছে। রাজপুত্র আবার ঠগাবেনের নিকট গেল। ঠগাবেনে বল্‌লে, ভাই তোমার মাণিক তো আমি নিই নাই, এই বলে মুখেমুখে উড়িয়ে দিল। মণিমালার মাথা গেল খারাপ হয়ে। রাত হয়ে গেছে মণিমালা ফেরে নাই, দেখে রত্নমালা তার খোঁজে গেল। রত্নমালাকে দেখে মণিমালা বললে, ওগো আমার মাণিকটা দেখ নাই? রত্নমালা বুঝল, ঠগাবেনে তার মাণিকটা কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে। মণিমালাকে নিয়ে রত্নমালা মাসীর বাড়ী ফিরে এলো। মাসী সব শুনে ভাবতে লাগল কী করা যায়। কারণ কোনতো প্রমাণ নাই। রত্নমালার মাসীর দুইটি দাসী ছিলো। তারা দুই বোন। নাম পারী, আর লারী। মাসী পারী আর লারীকে সব কিছু বলে জিজ্ঞাসা করল মাণিকটা উদ্ধার করতে পারবে কিনা? পারী-লারী বললে, নিশ্চয় পারবো; রাণী মা তুমি কিছু চিন্তা করো না। তারপর সেদিন সন্ধ্যায় তারা কাঁদরের গাবায় শ্মশানে গেল। সেইদিন ডোম পাড়ার একটা বৌ-এর ছ'মাসের একটা কন্যা মারা গিয়েছিল। তাকে শ্মশানের গাবায় পুঁতে দিয়েছিল ডোমেরা। পারী আর লারী সেই মেয়েটাকে তুলে এনে বেশ করে ধুয়ে তেল, কাজল মাখাল, তারপর সকাল বেলায় মরা মেয়ে কোলে করে নিয়ে ঠগাবেনের দোকানে গেল। তারা বললে, ঠগা তেল, নুন, ডাল সব ভাল করে মেপে দে। ঠগা সব মাল কম দিতে লাগল। পালিতে করে তেল মাপতে গিয়ে তাও কম দিল। পারী-লারী বললে, ঠগা সব কম দিল। এই বলে ঝগড়া শুরু করল। তারপর ঝগড়া করতে করতে কোল হ'তে মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে পোট পা দিল, আর মেয়েটার পেট ফেটে গেল। পারী আর লারী কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো ঠগাবেনে আমার মেয়েকে মেরে দিয়েছে!

ঠগা দেখলে মহা মুশকিল। সে তখন পারী আর লারীকে বললে, তোদের অনেক টাকাকড়ি দিচ্ছি। রাজ দরবারে যাস্‌না। পারী-লারী বললে, এক শর্তে রাজ দরবারে যাব না, তা'হলো তোর কাছে একটা মাণিক আছে সেইটাকে যদি দিস, তবে রাজ দরবারে যাব না। ঠগা তখন বললেঃ না, আমার কাছে মাণিক নাই। পারী আর লারী তখন রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল যে, ঠগা তাদের মাল কম দিচ্ছিল, তাই বলতে গেলেই পারীর মেয়েটাকে পেটে পা দিয়ে মেরে দিয়েছে। তারপর বলছে রাজ দরবাবে বলিস না, তোকে একটা মাণিক দেব। এখন মাণিক দিচ্ছে না।

রাজা তখন ঠগা বেনেকে ডাকলো আর পারীর মেয়ের ক্ষতি-পূরণ করার জন্য মাণিক দিতে বলল্। ঠগা বললে, আমার কাছে মাণিক নাই। পারী বললে, গত সন্ধ্যায় আপনাদের জামাই-এর নিকট হ'তে তামার মাণিক দিয়ে আসল মাণিকটা ঠকিয়ে নিয়েছে। তখন বাজার হুকুমে করাত আনতে হলো, আর ঠগা-বেনের দেহকে একটা পোঁতা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে মাথার উপর দিয়ে করাত চালিয়ে তু'ভাগ করতে বলা হলো। একবার যেই করাত চালিয়েছে, অমনি ঠগা বললে, আমার নিকট মাণিক আছে, আমি দিচ্ছি। এই বলে সে মাণিক ফেরৎ দিল।

মণিমালা মাণিক আর রত্নমালাকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল। পথে তাদের বার বৎসর কেটে গিয়েছিল। দেখলো মা, বাবা ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ আর বুড়ো হয়ে গেছে। শিক্ষক মহাশয় বুড়ো হয়ে গেছে। সব শুনে শিক্ষক বললেন, বাবা এই মাণিক নিয়ে এত কাণ্ড, তখন এই মাণিক আমার দরকার নাই। মণিমালা কিন্তু মাণিকটা তার গুরুর হাতে দিল। গুরু সেই মাণিকটা মণিমালা আর রত্নমালার হাতে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করল। তারপর মণিমালা হলো রাজা। আর রত্নমালা হলো রাণী।

ঃ শব্দটীকা ঃ

১) নানা — মায়ের বাবাকে নানা বলে। সম্বোধন করে বাংলার মুসলমানেরা। — দাদামশায়। মায়ের বাবাকে নানা বলে থাকে রাজস্থানীরা] গল্পটি মুসলিম গ্রাম্যচাষীর মুখে শোনা, সেই হেতু তিনি নানা শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

২) ছোঁ মারা — চিল জাতীয় শিকারী পাখীরা কোন দ্রব্যের উপর লক্ষ্য স্থির করে আকাশ হ'তে নীচের দিকে নেমে লক্ষ্য দ্রব্যটি পায়ের নখে করে তুলে নিয়ে দ্রুত উড়ে যায়।

৩) ছেঁচা — জল মারা।

৪) দাঁত কিটমিট — দাঁত কপাটি।

৫) উছারা — বারান্দা। মুসলিম মেয়েরা বারান্দাকে উছারা বলে।

৬) ঢেমনা — বিষহীন একপ্রকার বড় সাপ।

৭) কেলে — কেউটে সাপকে কেলে সাপ বলে স্থান বিশেষে।

৮) ষাঁড়া — ষণ্ড। বৃষ।

৯) ষাঁড়ী — গাভী।

১০) গোঁজ — কাঠের বা বাঁশের দণ্ড। গরু, মহিষ ইত্যাদি বাঁধার জন্য মাটিতে পোঁতা হয়।

১১) বাঁকুড়ী — বড় জমিকে গ্রাম বাংলায় বাঁকুড়ী বলা হয়।

১২) শ্যামসাড়া — ইক্ষু বিশেষ।

১৩) মতবর — ভাল ফসল হলে বলা হয়, মতবর ধান, মতবর গম ইত্যাদি।

১৪) গড়া — গরু, মহিষ বাঁধার স্থান।

১৫) বলোয়ার — বলবান।

১৬) কোশ — ক্রোশ। দু' মাইলে এক ক্রোশ।

১৭) কাঁদর — বড় নালা। যা নদীর মত মাঠ হ'তে প্রবাহিত হয়ে এসে নদীতে বা বিলে পতিত হয়।

১৮) গারা — নদী, পুকুর, কাঁদর ইত্যাদির তলদেশকে গারা বলা হয়। শব্দটা গর্ত শব্দাগত গর্ভ > গরভ > গারভা > গারবা > গারা।

—০—

[বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার পালিটা গ্রাম পঞ্চায়েত ভুক্ত কাঁটাড়ী গ্রাম নিবাসী জনাব শেখ বাঁকা খাঁয়ের নিকট হ'তে গল্পটি সংগৃহীত। তিনি মঙ্গলকোট থানার (জেলা-বর্ধমান) আইমা পাড়া গ্রামে গল্পটি শুনেছিলেন। গল্পটির অংশবিশেষ লেটো গানে অভিনীত হয়েছিল বলে জনাব খাঁ জানিয়েছেন সংগ্রাহককে।]

।। সখীসোনা ।।

একদেশে ছিল এক রাজা। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র নিয়ে রাজার দরবার জমজমাট। কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই। উজিরের মনেও সুখ নাই। দু'জনারই নাই সন্তান। রাজবাড়ীতে ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনী অনেক ভোরে এসে ঝাঁট দিয়ে চলে যায়, পাছে আঁটকুড়ো রাজা-রাণীর মুখ দেখতে হয় এই ভয়ে। এইভাবে দিন যায়। একদিন উজির রাজাকে বলল, 'মহারাজ আমি কি আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পাতাতে পারি ?' রাজা বলল, 'নিশ্চয় পারো। কি সম্পর্ক বল ?' উজির বলল, 'মহারাজ আমার যদি মেয়ে হয় তাহলে বিয়ে দিতে চাই।' ছেলে হওয়ার কথা শুনে রাজা খুশী হলো। আর বলল, 'হ্যাঁ উজিব, তোমার মেয়ে আর ছেলে হলে বিয়ে দিব।' তারপর উজির বলল, 'মহারাজ যদি আপনার মেয়ে

হয় আর আপনার যদি ছেলে হয় তা'হলে বিয়ে দিতে চাই।' ছেলে হওয়ার কথা শুনে রাজা খুশী হলো। আর বলল, 'হ্যাঁ উজির, তোমার মেয়ে আর আমার ছেলে হলে বিয়ে দিব।' তারপর উজির বলল, 'মহারাজ যদি আপনার মেয়ে হয়, আর আমার ছেলে হয়, তাহলে কি হবে?' রাজা বলল, তাহলেও বিয়ে দিব। এই কথা বলে তিন বার তিন সত্য করল দুই জনে। তারপর দিন যায়। কিছুদিন পর উজিরের ঘরে হলো সুন্দর একটি ছেলে। তার কিছুদিন বাদ রাজার ঘরে হলো এক মেয়ে। রাজা আদর ক'রে মেয়ের নাম রাখল "সখীসোনা"। উজির তার ছেলের নাম রাখল 'সোনা'। সখীসোনা আর সোনা মানুষ হয়, আর একসাথে পাঠশালা যায়। উজির রাজাকে তিন সত্যের কথা বলে না। রাজা মনে মনে ভাবে বেটা উজির ভয়ে আর বিয়ের কথা বলতে পারবে না। এভাবে দিন যায়।

এখন সখীসোনা আর সোনা বেশ একটু বড় হয়েছে। চলছে তাদের বয়সের সন্ধিক্ষণ। কৈশোর পার হয়ে যুবক-যুবতী হ'তে চলেছে তারা। একদিন সখীসোনা তার ছাতাটা পাঠশালে ফেলে এসেছে। অর্ধপথে মনে পড়ল, ও সোনাকে বলল, সোনা এক ছুটে পাঠশালা হ'তে ছাতাটা এনে দিল। তারপর কয়দিন বাদ একটা বই ফেলে এলো সখীসোনা। সোনা আবার তা এনে দিল। কিছুদিন বাদ আবার খাতা ফেলে এলো সখীসোনা। মাঝপথে বলল; সোনাকে। সোনা বলল, আমি তো তোমার চাকর নই যে, রোজ রোজ তুমি বই, খাতা, ছাতা ফেলে আসবে, আর আমি এনে দেব। আজ এনে দিলাম। অন্যদিন আর আনবো না। এই কথা শুনে রাজার মেয়ে সখীসোনার মনে খুব রাগ হলো। সে বলল, আমি রাজার মেয়ে, আর ঐ নাজিরের ছেলে বলে কিনা আমি তোমার চাকর নই। এইসব কথা চিন্তা ভাবনা করতে করতে সখীসোনা গোঁসাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। রাজার আদরের মেয়ে, দাসীবাঁদীরা এই দেখে রাজাকে খবর দিল। রাজা

এসে মেয়েকে বলল, দরজা খোল, তুমি যা চাও তা আমি করব। সখীসোনা তখন উজিরের পুত্রের কথা বলল, মা তুমি কিছুদিন সবুর কর। আগে তোমার বিয়ে দিই, তারপর ঐ উজির পুত্রকে কেটে তার রক্তে তোমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিব। রাজকন্যা বলে, এখন কেন হবে না। রাজা তখন উজিরের সঙ্গে সেই তিন সত্যের কথা বলল। তারপর বলল, আগে তোমার বিয়ে দিই, তখন আর লোকে কোন কথা বলতে পারবে না। এই কথা শুনে সখীসোনা চলে গেল ও স্বাভাবিক হলো। মনে মনে ভাবল, সোনার সঙ্গে তা'হলে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এরপর সখীসোনা পাঠশালে কিছু ফেলে আসতো না। উজিরের ছেলের বই পত্র সব কিছু সখীসোনা কিনে দিল। আর আলাদা পড়ার ব্যবস্থাও সে করল। এমনি করে দিন যায়।

এদিকে রাজা সখীসোনার বিয়ে ঠিক করতে লাগল। উজিরকে কোন কথা না জানিয়ে রাজা নাজিরকে ডাকল। রাজা নাজিরকে বলল, নাজির তুমি কো-কাফ শহরে যাও। সেই রাজার একটি ভাল ছেলে আছে, সেই ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ে সখীসোনার বিয়ের ঠিক কর। তবে এই বিয়ের খবর যেন উজির জানতে না পারে। নাজির কো-কাফ শহরে গিয়ে সেখানের রাজার ছেলের সঙ্গে সখীসোনার বিয়ের ঠিক করে এলো। বিয়ের একটা দিনও ঠিক হলো, উজিরকে এ খবর জানান হলো না। বিয়ের কয়দিন আগে সখীরা সোনাকে হলুদ মাখাতে চাইল। সখীসোনা বলল, হলুদ মাখবো না। সখীসোনা অন্তরালে উজিরের ছেলে সোনাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, আগামী কাল সন্ধ্যায় একটা ভাল ঘোড়া নিয়ে মাঠে অপেক্ষা করবে। পরে আমি ঘোড়া নিয়ে হাজির হবো। সেদিন সকালে পিতলের বড় বড় হাঁড়ি, ডেগ্‌চি বার করছে রাজার লোকেরা। উজির শুধাল, এসব কি হবে? নাজির বলল, রাজা তার মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করবেন। তাই এসব আনা হচ্ছে। সন্ধ্যা হলে উজিরের ছেলে সোনা একটা ঘোড়া

নিয়ে রাজবাড়ীর কিছু দূরে মাঠে, পথের পাশে এক বুড়ো বটতলায় অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে রাজকন্যা সোনাদানা, হীরা-জহরত, গজমতি হার প্রভৃতি নিয়ে ঘোড়াশালে গিয়ে একটা ভাল ঘোড়া নিয়ে আসতে দেরী করে ফেলল। এই দেখে উজিরের ছেলে ভাবল, রাজার মেয়ে বোধ হয় আর আসবে না। তাই সে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে দেখল সখীসোনা আসছে। তখন সে ঘোড়া ছুটিয়ে সখীসোনার কাছে এলো। সখীসোনা তাকে বলল, "তুমি আসতে দেরী করলে? তোমাকে আমি আগে আসতে বলেছি। উজির পুত্র বলল, "আমি অনেক আগেই এসেছি, তোমার দেরী দেখে ফিরে যাচ্ছিলাম।" সখীসোনা বলল, "কে তোমার সাক্ষী?" উজির পুত্র বলল, "এই বৃদ্ধ বটবৃক্ষ আমার সাক্ষী।" এই বলে উজির পুত্র বৃদ্ধ বটবৃক্ষকে বলল ঃ

ঃ গান ঃ

ওগো বটবৃক্ষ সত্যের সাক্ষী দাও।
কেবা আগে এসেছিল, তুমি ওগো জানাও ॥

সখীসোনা ঃ সত্যের সাক্ষী দাও গো, বৃক্ষ
সত্যের সাক্ষী দাও।
মাথা কেটে দিব তোমার যদি না
সত্যের সাক্ষী দাও।

বটবৃক্ষ : আমি সত্য বটবৃক্ষ, সত্য সাক্ষী দিব
আগে এসেছে উজির পুত্র, এই না সাক্ষী দিব
পরে এসেছে সখীসোনা, আমার শাখাতলে
সত্য সাক্ষী দিল বৃক্ষ এই না কথা বলে।

বটবৃক্ষের নিকট সত্য সাক্ষী নিয়ে দু'জনে পাশাপাশি চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে তারা দেখলো, সামনে এগিয়ে আসছে অসংখ্য আলো, সঙ্গে রোশনচৌকির বাজনা। ঘোড়ার উপর ভাল ভাল পোশাক পরে অনেক রাজপুরুষ। আর হাতীর হাওদার উপর

সুসজ্জিত বরবেশে এক রাজপুত্র। উজিরের ছেলে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তারা পরিচয় দিল, ‘ তারা কো-কাফ শহর হ'তে আসছে।’ এদেশের রাজার মেয়ের সঙ্গে কো-কাফ শহরের রাজার ছেলের বিয়ে হবে। সখীসোনা ও উজির পুত্র বাওর কেটে দাঁড়াল। বিয়ে চ'লে গেল। কিছুদূর যাবার পর দেখছে, এক বুড়ো ব্রাহ্মণ পাঁজি পুঁথি নিয়ে হুটুরতে হুটুরতে আসছে। সখীসোনা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। বৃদ্ধ পরিচয় দিল, সে ভাট্ ব্রাহ্মণ। রাজার মেয়ের বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাবে, তাই সে রাজবাড়ী যাচ্ছে। সখীসোনা বলল, “তুমি আমাদের দু'জনের বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাও, তোমাকে অনেক টাকা দিব।”, ব্রাহ্মণ দেখল মাঝপথে যদি কিছু টাকা পাই তো ভালই। অনেক টাকার বিনিময়ে সে উজির পুত্র ও সখীসোনার বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাল। এই ব্রাহ্মণ ছিল জ্যোতিষী। সে দেখলো এদের সামনে অনেক বিপদ। বলল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের ভাগ্য গণনা করে দেখি। গণনা করে দেখল, তাদের জন্য অনেক বিপদ অপেক্ষা করছে। ব্রাহ্মণ তখন উজির পুত্র ও সখীসোনাকে কয়েকটি উপদেশ দিল ঃ

(ক) অতি ভক্তি যে দেখাবে, তাকে বিশ্বাস করবে না।

(খ) অতি ভক্তিতে, কেহ যদি কিছু দেয় খাবে না।

(গ) রণের শেষ রাখবে না।

(ঘ) কোন শহরের পশ্চিম পাড়ায় যাবে না।

এই উপদেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ চলে গেল। সখীসোনা ও সোনা অজানা পথে যাত্রা করল।

এদিকে কো-কাফ শহরের বর এসে হাজির হলো। বিয়ের সময় সখীসোনাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রাজা তখন নাজিরের কন্যাকে চুপি চুপি রাজবাড়ীতে এনে, তাকে রাজকন্যা সাজিয়ে বিবাহ দিল। রাজার সম্মান রক্ষা হলো। সখীসোনা সোনার সঙ্গে এসে হাজির হলো এক দরিয়ার ধারে। উজিরপুত্র সোনা তখন ক্লান্ত। সখীসোনাকে সোনা বলল, রাজকন্যা তুমি একটু বস

আমি তোমার জানুতে মাথা দিয়ে একটু ঘুমাব। রাজকন্যা সখীসোনা মনে মনে বলল, আমি রাজার মেয়ে। পিতার সত্য রক্ষার জন্য বিয়ে করে বিবাগী হলাম। আমার স্বামী নিদ্রা যেতে চায়। কোথায় রাজবাড়ী? কোথায় রাজ বিছানা? এই বলে সে একটা ভাল শাড়ী বিছিয়ে দিল। আর সোনা তার জানুতে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সখীসোনা বলল, আকাশ হোক আমাদের বাসরের চাঁদোয়া, আর ধরণী হোক বিছানা। কিছুক্ষণ পর একটা গাভী দরিয়া পেরিয়ে একটা দ্বীপে চরাট করতে গেল। তার বাছুরটি এলো একটু পরে। বাছুরটি দরিয়া পার হয়ে যেতে পারে না। হাম্বা হাম্বা করতে লাগল। মা-ও দ্বীপ হতে হাম্বা হাম্বা করতে লাগল। এই দেখে সখীসোনার মাকে মনে পড়ল। সখীসোনা তখন মনের দুঃখে বলল -

ঃ গান ঃ

দরিয়া পারে বাছার লাগি
গাভী হাম্বা হাম্বা করে
মা আমার কাঁদে দরদালানে
সখীসোনা নাই ঘরে---
রাজার কুমারী আমি
ধূলায় পেতেছি বাসর
আকাশ চাঁদোয়া, ধূলায় বিছানা
কোথায় দালান ঘর।

এই বলে চোখ দিয়ে তার জল এলো। এই জল পড়ল স্বামীর মুখে। স্বামীর ঘুম গেল ভেঙে। জেগে উঠে সোনা বলে সখীসোনা তুমি কাঁদছ কেন? সখীসোনা বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তোমার কষ্ট দেখে কাঁদছিলাম। সোনা বলল, কষ্টকে আমি কষ্ট মনে করি না। তুমি চোখের জল মুছে ফেল।

দরিয়ার ওপারে ছিল সাত চোরের রাজ্য। সাত চোর খুব সেয়ানা। তাদের মধ্যে বড়টা একটু কুঁজো। সে ছয় ভাই-এর

ভাত জলখাবার বহন করে। বাড়ীতে থাকে বুড়ী মা। সেও খুব দুষ্ট। কিন্তু উপরে ভাল ভাব দেখায়। আর আছে একটা বোন। বোনটা খুব ভাল। সে চুরি ডাকাতি ও তার মায়ের কাজ কাম পছন্দ করে না। সখীসোনা ও সোনা দরিয়া পার হয়ে সাত চোরের রাজ্যে এলো। তখন চোরেরা ছিল না। ছিল তার মা। সোনা ও সখীসোনাকে দেখে খুব আদর করতে লাগল। আদর দেখে সখীসোনা বুঝল খারাপ জায়গায় এসেছি। কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুইজনে ক্ষুধার্ত। সখীসোনা ঘোড়ার পিঠের মাল নামাতে লাগল। এদিকে চোরদের বাড়ীতে উঠানের সমানে সমানে ছিল একটা ইন্দারা। তার পাশে একটা আমের গাছ। চোরের মা বুড়ী করল কি, একটা ভাল শীতলপাটি এনে বিছিয়ে দিল ইন্দারার উপর। তারপর আদর ভক্তি দেখিয়ে সোনাকে নিয়ে গেল, আর বলল, বাবা এই গাছের ছায়ায় বস আমি সরবৎ করে আনি। উজির পুত্র যেমনি বসতে গিয়েছে অমনি রাজকন্যার মনে পড়ে গেছে ব্রাহ্মণের উপদেশ। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর হাত ধরে মেরেছে টান। তার শীতলপাটি সরিয়ে দেখে ইন্দারা। সোনা দেখে ভয় পেয়ে গেল। বুড়ীর দেওয়া সরবৎ সে আর খেল না। সখীসোনা মুদীর দোকান হতে চাল ডাল কিনে গাছতলায় চুলো কেটে রান্না করতে বসল। বুড়ী দিল একটা পোড়া হাঁড়ী আর ভিজে কাঠ। ইতিপূর্বে সখীসোনা যখন চাল ডাল কিনতে গেল, তখন সোনাকে বলে, বুড়া কিছু দিলে সে যেন না খায়। সখীসোনা যেতেই বুড়ী ভুজোতে বিষ মাখিয়ে এনে সোনাকে আদর করে খেতে দিল। সোনা কিছুতেই খেল না। তার সেই ব্রাহ্মণের উপদেশ মনে পড়ে গেল। যাইহোক ভিজে কাঠে ভাত হয় না।

: গান :

সোনা : কি ভাত ও রাঁধিছ কন্যা,
কি ভাত রাঁধ তুমি
তিনদিন অনাহারে আছি,
ক্ষুধায় মরি আমি।

সখীসোনা ঃ পোড়াহাঁড়ী দিয়েছে বুড়ী
আর দিয়েছে ভিজে কাঠ
আগুন জ্বলে না, চালও ফোটে না
কি করিব আজ।

এই দেখে সাত চোরের বোন সখীসোনার কাছে এসে বলল, তোমাদের কাঠ জ্বলবে না। এই বুড়ী সাত চোরের মা। ভিজে কাঠ দিয়ে তোমাদের আটকে রেখেছে। তারা এসে তোমার স্বামীকে মেরে তোমাকে বিয়ে করবে ও যা আছে নিয়ে নেবে। তুমি এক কাজ কর। মুদির দোকান হতে এক সের ঘি আর একটা মোটা কাপড় কিনে আন। কাপড়টাকে ঘিয়ে ভিজিয়ে উনোনে ফেলে দাও। আগুন জ্বলবে। ভাত রান্না করে খেয়ে পালাও। রাজকন্যা তাই করল। ভাত রান্না হলো। এক থালা ভাত তারা বুড়ীকে দিল। সোনা ও সখীসোনা যেই ঘোড়ায় চেপেছে অমনি বুড়ী ভাত কটা উঠানে ছিটিয়ে দিয়ে সখীসোনাকে গালাগালি দিতে লাগল। সখীসোনা উঠান পরিষ্কার করে দিয়ে ঘোড়া ছুটাল। কিছুক্ষণ পর সাত চোর এসে হাজির। বুড়ী বলল, আর বাবা কোথায় ছিলি? তোদের বাড়ীতে যে ধনরত্ন এসেছিল, তা পেলে আর চুরি করতে হতো না। ছয় চোর বিশ্রাম না নিয়ে ছুটল। আর বড় ওই কুঁজোকে খাবার আনতে বলল। কিছু দূর এসে তারা সখীসোনা ও সোনাকে ঘিরে ফেলল। সখীসোনা সোনাকে যুদ্ধ করতে বারন করল এবং দুটি ঘোড়া পাশাপাশি লাগাল। তারপর ছয়টি হীরা গলার হার হতে খুলে তাদের দিকে ছুড়ে দিল। যেই তারা নীচু হয়ে কুড়োতে গেছে, অমনি দু'জনে তাদের কেটে ফেলল। তারপর দেখে বড় ভাই কুঁজো আবার খাবার নিয়ে আসছে। সখীসোনা বলল এর গর্দ্দান নাও। কুঁজো ভয়ে কাঁদতে লাগল। সে বলল, হুজুর ওদের মেরেছেন ঠিক করেছেন। আমি কুঁজো আমাকে খুব খাটাতো। আমি হুজুর আপনাদের ঘোড়ার ঘাস কাটবো। সোনা বলল, ও কুঁজো ওকে আর মেরে কাজ নেই।

ঘোড়া দুটোর ঘাস পানি করবে। সখীসোনা বলল বেশ তাই হোক। এই বলে তারা চলতে লাগল। চোরেদের রাজ্যের শেষে এক বনের পাশে তারা পৌঁছাল। নিকটস্থ শহর হতে খাবার টাবার এনে তারা খেল। সখীসোনা বলল আমার শরীর খুব ক্লান্ত। আমি একটু ঘুমাই, তুমি জেগে থাক। মোটে ঘুমাবে না বা উঠে একাকী কোথাও যাবে না। আমাকে জাগিয়ে তারপর যাবে। সখীসোনা কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল। খাওয়ার পর সোনার খুব পায়খানা চেপেছে। সে কুঁজোকে রেখে জলার ধারে পায়খানা ফিরতে গেল। এমন সময় সোনার তলোয়ার নিয়ে কুঁজো গিয়ে হাজির। সোনা বলল, কুঁজো এখানে কেন? কুঁজো বলল, হুজুর! আপনি পায়খানা ফিরবেন, আর বন হতে যদি বাঘ আসে তখন কি হবে? তাই হুজুর! আমি তলোয়ার নিয়ে পাহারা দিই, আর আপনি আরাম করে পায়খানা ফিরুন। সোনা বলল, 'দে বেটা পাহারা দে'। এই বলে সোনা যেই ঘাড় নীচু করে পায়খানা ফিরতে বসেছে অমনি কুঁজো তার ঘাড়ে মেরেছে এক কোপ। দেহ হতে মাথা গেছে ছিটকে। রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে কুঁজো উল্লাসে চিৎকার করছে ও লাফাচ্ছে। কুঁজোর লাফানি ও চীৎকারে সখীসোনার ঘুম ভেঙে গেছে। কুঁজো লাফাচ্ছে কেন? তাহলে কিছু গোলমাল হয়েছে। সখীসোনা সব শুনে কুঁজোকে বলল, "ওকে মেরে তুমি ভাল কাজই করেছ। ওটা ছিল একটা অপদার্থ। চল তোমার সঙ্গে যাব! তোমাদের বাড়াটা আমার ভালই লেগেছিল। তবে ওর জন্য থাকতে পারি নি।" কুঁজো বলল, "তাই নাকি"। বেশ চল। সখীসোনা বলল, তোমার সঙ্গে কয়টা কথা। তোমাকে আমার বামে থাকতে হবে। কোন দ্রব্য পড়ে গেলে কুড়িয়ে দিতে হবে। তোমার তলোয়ার আমার কাছে রাখতে হবে। মনের আনন্দে কুঁজো বলল, বেশ তাই হবে। দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগল। কুঁজোর অজান্তে সখীসোনা তার হাতের মূল্যবান আংটিটি নীচে ফেলে দিয়ে বলল, আমার

হীরের আংটিটা পড়ে গেল কুড়িয়ে দাও। যেমনি নীচু হয়ে আংটি কুড়োতে গেছে আর অমনি তার ঘাড়ে এক কোপ! কুঁজো মরে গেল। তারপর সখীসোনা ফিরে এসে সোনাকে ধুয়ে মুছে সামনে রেখে তিনদিন তিন রাত কাঁদতে লাগল। তৃতীয় দিন রাতে শিবদুর্গা সেই বন দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। দুর্গা বলল, দেখ কে কাঁদে। শিব বলল, কার কে মরেছে সে কাঁদছে। চল চলে যাই। দেবী বলল, না এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তখন শিব প্রথমে বাঘের ছদ্মবেশে এসে বলল :

বাঘ : তিনদিন অনাহারী কন্যা
দাও গো বাসি মড়া
সখীসোনা : শুন শুন বনের বাঘ,
আমাকে আগে খাও
তারপর খেয়ো তুমি তিনদিনের
বাসি মড়া।

তারপর ভালুকের ছদ্মবেশে এলো শিব—

ভালুক : তিনদিন অনাহারী কন্যা
দাও গো বাসি মড়া
সখীসোনা : শুন শুন বনের ভালুক
আমাকে আগে খাও
তারপর খেয়ো তুমি তিনদিনের
বাসি মড়া।

তারপর সিংহের ছদ্মবেশে এলো শিব—

সিংহ : তিনদিনের অনাহারী কন্যা
দাও গো বাসি মরা
সখীসোনা : শুন শুন বনের সিংহ
আমাকে আগে খাও
তারপর খেয়ো তুমি
তিনদিনের বাসি মড়া।

ছদ্মবেশ ছেড়ে বুড়ো সাধুর বেশে এসে শিব সখীসোনাকে একটা তামার ঘটি দিয়ে বলল ঐ পুকুরের আঘাটা হতে এক ঘটি জল আন। সখীসোনা তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল এনে দিল। ছদ্মবেশী শিব তখন মন্ত্র পড়ে সেই জল সোনার গায়ে ছিটিয়ে দিল। আড়ি-মুড়ি ছেড়ে সোনা জেগে উঠল। সখীসোনা দেখে সাধু নাই। শিবদুর্গা সেখান হতে চলে গেল। সোনাকে সখীসোনা সব বলল। সোনা বলল, শালা কুঁজো কই? সখীসোনা বলল, তাকে মেরে ফেলেছি। সোনা গিয়ে কুঁজোর মুখে লাথি মারল। তারপর সেখান হতে ডেরা তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগল। দুপুরে তারা এক রাজার নগরের ধারে এসে পৌঁছাল।

আম, জাম, নিম, বটগাছে ঘেরা এক দীঘির পাড়ে আস্তানা গাড়ল তারা। সখীসোনা সোনাকে একটা সোনার টাকা দিয়ে বলল, এটা ভাঙ্গিয়ে চাল ডাল নিয়ে এসো। রান্না করে খেতে হবে। সোনা স্বর্ণকারের দোকানে টাকা ভাঙ্গিয়ে চাল ডাল ইত্যাদি কিনে আনতে লাগল। নগরের পশ্চিমে একটা বাড়ীতে ধোঁয়া উঠতে দেখে সোনা ভাবল, একটু আগুন নিয়ে যাই। ব্রাহ্মণের বারণ ছিল পশ্চিম পাড়ায় যাবে না, সেটা সে ভুলে গেল। ধোঁয়া উঠা বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখল, একটা বুড়ী চরকায় সুতো কাটছে। উঠানে ঘসির আগুন জ্বলছে। তা হতে ধোঁয়া উঠছে। পাশে একটা গোয়ালে অনেকগুলো ছাগলের পাঁঠা বাঁধা আছে। সোনা বুড়ীর নিকট আগুন চাইল। বুড়ী বলল, ভিতরে এসো বাবা। সোনা বাড়ীর ভিতরে উঠানে গিয়েছে, অমনি বুড়া এসে একটা ঘসির আগুন ডান হাতে তুলে দিতে গিয়ে বাম হাতে সোনার গালে মারল চাপড়। সোনা একটা ছাগলের পাঁঠা হয়ে গেল! বুড়ী তাকে গোয়ালে ভরে দিল। সখীসোনা উনুন কেটে জালট্ নিয়ে বসে আছে। স্বামী আর আসে না। এমনি করে সন্ধ্যা নামল। সখীসোনা বুঝল ঠিক আবার বিপদ ঘটিয়েছে।

পরদিন সখীসোনা পুরুষের বেশ ধরে একটা ঘোড়ায় চড়ে অন্যটার লাগাম ধরে চলেছে। সে দেশের রাজার মেয়ে, তার রূপ-লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কন্যা গিয়ে গোঁসা ঘরে দরজা লাগাল। রাজা সব শুনে রাজপুত্র বেশী সখীসোনাকে নিয়ে এলো। বিদেশী রাজকুমারকে দেখে কন্যা মুগ্ধ হলো। বিদেশী রাজকুমার সেখানেই থাকে। একদিন রাজা তার নিকট নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিল। বিদেশী রাজকুমার রাজী হলো। রাজকন্যার সখীরা তাকে হলুদ মাখাতে চাইল। বিদেশী রাজপুত্র বলল, আমরা যোদ্ধা, আমাদের দেশে তলোয়ারকে হলুদ মাখানো বা তলোয়ারের গলায় মালা দিয়ে বিয়ে হয়। এই ভাবে বিদেশী রাজপুত্রের সঙ্গে সে দেশের রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে কথা বলে না। আলাদা খাটে শয্যা পাতে। একদিন কন্যা বলল, আমি কি দোষ করলাম, যার জন্য আমার সঙ্গে কথা বলছ না। তখন বিদেশী রাজকুমার বলল, "তোমার বাবাকে বল, একশত একটা শিব মন্দির তৈরী করতে, সেখানে একশত এক রাত গান-বাজনা দিতে হবে। তারপর তোমার খাটে যাব।" তাই হলো। প্রতিদিন এক একটা মন্দিরের সামনে গান হয়। সকালে সখীসোনা মন্দিরের চারিপাশে ঘোরে, দেখে কিছু লেখা আছে কিনা। এমনি করে একশত দিন কাটল। এদিকে বুড়ীর বাড়ীতে বুড়ী প্রতিদিন একটা পাঁঠাকে মানুষ করে এনে গান শুনিয়ে নিয়ে যায়। শেষ দিন সোনাকে নিয়ে যাবে গান শোনাতে। এদিকে বিদেশী রাজপুত্র মন্দিরের গায়ে লিখন দেখতে পায় না। হতাশ হয়ে পড়ল সে। আর এক রাত বাকী। সেদিন বুড়ী সোনাকে সঙ্গে করে গান শুনতে এসেছে। সোনাকে ছাগলের পাঁঠা হতে মানুষ করে নিয়ে এসেছে। সেই সময় সোনা একটা কাঠ কয়লা কুড়িয়ে এনেছে। গান শুনতে শুনতে সোনা পেচ্ছাব করার নাম করে উঠে গেল। তারপর কয়লা দিয়ে লিখে সে কোথায় কিভাবে কার সাথে আছে সব লিখে দিয়ে গেল মন্দিরের গায়ে। পরদিন

বিদেশী রাজকুমার মন্দিরের দেওয়ালে সব কিছু পড়ে দেখল। তারপর কন্যা স্বামীকে বলল, গান তো হলো আর কি চাই? বিদেশী রাজকুমার বলল, আগামীকাল একদিনের জন্য আমি রাজা হতে চাই। রাজা বলল, আমার ঐ কন্যা ছাড়া আর কেহ নাই। তুমি কাল একবারে রাজা হও। বিদেশী রাজপুত্র বলল, আপাত্তত একদিনের জন্য রাজা হই। তাই হলো।

রাজা হয়ে বিদেশী রাজপুত্র বলল, রাজবাড়ীর সামনে একটা বড় চাঁদোয়া টাঙাও। রাজ্যের প্রজাদের নিমন্ত্রণ কর। আর সিংহাসনের কিছুদূরে একটা বড় উনোন কাট। তাতে একটা বড় ডেগ্‌চি চাপাও। চাপাও তাতে এক মণ ঘি ঢেলে গরম কর। পরদিন তাই হলো। প্রজারা এসে হাজির, দেখে একটা বড় ডেগ্‌চিতে ঘি ফুটছে। সকলে ভাবল নতুন রাজা সকলকে লুচি খাওয়াবে। নতুন রাজা হুকুম দিল, "পশ্চিমপাড়ায় একটা বুড়ী আছে, যাব বাড়ীতে সদা সর্বদা আগুনের ধোঁয়া উঠে তাকে ধরে নিয়ে এসো।" পেয়াদা পাইক ছুটে গেল। বুড়ীকে ধরে আনল। রাজা বুড়ীকে বলল, বুড়ী একশত একটা ছাগলের পাঁঠা দরকার, তোমাকে দিতে হবে। বুড়ী বলল, বাবা আমি বুড়ী মেয়ে কোথায় এত ছাগলের পাঁঠা পাব? প্রজারা বলল, বুড়ী কোথা পাঁঠা পাবে? নতুন রাজার উদ্ভট কাজ। রাজা হুকুম দিল, দাও বুড়ীর হাত ঘিয়ে ডুবিয়ে দাও। পেয়াদা এসে বুড়ীর হাত গরম ঘিয়ে ডুবিয়ে ধরল। বুড়ী বলল, বাবা রক্ষা কর পঞ্চাশটা দিব। পঞ্চাশটা পাঁঠা এলো। প্রজারা বলল, তাইতো বুড়ী এতো পাঁঠা কিভাবে পেল! রাজা বলল, আর পঞ্চাশটা পাঁঠা চাই। আবার ঘিয়ে হাত ডুবিয়ে ধরল। আবার পঞ্চাশটা পাঁঠা এনে দিল। সোনাকে পাঁঠা করে রেখে দিয়ে তার একটা সিং সোনা ও একটা সিং রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিল। গলায় ছিল ঘুঙুর। একথা মন্দিরের গায়ে লিখে দিয়ে গিয়েছিল সোনা। ঐ পাঁঠা বুড়ী আর আনে না। ঠিক হলো বুড়ীকে ঘিয়ে ডুবিয়ে

দাও। অবশেষে বুড়ী পাঁঠাবেশী সোনাকে এনে দিল। সোনাও মানুষ হলো। সোনাসহ সকলকে নাপিত ডেকে হাজামত করানো হলো। সকলে দেশে ফিরে গেল। বিদেশী রাজকুমার রাজাকে ডেকে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে সোনার সঙ্গে ঐ কন্যার বিয়ে দিল। তারপর সেই রাজ্যের রাজা হলো সোনা। সতী কন্যার জন্য বুড়ীর যাদু নষ্ট হয়ে গেল। বুড়ীকে শিকল দিয়ে রাজবাড়ীর দরজায় বেঁধে রেখে দিল। শুধু খাবার সময় খেতে দেয়। এইভাবে সখীসোনা ও সোনার দুঃখের অবসান হলো।

—*—

[বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার রাজুয়া গ্রামের ঝড়ু সেখের নিকট হ'তে সংগৃহীত।]

।। মিয়া ফল ।।

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার দুই রাণী। বড় রাণীর এক ছেলে আধপাগলা তবে দেখতে খুব ভাল। ছোট রাণীর দুই ছেলে। দেখতেও ভাল আর বেশ চটপটে। দুই রাণীর ইচ্ছা হলো একটা নতুন রকমের ফলের বাগান করার, যে ফল তাদের রাজ্যে নাই। রাজা তার লোক-লস্কর দিয়ে খোঁজ নিয়ে জানল যে সব রকমের ফল আছে। তবে মিয়া ফল নামে কোন ফল সেই রাজ্যে নাই। মিয়া ফল দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে তেমনি সুস্বাদু। রাজা তার রাজধানীর দক্ষিণে চৌকো একটা পুকুর কাটাল আর সেই পুকুরের চারিপাশে লাগাল মিয়া ফলের গাছ। এ গাছের চারা পাওয়া গেল সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে। গাছের পরিচর্যার জন্য রাজা অনেক মালী রাখল। পরিচর্যার ফলে গাছ দিনকে দিন বাড়তে লাগল। কয়েক বৎসরের মধ্যে গাছ বেশ বড় আর ঝলমলে হলো। সব গাছে ফল ধরল। ক্রমে ফল পাকল। পাকা ফল গাছের শোভা বাড়িয়ে তুলল। কিন্তু একদিন দেখা গেল কোন গাছেই ফল নাই। রাজ্য তোলপাড় করেও ফল

চোরকে পাওয়া গেল না। পরপর দু' বৎসর ফল পাওয়া গেল না। পরবৎসর আবার গাছে ফল এলো। রাজা বলল, যে ফলচোর ধরতে পারবে তাকে ভাল পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম রাত্রে রাজার দ্বিতীয় রাণীর বড় পুত্র পাহারা দিতে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ঘুমিয়ে পড়ল। ফল চুরি হলো কয়েকটি গাছের। তারপর দ্বিতীয় রাণীর ছোট পুত্র পাহারা দিতে এলো। সেও পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল। ফল চুরি হলো। এখন বাগানের দক্ষিণ দিকের একটা মাত্র গাছে ফল আছে। গাছটায় ফলও এসেছে অনেক। ফলের ভারে গাছ নুয়ে পড়েছে।

রাজার বড় রাণীর ছেলে আধপাগলা। সে বয়সে বড়। রাজার যে মন্ত্রী, সে বুড়ো, বড় ছেলেটা তাকে দাদু বলে। ছেলেটা খুব তামাক খায়। এইজন্য একটা নারকেলের হুকো, একটা বাঁশের চোঁঙা সে সব সময় নিজের কাছে রাখে। বাঁশের চোঁঙায় থাকে তামাক, টিকো, শোলা, চকমকি ইত্যাদি। এই ছেলেটি মন্ত্রীকে বলল, আজ রাতে আমি চোর ধরতে যাব। মন্ত্রী বলল, "তুমি পারবে চোর ধরতে?" বড় ছেলে বলল, "দেখি না চেষ্টা করে।" মন্ত্রী রাজাকে বলল, "আজ রাতে আপনার বড় ছেলে বাগান আগলাবে।" রাজা বলল, ঐ ছেলেটা আধপাগলা। কি করতে কি করবে, ওকে আগলাতে হবে না। ছেলেটা মন্ত্রীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। মন্ত্রীও রাজাকে বলল। অবশেষে রাজা মত দিল। বড় ছেলে হুকোর সরঞ্জাম নিয়ে দক্ষিণ দিকের সেই ফলভারে নত গাছটায় উঠল, আর তামাক সেজে হুকো খেতে লাগল। নিশিভোর রেতে এক বয়স্কা পরী এলো ফল চুরি করতে। পাগলা জেগেই ছিল। ঝাপটে ধরে ফেলল পরীকে। ধরে থাকার জন্য পরী উড়তে পারল না। শেষে পরী বলল, ভাই আমি স্বর্গে থাকি। লোভে পড়ে ফল চুরি করতে এসেছিলাম। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমার ডানার গোটাকতক পালক তুমি তুলে নাও। তোমার বিপদ হলে পালকে আগুন ধরিয়ে দিও

তাহলে আমি চলে আসব। এলে চুরি আর হবে না। এই কথা শুনে ক্ষেপা তাকে ছেড়ে দিল। তার ডানা হতে খুলে নিল সাতটা পালক। পরী চলে গেল। গাছ হতে নেমে ক্ষেপা তামাক খাবার জন্য টিকে ধরাল আর একবার একটা পালকে আগুন ধরাল। পরী এসে হাজির। পরী বলল কি দরকার? ক্ষেপা বলল, "এমনি পরীক্ষা করে দেখলাম তুমি আস কিনা?" সকাল হলে ক্ষেপা রাজার নিকট গিয়ে বললে গাছে ফল আছে, চোর আর আসবে না। রাজা, মন্ত্রী বাগানে এসে দেখে গাছে ফল আছে। তখন সেই ফল পেড়ে রাজা, রাণী, মন্ত্রী সকলেই খেল। ফল খেয়ে তৃপ্তি পেল। রাজা ক্ষেপা ছেলেকে পুরস্কার দিল তার কহত মত।

দিন যায়। একদিন পূর্ণিমা রাত। রাজা পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে। শেষ রাতে রাজা স্বপ্ন দেখছে, এক রূপসী সুন্দরী মেয়ে এসে নিজের হাতের খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেল্‌ল নিজের মাথা। কাটা স্থান হতে ফোয়ারার মতন রক্ত বেরুতে লাগল। সেই রক্তে হলো সোনার কদম গাছ। গাছের ডালগুলো হলো হীরের, পাতাগুলো হলো রূপোর, আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে মোতির ফল ঝুলছে। আর গাছের উপর বিরাজ করছে এক কাক। রাজা বলল, আমার এই স্বপ্নকে যে চাক্ষুষ দেখাতে পারবে তাকে দেওয়া হবে অর্ধেক রাজ্য। এই কথা শুনে ছোট দুই ভাই (ছোট রাণীর ছেলে) ভাল ভাল দুটো ঘোড়া আর সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে খুঁজতে গেল পিতার স্বপ্নের দ্রব্য! তারা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। এদিকে রাজার বড় ছেলে ক্ষেপা মন্ত্রীকে বলল, "দাদু ছোট ভাই দুটো বাবার স্বপ্নের দ্রব্য খুঁজতে গেল। আমিও যাব খুঁজতে। মন্ত্রী রাজকে বলল, মহারাজ আপনার বড় পুত্র আপনার স্বপ্নের দ্রব্যের খোঁজে যেতে চায়। রাজা বলল, ও ক্ষেপা, কি করতে কি হবে, ওকে পাঠাতে হবে না। মন্ত্রী তখন রাজাকে বলল, "ঐ ছেলে তো আপনার গাছের মিয়া ফল রক্ষা করেছিল। আর তো ফল

চুরি হয় না।" রাজা বলল, বেশ ওকেও পাঠাও যা চায় তাই দাও। ক্ষেপা টাকাকড়ি বিশেষ কিছু নিল না। অল্পস্বল্প টাকা নিল তামাক কেনার জন্য। পথে যেতে যেতে সে সেই পরীর একটা পালক বার করে পোড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পরী এসে হাজির। পরী বলল, কি চাও! ক্ষেপা বলল আমার ছোট দুই ভাই যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের আগে আমাকে নামিয়ে দাও। পরী ক্ষেপার কথামত ক্ষেপাকে তাদের আগে নামিয়ে দিল। তারা দুই ভাই বলল, আরে দাদা এখানে! তিনজন গিয়ে এক মেলেনী মাসীর বাড়ীতে আশ্রয় নিল। মেলেনী তাদের রান্নাবান্না করে খাওয়ায়। টাকা পায়। দুই ভাই তাদের ঘোড়ার জন্য একটা চাকর রাখল। ক্ষেপা চাকরটাকে টাকা দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই ঘোড়ার সেবা করতে লাগল।

এদিকে সেই দেশের রাজার মেয়ের বিয়ে। মেয়ে খুব সুন্দরী, রূপসী। কিন্তু কথা বলে না। ইশারায় জানিয়ে দিয়েছে তাকে বিয়ে করতে হলে এক লাফে একতলার ছাদে উঠতে হবে। অনেক দেশ হতে রাজার ছেলেরা এসেছে কোন রাজপুত্র একলাফে ছাদে উঠতে পারে না। দুই ভাইও গিয়েছে বিয়ে দেখতে। রাজপুত্ররা অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু এক লাফে ছাদে উঠতে পারল না কেউ। পরদিন ছোট দুই ভাই আবার চলতে লাগল পিতার স্বপ্ন দেখা দ্রব্যের খোঁজে। এদিকে ক্ষেপা পালক পুড়িয়ে পরীকে ডাকল আর এক লাফে ছাদে তুলে দিতে বলল। বহু লোক জড় হয়েছে, ক্ষেপা পরীর সাহায্যে এক লাফে ছাদে উঠল। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। ক্ষেপার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলো। কন্যা কিন্তু বিয়ে করল বটে, কথা বলে না। অনেক চেষ্টা করেও বৌকে কথা বলাতে পারল না। আর পিতার স্বপ্ন দেখা দ্রব্যের খোঁজ পায় না, তাই মনের দুঃখে মরার জন্য নিকটববর্ত্তী যমুনা নদীতে ঝাঁপ দিল।

যমুনা নদী দেখা দিয়ে ক্ষেপাকে বললে, 'ক্ষেপা মরবি কেন?

তুইতো লক্ষ্যের নিকটে এসেগিয়েছিস। তাছাড়া তোর তো পরী আছে, সেই পরী কেবল সেসব ঠিক করে দেবে। আর এই নে একটা আংটি। এই আংটি যখন আঙ্গুলে পরবি, তখন তুই অদৃশ্য হয়ে যাবি। তোর লক্ষ্যপথে যাবার জন্য এই আংটিটা তোর কাজে লাগবে। ক্ষেপা ফিরে এলো সেই কন্যার বাড়ী। থাকে আর বেড়ায়। রাজকন্যা কিন্তু কথা বলে না।

একদিন ভোরে ক্ষেপা মাঠে বেড়াচ্ছে। দেখলো এক ধোপানী কাপড় কেচে দুটো গাছের ডালে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়টা মেলে দিচ্ছে, আর তার মেয়েকে বলছে দেখিস্ কাপড়ে যেন শিশির না লাগে। ক্ষেপা ধোপানীকে শুধাল এ কাপড় কার? ধোপানী বললে এ কাপড় ঐদেশের রাজার মেয়ের। কন্যা খুব রূপসী। এই কথা শুনে ক্ষেপা তার শ্বশুর বাড়ী গেল ও সেখানের গোঁসা ঘরে খিল দিল। রাজার একমাত্র জামাই। তাতে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। ভাবল নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। রাজা গোঁসা ঘরের দরজায় এসে বললে, তুমি গোঁসা ঘরে খিল দিয়েছ কেন? ক্ষেপা বললে, আপনার রাজ্যের পাশে এক রাজার রাজ্য আছে। সেই রাজার এক কন্যা আছে তাকে বিয়ে করতে চাই। মত দিলে তবেই খিল খুলবো। রাজা বললে বেশ তাই হবে। এই রাজার বন্ধু ছিল, ঐ রাজ্যের রাজা। এই রাজা ঐ রাজার মেয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে সব কথা বললে। ঐ রাজা বললে বিয়ে দিতে আমার আপত্তি নাই। তবে ঐ মেয়ে কথা বলে না। আর সবসময় থাকে একটা খাঁড়া নিয়ে। এই মেয়ের পণ যে তাকে বিয়ে করবে এক মাসের মধ্যে তাকে কথা বলাতে হবে। আর না পারলে গর্দ্দান যাবে। এইসব সর্ত্তে বিয়ে হলো।

ক্ষেপা এখন দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়ীতে থাকে। এখানে মেয়েটিকে দেখা শুনা করার জন্য ছিল একটা চাকর। ক্ষেপা চাকরকে বললে, তোকে এই একশত টাকা দিলাম নে, আর আমি যা বলবো তোকে তাই করতে হবে। চাকর টাকা পেয়ে খুব খুসী, সে বললে বেশ

যা বলবেন তাই করবো। ক্ষেপা বললে, একদিন আমি তোকে খাঁড়া নিয়ে কাটতে যাব। তুই ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে কন্যার কাছে যাবি। আর বলবি দিদি বাঁচান বাঁচান জামাইবাবু কাটতে আসছে আমাকে। এই ষড়যন্ত্র মত কাজ হলো। চাকর অভিনয় করে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে রাজকন্যার নিকটে গেল ও বলতে লাগল দিদি বাঁচান বাঁচান। জামাইবাবু কাটতে আসছে। এই ঘটনা দেখে কন্যা নিজের কথা না বলার কথা ভুলে গেল। আর ক্ষেপাকে বলতে লাগল, গরীব চাকরকে মারবে কেন ছেড়ে দাও। ক্ষেপা বললে যাক তাহলে কথা বললে। রাজকন্যা দেখলো তাইতো কথা বলে ফেলেছি। ক্ষেপা একবার এরাজ্যে একবার ঐরাজ্যে যায়। তুই বৌ-এর নিকটে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী কথা বললেও থাকে হাতে খাঁড়া নিয়ে। প্রথমা কথা বলে না।

একদিন ক্ষেপা পরীর পালক পুড়িয়ে পরীকে ডেকে নিজের তুই স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। পরী নেমে এসে বললে, তোমার এই তুই স্ত্রী স্বর্গের অপ্সরী। এরা পৃথিবীতে মনুষ্য গৃহে জন্মেছে অভিশপ্ত হয়ে। কিন্তু এরা প্রতি রাতে উড়ন খাটে চেপে স্বর্গে যায়। যার হাতে খাঁড়া, সে স্বর্গে গিয়ে নিজের মাথা কাটে, আর সঙ্গে সঙ্গে হয় সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর পাতা ও মুক্তার ফল। আর গাছের উপর সোনার ময়ূর পেখম মেলে নেচে বেড়ায়। তুমি আজ রাতে ঘুমাবে না, ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে। এই তুইজন উড়ন খাট নিয়ে একে অপরের নিকট আসবে। তারপর যাবে স্বর্গে। তুমি যমুনা নদীর আংটি হাতে দিয়ে খাটে চেপে একপাশে বসে থাকবে। তোমার প্রথমা স্ত্রীর ঘরের খাটটা হলো উড়োন খাট। রাত হলো। ক্ষেপা ঘুমের ভান করে খাটে শুয়ে থাকল। রাত একটু ভারী হলে রাজকন্যা ঘুমন্ত ক্ষেপাকে খাট হতে নামাল। তারপর খাটে উঠে মন্ত্র পড়তে লাগল। এই অবসরে ক্ষেপা যমুনা নদীর আংটি পরে অদৃশ্য ভাবে খাটের এক কোণে চেপে বসে রইল। তারপর দ্বিতীয়া স্ত্রীর

বাড়ীতে খাট গেল। 'তারা দু'জনে সেই খাটে চেপে স্বর্গে গেল। সেই সঙ্গে ক্ষেপাও চলে গেল। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের রাজসভা বসেছে। এই দুই অপ্সরী সেখানে গিয়ে দ্বিতীয় জন সেই খাঁড়া দিয়ে নিজের মাথাটা কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হলো এক সোনার গাছ, হীরের ডালপালা, রূপোর পাতা ও ডালে ডালে মুক্তোর ফল ঝুলতে লাগল। তার গাছের ডালে ডালে পেখম বিস্তার করে নাচতে লাগল এক ময়ূর। গাছের নীচে প্রথমা অপ্সরী নাচতে লাগল। কয়েকজন বাজনাদার বাজনা বাজাতে লাগল। এইভাবে ক্ষেপা প্রায়ই ইন্দ্ররাজের রাজসভায় যায়। ক্ষেপা ছিল খুব ভাল বাজনাদার। একদিন এক বাজনাদার বাজনা বাজাতে বাজাতে ঘুমে ঢুলে পড়ল। সেই অবসরে ক্ষেপা তাকে সরিয়ে দিয়ে বাজনা বাজাতে লাগল। বাজনার তাল লয় অপূর্ব। ক্ষেপার বাজনার তালে গাছের উপর ময়ূর যত নাচে, তত নাচে অপ্সরী। ক্ষেপার বাজনা শুনে ইন্দ্ররাজ মুগ্ধ হলো। ইতিমধ্যে সেই পরী ক্ষেপাকে কানে কানে বলে গেল রাজা যদি তোমাকে পুরস্কার দিতে চায় তাহলে এ দুই কন্যা, উড়োন খাট, রাজার গলার মালা, বাঁশী ও কন্যার হাতের সেই খাঁড়াটা যেন চেয়ে নেয়। বাজনামুগ্ধ ইন্দ্ররাজ বাজনাদারকে পুরস্কার দিতে চাইল। ক্ষেপা পরীর কথিত সব চাইল। ইন্দ্ররাজ তাই দিল। পরী এরপর ক্ষেপাকে বললে খুব সাবধানে যাবে। কুঁয়োর পাশে বসবে না। ভাইদের বিশ্বাস করবে না। ক্ষেপা দুই স্ত্রী নিয়ে পিতার রাজ্যের দিকে যেতে লাগল।

এদিকে তার অন্য দুই ভাই দূরদেশে গিয়ে এক স্যাকরাকে দিয়ে সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর পাতা ও মুক্তোর ফল এবং গাছের ডালে এক পেখম মেলা ময়ূর তৈরী করে নিয়ে যাচ্ছে। সাথে যাচ্ছে সেই স্যাকরা। পথে ক্ষেপার সাথে দুই ভায়ের দেখা ও গাছ দেখাল। ক্ষেপার সাথে দুই সুন্দরী দেখে স্যাকরা বললে ক্ষেপাকে মেরে এই মেয়ে দুটোকে তোমরা দুইজন বিয়ে

কর। দুইভাই বললে ক্ষেপাকে মারা চলবে না। তবে কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিলে ভাল হয়। সকলেই একসাথে যাচ্ছে। পথের পাশে একটা কুঁয়ো। মেয়ে দুটি দূরে বসে আছে। ক্ষেপার দুই ভাই কুঁয়োর পাড়ে বসে আছে। ক্ষেপাও গিয়ে সেখানে বসল। আর স্যাক্‌রা ক্ষেপাকে কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর দুই কন্যা নিয়ে বাড়ী এলো। ছেলেরা দুই কন্যা ও পিতার স্বপ্ন দেখা গাছ এনেছে শুনে প্রজারা দেখতে এলো। রাজা খুব খুসী। শুধু একবার বললে ক্ষেপাটা কোথায় গিয়ে থাকলো কে জানে! দু'ভাই বলল ক্ষেপার সাথে তাদের দেখা হয় নি। এদিকে ক্ষেপা কুঁয়োর মধ্যে গিয়ে পড়ল। কুঁয়োর মধ্যে জল ছিল না। তবে কুঁয়োর তলাকার মাটি ভিজে ছিল, তাই তাকে বিশেষ আঘাত লাগল না। কিছুক্ষণ পর পালক পুড়িয়ে পরীকে ডাকল। পরী তাকে উদ্ধার করল। তারপর সে বলল, তোমাকে বারণ করেছিলাম কুঁয়োর ধারে বসবে না। যাক যা হয়েছে হয়েছে। এখন তুমি ফকীরের বেশ ধরে দেশে যাও। তোমাকে চিনতে পারলেই সেই স্যাকরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

রাজপুরীতে দুই পুত্র দুই কন্যাকে বিয়ে করতে চায়। কন্যা দু'জন বলে আমাদের ব্রত আছে। এক বৎসর পর ব্রত শেষ হবে। তারপর হবে বিয়ে। কয়েক মাস পর ক্ষেপা ফকীরের বেশ ধরে রাজপুরীতে এলো। ফকীর বলে বেড়াচ্ছে প্রজাদের মধ্যে যে, সে সত্যিকারের সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর পাতা ও মুক্তোর ফল দেখাবে। এই কথা শুনে প্রজারা সকলে রাজার নিকট গেল ফকীরকে সাথে করে। রাজা সব শুনে দুই ছেলেকে ডাকল। ছেলেরা স্যাক্‌রাকে নিয়ে এলো। স্যাক্‌রা নকল গাছ, পাতা, ফল ও ময়ুর দেখাল। প্রজারা বললে এতো সব নকল। এই ফকীর আসল গাছ দেখাবে। কন্যা দুটি ফকীরকে দেখে চিনতে পারল। তারপর দ্বিতীয়া কন্যা খাঁড়াতে তার মাথা কাটল। আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার গাছ, হীরের ডাল, রূপোর

পাতা ও মুক্তোর ফল হলো, গাছের ডালে সোনার ময়ূর পেখম মেলে নাচতে লাগল। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। এরপর ফকীর তার পরিচয় দিল ও সব বলল। এরপর রাজা স্যাক্রাকে শাস্তি দিল। দুই ভাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইল। রাজা ক্ষেপাকে রাজ্য দিল। ক্ষেপা কিন্তু তখন বুদ্ধিমান সুপুরুষ হয়েছে। ক্ষেপা এক ভাইকে মন্ত্রী ও অন্য ভাইকে সেনাপতি করে দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

[বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার চুরপুনী গ্রামের শ্রীমদন মাঝিব নিকট হতে সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে ঐ গ্রামের শ্রীসুনীল কুমার মণ্ডল।]

—*—

।। পটুয়াদের পট আঁকার আদিকথা ।।

বাংলার পটুয়ারা পট কেন আঁকে? তার একটি কথা আছে। তাহলো :—

অতি প্রাচীনকালে আরব দেশে ছিল এক বাদশা। বাদশার বিরাট রাজ্য। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোকলস্কর, উজির, নাজির, নিয়ে রাজপুরী গমগম। এই রাজার রাজ্যের দক্ষিণ দিকে আছে একটা গহিন বন। সেই বনের শেষ নাই। সেই-বনে বাস করতো এক দৈত্য। প্রতিদিনের আহারের জন্য সে এই রাজার ক্ষেতে এসে ফসল নিয়ে যেতো। এর জন্য প্রজাদের আহার কম পড়তো। এর জন্য প্রতি বৎসর অন্নের অভাবে অনেক প্রজা মারা যেত। রাজা অনেক চেষ্টা করেও দৈত্যকে মারতে পারলো না। তখন রাজা দৈত্য-এর সাথে একটা চুক্তি করল। ঠিক হলো প্রতিদিন তার জন্য ভাল ভাল খাবার বনের এক বড় বটগাছের নীচে রেখে আসা হবে। দৈত্য তাই খাবে। প্রজাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করবে না। দৈত্য দেখলো বসে বসে

যদি খাবার পাওয়া যায় তবে কে আর কষ্ট করতে যাবে, মাঠে মাঠে তাই দৈত্য রাজার কথায় রাজী হলো। রাজা কিন্তু দৈত্য-এর অগোচরে ঘোষণা করল, যে দৈত্য মারতে পারবে তাকে বহু টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে বহু শক্তিশালী ব্যক্তি দৈত্য-এর নিকটে গেল, কিন্তু তার হাতে তারা মারা গেল।

বাংলা মুলুকে সমুদ্রের ধারে এক গাঁয়ে এক গরীব লোক বাস করতো। তার ছিল এক বলবান পুত্র। আরবদেশের লোকেরা নৌকা নিয়ে এইসব এলেকায় নানা জিনিস কিনতে আসে। কথায় কথায় তারা দৈত্য-এর অত্যাচারের কথা বলল। গরীব লোকটির ঐ বলবান ছেলে সব কথা শুনে ঐ লোকদের সঙ্গে নৌকায় চেপে আরব দেশে যেতে চাইল দৈত্য মারতে। আরবের লোকেরা বলল দৈত্য খুব শক্তিশালী, সে দিনে তিন মণ খাবার খায়। বহু লোককে সে মেরেছে। তুমি গরীবের ছেলে, তার সাথে পারবে না মরে যাবে। তুমি যেও না। ছেলেটি বললে আমি গরীব, ভাল কোরে খেতে পাই না। যদি মারতে পারি অনেক টাকা পাব, আর মরে গেলেও ক্ষতি নাই। গরীব মানুষ একদিন তো মরতেই হবে। না খেয়ে কেন মরি একটা ভাল কাজের জন্য প্রাণ যাবে। এই কথা শুনে আরবের ব্যবসায়ীরা তাকে নৌকায় চাপিয়ে আরব দেশে নিয়ে গেল। তারপর ঐ ব্যবসায়ীরা বলবান ছেলেটিকে নিয়ে গেল বাদশার কাছে। বাদশা ছেলেটির চেহারা দেখে ও কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলো। কারণ একটা কাজে সে প্রাণ দিতে চায়।

তারপর কয়েকদিন সে রাজার আশ্রয়ে থেকে ভালভাবে আহারাদি করল আর মালামো শিখলো। রাজার যেদিন পালা পড়ল সেদিন ঐ বলবান যুবকটি বনে গেল খাবার নিয়ে। আতপ চাল, পাকা কলা, চারটে আস্ত ভেড়া রান্না, মিষ্টি এক মণ, ভাল ভাল ফল একগাদা, আর দুধ। এগুলি সেই বনের বটগাছটার নীচে রেখে দৈত্য দৈত্য করে ডাকে আর নিজে খায়। এদিকে দৈত্য

বুড়ো হয়ে এসেছে। একজন মানুষকে তার খাবার খেতে দেখে রেগে তাকে মারতে গেল। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো তুমুল লড়াই। যুদ্ধ করতে করতে দুইজনে চলে গেল গভীর বনে। একবার দৈত্য নীচে পড়ে, একবার যুবক নীচে পড়ে অবশেষে দৈত্যকে নীচে ফেলে কিলিয়ে মেরে ফেলল। কিন্তু সে বন এত গভীর যে সেখানে রাজা বা তার উজির নাজির কেও যেতে পারবে না। মরা দৈত্যকে ঘাড়ে করে আনাও যাবে না। সেই বনে এক রকম গাছ ছিল। তার পাতা বেশ বড় আর মসৃণ। এই শুকনো পাতা কুড়িয়ে সেই পাতাকে আঁঠা ও কাঁটা দিয়ে পরপর জুড়ে দুই হাত চওড়া ও পাঁচ ছয় হাত লম্বা করল। বটগাছের একটা কাঁচা ঝুড়ি ভেঙে তাকে দাঁতে করে চিবিয়ে তুলি তৈরী করল। তারপর দৈত্য-এর রক্তে সেই তুলি ডুবিয়ে সে আঁকল ঘটনাবহুল ছবি। বাড়ী হতে নৌকায় করে আরব আসা ও বনে গিয়ে কিভাবে দৈত্য বধ করল এই হলো তার বিষয়বস্তু। পটটির প্রথমে ও শেষে একটি করে দুই কাঠি আঁটা ও গাছের ছিলকি দিয়ে বেঁধে পটটি গুটিয়ে রাখল। তারপর রাজার নিকট গিয়ে বলল আমি দৈত্য মেরেছি। রাজা বলল দৈত্য মেরেছ তার প্রমাণ কি? যুবক বলল, দৈত্য বনের গহিনে পড়ে আছে আপনারা যেতে পারবেন না। দেখুন আমি কিভাবে দৈত্য মেরেছি:

শুন শুন শুন রাজা শুন বিবরণ
কিভাবেতে দৈত্য মারিলাম বলিব এখন
তোমার দেশের লোকেরা সব বাঙলা মুলুক যায়
ধান কেনে পাটকে নৌকাতে চাপায়
তাদের মুখেতে শুনি দৈত্যটার কথা
অত্যাচার শুনে মনে পাই বড় ব্যথা
নৌকায় চাপিয়া আসি আপনার দেশে
আপনারে বলি আমি সবই অবশেষ
খুসী হয়ে তুমি রাজা দিলে মোরে ঠাঁই

খাই দাই কুস্তি শিখি কোন ভয় নাই।
অবশেষে একদিন খাবার দাবার লয়ে
দৈত্য কাছে যাই আমি মাথায় করে বয়ে
দৈত্য এর খাবার রাখি বটগাছ তলে
ফল মিষ্টি দেখে মুখ ভরে গেল জলে
ফল খাই মিষ্টি খাই ডাকি দৈত্য বলে
মাংস খাবার কালে দৈত্য এলো চলে
দৈত্য এর খাবার খাই, দৈত্য দেখে তাই
ছুটিয়া আসিয়া মোরে মারিবারে চায়
দৈত্য এর সঙ্গে হয় তুমুল লড়াই
লড়ায়ে লড়ায়ে বনের ভিতরেতে যাই
একবার হারে দৈত্য, পরে আমি হারি
বনের গহিনে তারে কিল চর মারি
বুড়ো দৈত্য বল শেষ হাঁপায় সদায়
এক ঘুঁষি মারি তার নাকের ডগায়
নাক কেটে লোহু ঝরে আসে মোরে তেড়ে
আর ঘুষি মারি তার বুকের উপরে
কাঁটা বনে মাটি 'পরে চিত হয়ে পড়ে
ভুঁইকম্প হয় যেন সারা বন জুড়ে
বুকের উপরি বসি ধরি টুঁটি তার
নাকে মুখে বজ্র কিল মারি বার বার
মরিল বিষম দৈত্য মোর কিল চড়ে
কেমনে দেখাব দৈত্য ভাবি বারে বারে।
তখনো গাছের পাতা আঁটা কাঁটা দিয়ে
জুড়িলাম পর পর সেথায় দাঁড়িয়ে
দুই হাত চওড়া আর লম্বা হাত ছয়
পর পর আঁকি ছবি শুন মহাশয়।
বটের ভাঙিয়া ঝুড়ি চিবাইয়া দাঁতে

দৈত্য এর রক্ত দিয়ে আঁকি ছবি পাতে
এইভাবে মারি দৈত্য শুন মহাশয়।
চিত্ত হয়ে আছে পড়ে করহ প্রত্যয়
নাকে মুখে রক্ত ঝরে বন লালে লাল
গহিন বনেতে আছে জ্বলিছে মশাল।

এইভাবে ছবি দেখে রাজা বুঝল যে যুবক সত্যিই দৈত্য মেরেছে। তখন রাজা সেই যুবককে বহু টাকা পুরস্কার ও চিত্রকর উপাধি দান করলো। এই যুবক বাংলা মুলুকে ফিরে এলো ও পট আঁকা শুরু করলো। তার ছেলেরা তার কাছে শিখল পট আঁকা। এই যুবকেব ছেলের ছেলেরা ছড়িয়ে পড়ল দেশে বিদেশে। এই হলো পটুয়াদেব পট আঁকাব আদিকথা।

[মেদিনীপুব জেলার এক বৃদ্ধ পটুয়াব নিকট হতে কাহিনী ও গানটি সংগৃহীত।]

—**—

॥ চার বিলাস ॥

এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজা তার মন্ত্রী, সেনাপতি আর বণিক এই তিনজনের পরামর্শে রাজ্য চালান। রাজা খুব খুশী। রাজ্যে কোন ঝামেলা নাই ঝঞ্ঝাট নাই। কিছুদিন পর রাজার বিবি একটা পুত্র সন্তান প্রসব করল। তারপর কিছুদিন পর পর মন্ত্রী, সেনাপতি ও বণিকের বিবি একটা করে পুত্র সন্তান প্রসব করল। চারজন কুমার একসাথে খেলাধুলা করে, আর একসাথে পড়াশুনা করে। এমনি করে দিন যায়। চার বন্ধু একসাথে লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা, ঘোড়ায় চাপা সবকিছু শিখল। চার বন্ধু ঘোড়ায় চাপতে খুব ভালবাসে। রাজা আরব দেশে থেকে একই রঙের একই রকম চারটি খাদী ঘোড়া এনে দিল রাজপুত্র আর তার

বন্ধুদের। চার কুমার দিন রাত মনের সুখে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই চার কুমারদের মধ্যে প্রত্যেকের একটি একটি করে বিলাস আছে। রাজপুত্র ভাল চালের ভালভাবে রাঁধা অন্ন খেতে ভালবাসে। চাল খারাপ হলে বা রান্না ভাল না হলে সে খেতে পাবে না। তাই তাকে বন্ধুরা বলতো অন্নবিলাস। মন্ত্রীর পুত্রের নজর ছিল বিছানার দিকে। সুন্দর পরিপাটী বিছানা না হলে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম আসতো না। তাই বন্ধুরা তাকে বলতো শয্যাবিলাস। সেনাপতির পুত্র ভালবাসতো নিখুঁত সুশ্রী নারী। নারীর মধ্যে সামান্য একটু খুঁত থাকলে সে পিছিয়ে চলে আসতো। বন্ধুবা তাই তাকে বলতো নারীবিলাস। বণিকের পুত্র ভালবাসতো পান খেতে। তবে পান হওয়া চাই সতেজ, নিখুঁত ও সুগন্ধযুক্ত। পচা, ছেঁড়া, দুর্গন্ধযুক্ত পান হলে সে খেতো না। তাই তার নাম দিয়েছিল বন্ধুরা পানবিলাস। একদিন চার বন্ধুতে যুক্তি করল, তারা যাবে দেশ ভ্রমণে, কারণ বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

একদিন ভোরে চারবন্ধু ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল আর এক দেশে। সেই দেশের রাজার ছিল খুব ঘোড়ার সখ। এই রাজা আরব থেকে চারটে একই রং-এব ঘোডা কিনে এনেছিল। ঘোড়াগুলো দেখতে ছিল রাজপুত্র ও তার বন্ধুদের ঘোড়ার মত। কিছুদিন হলো এই রাজার ঘোড়া চারটে চুরি হয়ে গেছে। আর তার কয়দিন পর রাজপুত্র ও বন্ধুরা এই রাজাব রাজ্যে বেড়াতে এসেছে। রাজাব রাজধানী ঢুকতেই আছে একটা বাগান বাড়ী। পুকুরের চারিপাশে ভাল ভাল গাছ। সেই গাছে ঘোড়া বেঁধে তারা বিশ্রাম করতে লাগল। এদিকে রাজা তার কর্মচারীদের হুকুম দিয়েছে সাতদিনের মধ্যে ঘোড়া এনে দিতে না পারলে গর্দ্দান যাবে। রাজকর্মচারীরা বাগান বাড়ীতে ঘোড়াসহ রাজপুত্র ও তার বন্ধুদের ধরে রাজার নিকট নিয়ে গেল ও বন্দী করে রাখল। চার কুমার বলাবলি করছে একি হলো? আমরা শেষ পর্যন্ত চোরের

দায়ে ধরা পড়লাম। এদিকে রাজার কন্যা ঐ বাগান বাড়ীর পাশে থাকে। রোজ ঘোড়া আর তার মালিকদের দেখে যে এরা বেশ ভাল লোক। সেদিন ঘোড়া বা কুমারদের দেখতে না পেয়ে সখীদের পাঠাল খবর নিতে। সখী রাজকন্যাকে এসে জানাল, ঐ কুমাররা রাজার ঘোড়া চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। তাদের বিচার হবে।

রাজকন্যা পিতাকে গিয়ে বলল, "বাবা, এই চারজন চোর নয়।" এরা পরিচয় গোপন করে এখানে বেড়াতে এসেছে বলে মনে হয়। এদের পরীক্ষা করা হোক। রাজা কন্যাকে শুধাল, "কিভাবে পরীক্ষা করা যায়?" রাজকন্যা বলল, "এরা কি ভালবাসে সেটা জেনে, তাই দিয়ে পরীক্ষা করা হোক।" রাজা চার ঘোড়া চোরকে দরবারে হাজির করতে বলল। দরবারে রাজা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। তারা বলল, আমরা দামোদরপুর রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, সেনাপতির পুত্র ও বণিকের পুত্র। এই কথা শুনে রাজা বলল, "তোমরা কে কি ভালবাস?" এই কথা শুনে রাজপুত্র বললে, "আমি অন্নবিলাস, ভাল অন্ন খেতে ভালবাসি"। মন্ত্রীপুত্র বললে, "আমি শয্যাবিলাস, আমি ভাল বিছানায় শুতে ভালবাসী"। বণিকপুত্র বললে, "আমি পান-বিলাস, ভাল পান খেতে ভালবাসি"। এই কথা শুনে রাজা ভাল সরু চাল এনে তার পোলাও তৈরী করে রাজপুত্রকে খেতে দিল। রাজপুত্র একগ্রাস খেয়ে থু থু করে মুখের ভাত ফেলে দিল। রাজা শুধাল কি হলো? রাজপুত্র বললে, "এ ভাত আমি খেতে পারবো না। ভাতে শ্মশানের ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। রাজা এই কথা শুনে বললে, "ডাক ভাণ্ডড়েকে ডাক"। ভাণ্ডড়ে রাজার আদেশ পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাজির। রাজা বললে, "বল বেটা, এ ধান কোন্ জমির"? ভাণ্ডড়ে বললে মহারাজ এ ধান শ্মশানের ধারে এক ভাল জমির। রাজপুত্রের কথা ঠিক ঠিক মিলে গেল।

মন্ত্রীপুত্রের জন্য ভাল তোষক দিয়ে খাটের উপর বিছানা পেতে

শুতে দেওয়া হলো। রাজা তার এক কর্মচারীকে রাখল দরজার কাছে। মন্ত্রীপুত্র রাতে কি করে দেখার জন্য। কর্মচারী দেখলো মন্ত্রীপুত্র সারারাত না ঘুমিয়ে শুধু একাত ওকাত করছে। সকাল হলে কর্মচারী রাজাকে সব জানাল। রাজা শয্যাবিলাসকে শুধাল কি ব্যাপার এত ভাল বিছানায় শুয়েও তুমি ঘুমায়নি কেন? শয্যাবিলাস বললে মহাবাজ তোষকের ভিতরে মাঝখানে এক খি লম্বা চুল আছে। এই চুল খির জন্য সারারাত ঘুম হলো না। রাজা তোষক ফেঁড়ে দেখলো, সত্যিই তার মধ্যে এক খি চুল আছে।

এবপর নারীবিলাসকে ডাকা হলো। বাজাব মালিনীব একটি পালিত কন্যা ছিল। যেমন রূপসী তেমনি সুঠাম চেহাবা। এখনও তার বিয়ে হয়নি। রাজা মালিনীকে অনেক টাকা দিয়ে মেয়েটিকে এক রাতের জন্য নিল। মেয়েটিকে খোসবু সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে সুগন্ধী দ্রব্য ও ভাল ভাল কাপড় গহনা পবিয়ে নারী-বিলাসের ঘরে রাতে দেওয়া হলো, আর রাতে সে কি করে দেখাব জন্য দরজার কাছে রাখা হলো এক কর্মচারী। নাবীবিলাসেব পাশে মেয়েটি শুয়ে পড়ল। নারীবিলাস একবার মেয়েটির দিকে মুখ করে আর ফিরিয়ে নিয়ে থু থু করে থুথু ফেলে আর বমি করে। সারা রাত এইভাবে চলল। ভোরে নারীবিলাস উঠে এলো। কর্মচারী রাজাকে সব খবব দিল। বাজা নারীবিলাসকে শুধাল, কি হে সারারাত বমি কবেছো কেন? নারীবিলাস বলাল এই মেয়েটির গায়ে ছাগলের দুধেব গন্ধ। আমি ছাগলের দুধের গন্ধ সহ্য করতে পারিনা, তাই সারারাত মেয়েটির দিকে মুখ করেছি আর ছাগলের দুধের গন্ধ পেয়েছি, আর সাথে সাথে আমাব বমি হয়েছে। রাজা কর্মচারীকে হুকুম দিলেন, "ডাক মালিনীকে"। মালিনীকে শুধান হলো, এই কন্যাব গায়ে ছাগলের গন্ধ কেন? মালিনী বললে, "মহারাজ এই মেয়েটিকে জন্ম দিয়ে এর মা মারা যায়।" এর মা ছিল আমার বোন। এই সময় আমার একটি

ধাড়ি ছাগল বিয়েছিল'। মা হারা মেয়েটি সেই ছাগলের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে। রাজা বলল, হ্যাঁ তুমি সত্যিই নারীবিলাস।

এরপর পানবিলাসের পরীক্ষা। রাজার হুকুমে সুন্দর, সতেজ, নিখুঁত পান এনে সেই পানকে দুইশত বাহান্ন রকমের মশলা দিয়ে সাজা হলো ও পানবিলাসকে খেতে দেওয়া হলো। পানবিলাস পান মুখে দিয়ে একবার চিবিয়ে তা থু থু করে ফেলে দিল। রাজা বললেন কি হলো? পানবিলাস বললে, পানের মধ্যে আলান সাপের গন্ধ পাচ্ছি। যে পান এনেছিল তাকে নিয়ে রাজা চলে গেল পানের বরজে। যে পানলতা হতে পান নেওয়া হয়েছিল, তার গোঁড়া খোঁড়া হলো। বেরিয়ে এলো আলান সাপ। রাজা বললেন, হ্যাঁ তুমি পানবিলাস।

তারপর ঘোড়া সমেত তাদের ছেড়ে দিলেন রাজা। তার কন্যাব সাথে রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন।

[ভাগুড়ে—যে অপরের জমি শস্যেব বিনিময়ে চাষ করে তাকে বীরভূম জেলার অঞ্চল বিশেষে ভাগুড়ে বলে।]

[খোসবু—সুগন্ধ।]

[আলান সাপ—বিষধর সাপ। গোখুরা প্রজাতির সাপ-বিশেষ। বীরভূম জেলার অঞ্চল বিশেষে বলে আলান সাপ।]

[লোককথাটি বীরভূম জেলার নান্নুর থানার রামঘাটি গ্রামের কানিকুড়ো শাহ্ ফকীরের নিকট হতে সংগৃহীত। জানুয়ারী মাসের (১৯৮৮) মাঝামাঝি সময়ে ইনি পরলোকগমন করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।]

।। লিঙ্গ বদল ।।

এক রাজার বেটাছেলে হয় না, শুধুই মেয়েছেলে। মনটা 'খিদিয়ে' গেছে। রাজা তাই পাটরাণীকে বলে দিলে, 'এবার যদি মেয়েছেলে হয় তো তাকেও কাটবো, আর তোকে…(হাতের ইশারা, বোঝা যাবে কাটবো)। মনের দুক্ষে আর ই'-বিপদে রানী ভাবছে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো মন্ত্রীর কথা। (মন্ত্রী তো কেবল রাজত্বি চালাবার পরামর্শ দেয় না, রাজবাড়ীর রাজবংশের সুহৃদ।) গোপনে 'মুন্ত্রী'কে ডাকলে। বুড়ো-পাকাচুলে মন্ত্রী। সব শুনলে. 'দেখছি কি হয়' বলে 'সিদিন' গেল।

তারপর রানীকে দিয়ে রাজাকে পরামর্শ দিলে যে, একটা যজ্ঞ করতে হবে। মন্ত্রী, বামুন বেটাকে বলে দিলে, যাই হোক যজ্ঞর শেষে বলবি, বোধকরি বেটাছেলেই হবে, যজ্ঞ সফল হয়েচে।

যজ্ঞ হলো, বামুন তাই বললে। আর গণৎকার দিয়ে মন্ত্রী বলালে যে, সত্যিই বেটাছেলেই হবে। তবে ফাঁড়া আছে, ফাঁড়া। ফাঁড়া এই যে, ছেলের আঠারো বছর পূর্ণ না হলে, রাজা যদি সেই ছেলের মুখ দেখে তবে ছেলে…মারা যাবে। রাজা সব শুনলে।

কথা রইলো গোপনে। রাজা ইসব 'মাচকো-ফের' কিছুই জানলে না। রানীর 'গবভো' হলো। আর দাইকে কড়কে বলে দিয়েছে, যে ছেলেই হোক, মেয়ে বা ছেলে, তাকে বলতে হবে "বেটা ছেলে" হয়েছে। রাজা খুশী। রানীর পেট হতে কতোক 'বামুন অতীত' খাওয়ালে, 'দান-ধিয়ান' করলে। কিন্তু আঠারো বছর! তা হোক, রাজার বংশ রক্ষা হবে।

যথাসময়ে রানী 'প্রসব' হলো। আর 'হবি'ত হ', মেয়েছেলেই হয়েছে। কিন্তু দেশের 'লোগ' জানলে বেটা ছেলে হয়েছে। দানধ্যান কল্লে খুব।

ছেলে, বেটাছেলের সাজে মানুষ হতে রইলো। 'গিয়ান' হতে মেয়েকে একদিন রানী সব বল্লে, মেয়ে বশে রইল, বেটাছেলের সাজে।

ছেলের যখন পনেরো ষোল বছর বয়স তখন রাজার কি 'খিয়াল' হলো, ছেলের বিয়ে দেখবো। 'বড্ডা' সখ। মুখ দেখতে নাই কিন্তু বুড়ো হচ্ছে রাজা, ছেলের বিয়ে দিয়ে 'সংসারী' করবে। আর দেখতে দেখতে আঠারো বছর কেটে গেলে, যদি বাঁচে রাজা, তবে নিজের হাতে রাজপাটে বসিয়ে যাবে। বড্ড আশা।

খিয়ালী রাজার মত। রানী পড়লো মুস্কিলে? তেমন সময় বুড়ো মুন্ত্রী ভুগতে ভুগতে গ্যেল,—মরে। তা যাক্, মুন্ত্রী আবাব হবে। রাজাব বেটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল পাশের গাঁয়ে, রাজকন্যের সাথে। কে কার কথা শোনে।

ধুমধাম হুলুস্থুল। রাজা বিয়েতে যাবে না, 'যেদি' মুখদেখা-দেখি হয়ে যায়। কিন্তু ধুমধাম সব চলছে। বিয়ের দিন ঠিক। মা-মেয়ে পড়লো মুস্কিলে। বুড়ো মন্ত্রী মরে গেছে। কি হয় কি হয়। আর রাজার যা 'খিয়াল', ইসব 'কুনুকথা' বলাই যাবে না।

বিয়ের দিন। 'ঠায়' বিয়ে, তবু দুপুর থেকে লোক সব বেরিয়ে পড়েচে। রাজা যাবে না তবে রানীমা যাবে বিয়েতে। বর আর রানীমা বেরুবে সন্ধ্যার পব। সন্ধ্যে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, রাজা 'তাড়া' দিয়ে দুটো পাল্কী বার করে দিলে।

দু গাঁয়ের মাঝখানে একটা বড় পুকুর ছেলো। 'অবিরত' বড় বড় গাছও আছে। বেল আম জাম 'ফল-পাকড়ীর' গাছ। রানী আদেশ কল্লেন একবার পাল্কী নামাতে। 'কুনু' দরকার আছে বোধকরি। 'ডুলিবেহারা' পাল্কী নামাতে, রানী তাদিকে একটু দূরতফাতে যেতে বললে। তারা যেতে, মা-মেয়ে, গলা-জড়াজড়ি করে কাঁদতে রইলো।

সিখানেই ছ্যালো এক বেম্মদত্তি। এদের 'কাঁদোন' দেখে সে এসে জিজ্ঞেস করলো। রানী একবার দেখে 'বুজে' নিয়েচে।

কাজ। কিন্তু সে যাবে কাদের কাছে? বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে তো যেতে পারবে না। কারণ সে বিদ্যাও তার নাই। সে শুনেছিল বাথানে গয়লারা গরু চরাতে যায়। ঠিক করল বাথানে গয়লাদের কাছে গিয়ে তর্কে হারিয়ে দুধ, ঘি খাওয়া খাবে।

চাষীর পো চলেছে চলেছে। বহুদূর আসার পর সামনে খড়ি নদী। শুনল এই নদীর ধারে খিল জমিতে গয়লাদের বাথান। বহু গয়লা গাই চরাচ্ছে। সে গয়লাদের কাছে গেল। দেখা-সাক্ষাৎ হলো। কথা হলো আগন্তুক চাষীর পোব কথার মানে বলে দিতে হবে। যদি বলতে না পারে তাহলে দুধ খাওয়াতে হবে। গয়লারা শুধাল, কথাটা কি? চাষীর পো বলল, "গব্য গরাং"। গয়লারা কথাটার মানে বলতে পারল না। তবে গয়লারা বলল, আমাদের গুরু, গয়লাদের মোড়ল কাটোয়ায় দুধ বিচ্‌তে গিয়েছে'; সে আসুক, মানে বলে দেবে।

গয়লাদের মোড়ল বাথানে ফিরে এলো কাটোয়া থেকে। গয়লারা তাকে সব কথা বলল। মোড়ল বলল, ডাক তাকে। চাষীর পো এলো ও মোড়লকে শুধাল, "গব্য গবাং-এর মানে কি?"

মোড়ল বলল, "দূর বেটা, গোটা কথাটা তো তুই জানিস না, জানিস শুধু শেষেব ছত্রটা"। চাষীর পো বলল, গোটা কথাটা কি?

মোড়ল বলল : প্রথমে গোবরমাটি ছড়াং
তাবপর পত্র পড়াং
তারপব জল ছড় ছড়াং
তারপর চিড়েব্য চড়াং
তারপর গব্য গরাং

অর্থাৎ প্রথমে গোবর মাটি দিয়ে জায়গাটা নিকুতে হবে, তারপর পাতা পড়বে। পাতার উপর জল ছিটাতে হবে, তারপর চিড়ে তারপর গব্য গড়াতে হবে (দুধ বা দই)। অর্থাৎ কিনা ফলার খাওয়ার ব্যাপার। চাষীর পো হেরে বাড়ী চলে গেল।

[বর্ধমান জেলার মেমারী থানার দেবীপুর গ্রামের কুমার গোপাল সিংহের নিকট হ'তে সংগৃহীত]।

সমাপ্ত